পুনরুত্থান সংখ্যা ২০২২

যিশুর পুনরুত্থান নব জীবনের নিশ্চয়তা

প্রকাশনার ৮২ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১৫ ❖ ১৭ - ২৩ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

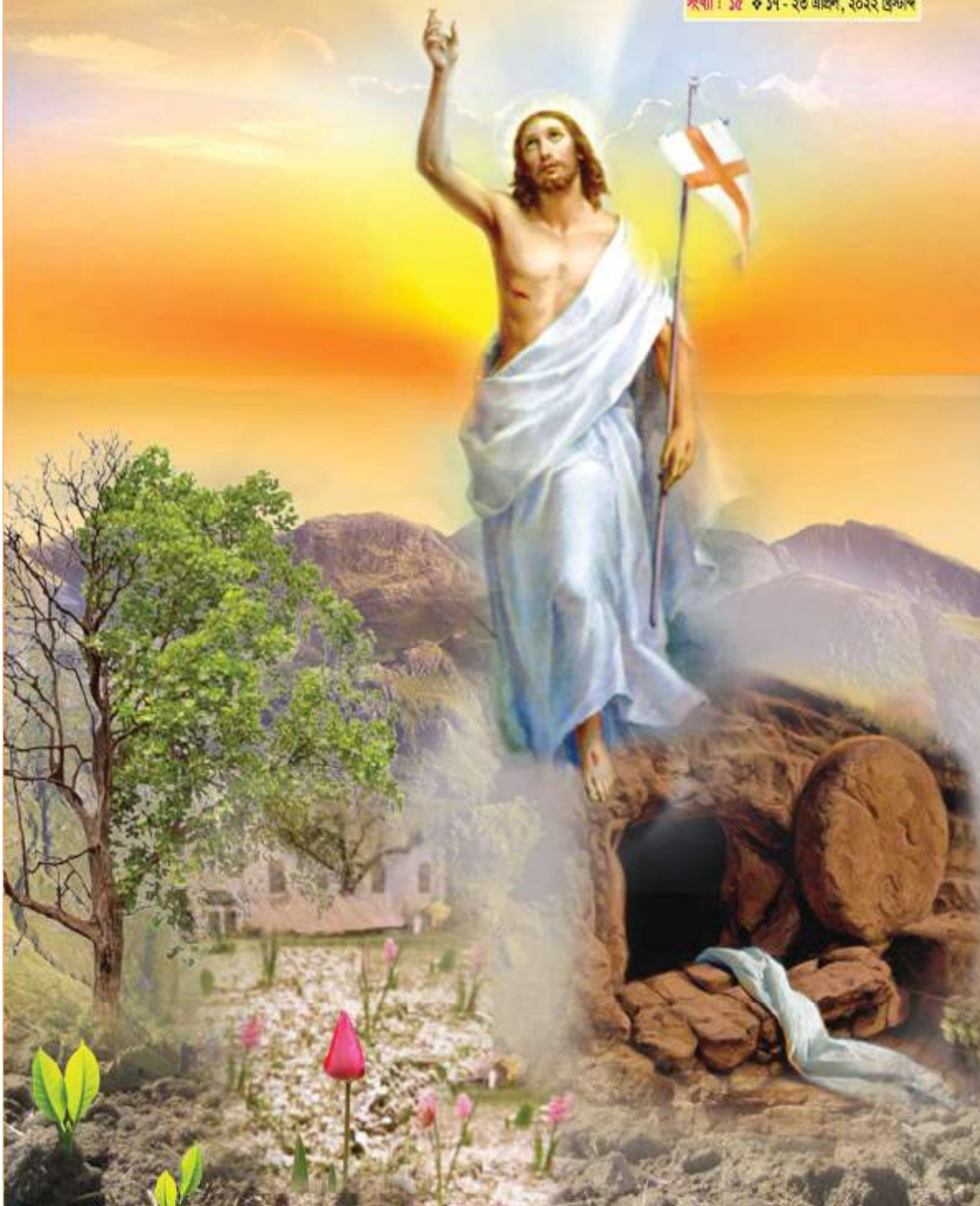

২৭তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত হিউবার্ট ফ্রান্সিস সরকার

জন্ম : ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৫ এপ্রিল, ১৯৯৫ (পুণ্য শনিবার)
পিতা : প্রয়াত জেরোম সরকার
মাতা : প্রয়াত মারীয়া সরকার
লক্ষীবাজার ধর্মপল্লী, ঢাকা।

সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা

- মৃত্যুকালে এমএসএস (পুরকৌশল), BUET-এর ছাত্র ছিল।
- ১৫তম BCS পরীক্ষায় "গণপূর্ত" বিভাগে "সহকারী প্রকৌশলী" পদে চাকুরীর জন্য নির্বাচিত হয় (মরণোত্তর ফলাফল প্রকাশ)।
- BUET-এ বিএসসি (পুরকৌশল) বিভাগ হতে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে "১ম শ্রেণীতে" উত্তীর্ণ হয়।
- ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে এইচএসসি পরীক্ষায় স্টার মার্কস পেয়ে উত্তীর্ণ হয়।
- ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে এসএসসি পরীক্ষায় ৬টি লেটারসহ স্টার মার্কস পেয়ে উত্তীর্ণ হয়।
- দাবা খেলায় স্কুল জীবনে সেন্ট গ্রেগরী উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৯৭৭, ১৯৭৮ এবং ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে জুনিয়র, ইন্টারমিডিয়েট এবং সিনিয়র গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা শহর ইন্টার স্কুল দাবা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়।
- অবসরের বন্ধু ছিল বই আর ম্যাগাজিন। সে জাতীয় দৈনিক The Daily Star-এ নিয়মিত লেখালেখি করতো। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (BUET) এবং অন্যান্য সাময়িকীতেও তার অনেক লেখা ছাপা হয়েছে।

The Daily Star এবং BUET থেকে ইউকসু'র ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের একুশের প্রকাশনা "অনল জলের চিহ্নগুলো" থেকে হিউবার্টের একটি ইংরেজি এবং একটি বাংলা কবিতা নিচে পুনঃপ্রকাশ করা হলো :

The Prayer I say the Every Other day

Please, my dear Taskmaster, pull me wholly to where I belong
Where in deep silence I may make my deep-breathed utterances
Where my feelings grow evermore strong
Whilst my alter-ego's disparate gaze, forage and embrace most wistfully I long.
Yes, Sir I long for her opulent smile,
The smile without any trace of guile.
Yes, I cherish to be detained in her little prison,
The little prison where in cordial detainment
I can read my own profile.
Sir, you call us all to your own grotesque colosseum.
In great befuddlement, we rather are stuck in the marathon business of a workaholic an idler.
We fail to aspire to obviate the thrust-on mandate, fairness and decorum.
Just bustling with Trifle details, our time hums.
Sir, the prayer I say the every other day is simply this one
whereby I try to reach my un-spectacular world,
my divine arbiter, my own Joan.
Please, my dear Taskmaster, pull me wholly to where I belong.
Here. with a thousand others I try to touch your sampan.

(প্রকাশনা : ম্যাগাজিন সেকশন, দ্য ডেইলী ষ্টার, নভেম্বর ২৭, ১৯৯২)

মাদার তেরেজাকে উৎসর্গীত স্তোত্রাবলী

হিউবার্ট ফ্রান্সিস সরকার

বড় বড় স্বপ্নের বিপর্যয়ে,
বড় বড় প্রেমের পরাজয়ে মানুষ মুষড়ে পড়ে;
মানুষ অবুঝ হাহাকারে ভেঙ্গে পড়ে
এমনতর মন্বন্তরে --
যেন অশেষ নিষ্ঠুরতা লেগে আছে সময়ের খঞ্জরে
যার তীক্ষ্ণ আঘাতে মানুষ উবু হয়ে পড়ে;
এমন কোন নিবারণী শক্তি নেই যে তাকে ব্যর্থ করে
অবশেষে তোমার হাত থেকেই পুনর্বার জীবনীশক্তি
সঞ্চারিত হয়, মাদার তেরেজা
কী আশ্চর্য মন্ত্র আছে তোমার কাছে
তুমি বরাভয় দেখালে
এই সর্বত্র প্রসারিত অবিশ্বাসের মাঝে
স্বস্তিমাখা আওয়াজ উঠে,
'ঠাঁই আছে, ঠাঁই আছে'।
ক্রমশঃই একটি বিশাল হৃদয়
হয়ে উঠে একটি পরম আশ্রয়
অথচ সেই তুমি যখন কুমারী বয়সেই চক্ষুলজ্জা ফেলে
কোলে তুলে নিয়েছিলে যতো রাজ্যের অনাথ ছেলেপেলে
যখন কুষ্ঠরোগের অভিশাপে অভিশপ্ত
মানুষগুলিকেই স্নিগ্ধ ছোঁয়ায় উদ্ভাসিত করেছিলে
তখন তোমার পাশে তেমন কেউ ছিলো না।
সেই সঙ্কিক্ষণে সেই একাকিত্ব
তুমি বরণ করেছিলে অবহেলে।
এখন তোমারই অনাবিল ভালবাসার ছোঁয়ায়
অজাত কুজাত মানুষ হয়ে উঠে প্রিয় সমাদরণীয়
যখন তীক্ষ্ণভাষী নিন্দুকেরা খ্রিস্টের ক্ষমার বাণী আওড়ায়,
যখন উচ্ছৃঙ্খল বেলেল্লাপনায় ধুম লেগে যায়,
যখন স্বকথিত পুণ্যাত্মারা নির্দোষ কুমারীকে
জর্জরিত করে অপমান লাঞ্ছনায়,
শহীদের পবিত্র রক্ত দিয়ে হোলি খেলে পাশব উন্মত্ততায়,
তখন তুমি, হয়ে উঠো গাঢ় বিশ্বাসের স্বর্ণ-তরু,
তোমার সহজ কথায় ঝরে অশেষ পুণ্য।

সকল কল্যাণকামী মানুষের কাছে আমাদের ভাই/কাকু/মামার আত্মার মঙ্গল ও চির শান্তি কামনা করে প্রার্থনার অনুরোধ জানাচ্ছি। ঈশ্বর সকলের মঙ্গল করুন। আমাদের ভাই/কাকু/মামার আত্মা চির শান্তি লাভ করুক।

জন (বড়ভাই) + বেবী (বৌদি) : মারীয়া, হিউবার্ট ও টিমথি
ফিলিপ (মেঝভাই) + জয়া (বৌদি) : এলেন ও এঞ্জেলা
মালা (বোন) + মিঠু (ভগ্নিপতি) : আর্থার।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
বর্ষ : ৮২, সংখ্যা : ১৫
১৭-২৩ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
৪-১০ বৈশাখ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা
ছনি মজেছ ডি রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

যিশুর পুনরুত্থান : নব জীবন লাভের আহ্বান

এ বছর ১৭ এপ্রিল সারাবিশ্বের খ্রিস্টানগণ ধর্মীয় অনুরাগে ও গভীর আনন্দ নিয়ে প্রভু যিশুখ্রিস্টের পুনরুত্থান পর্ব বা ইস্টার সানডে পালন করবে। সারা বিশ্বের সাথে একাত্ম হয়ে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র খ্রিস্টান সমাজও যথাযথ মর্যাদায় তাদের বিশ্বাসীয় জীবনের কেন্দ্রীয় উৎসব পালন করবে। আর এই মহান পর্ব পালনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে প্রচলিত ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী তপস্যাকালের ৪০ দিনের বিশেষ প্রার্থনা, দয়া-সেবাকাজ, উপবাস ও কৃচ্ছ্রতার মধ্য দিয়ে। পুনরুত্থানের আনন্দে শরীক হতে হলে একজন খ্রিস্টানকে জীবনের মন্দতা-দুর্বলতা পরিত্যাগ করে পরিবর্তিত মানুষ হয়ে ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলিত হবার সকল সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। যারা সে সুযোগ কাজে লাগাবে তারা আর পুরাতন আমিত্বকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারেনা। তাইতো যিশুর পুনরুত্থান প্রত্যেক খ্রিস্টবিশ্বাসীসহ সকল মানুষকে নতুন মানুষ হয়ে ওঠার অনুপ্রেরণা যোগায়। যিশুর পুনরুত্থান উৎসব হলো মৃত্যুকে জয় করে নব জীবন লাভ করার উৎসব। যিশুর মৃত্যুঞ্জয়ের ঘটনাকে স্মরণ করেই পুনরুত্থান উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। মৃত্যুর পর তৃতীয় দিনে যিশু কবর ছেড়ে উঠে এসে মৃত্যুকে নাশ করেছেন।

প্রভু যিশুর পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে মানব জাতির জন্য নতুন জীবনের দ্বার উন্মোচিত হয়। সেই সাথে স্বর্গে যাবার অধিকার লাভ করে। পাপের শৃঙ্খলে বন্দী মানব জাতি লাভ করে মুক্তির আনন্দ। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস ও আশা করি যে, খ্রিস্ট যেমন প্রকৃত অর্থেই মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হয়েছেন এবং অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন, তেমনি ধার্মিকজনেরা মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সঙ্গে অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন এবং শেষদিন তিনি তাদের পুনর্জীবিত করবেন (*যোহন ৬:৩৯-৪০*)। বিশ্বে যুদ্ধের প্রকোপ একটু স্থিমিত হলেও বিশ্বজুড়ে বিরাজ করছে হতাশা, নিরাশা, ক্ষুধা, দারিদ্র, দলাদলি। এই মুহূর্তে পুনরুত্থিত প্রভু যিশু মানুষকে নুতন জীবন দান করতে চান। আর আমরা যখন পুনরুত্থিত খ্রিস্টের আশ্রয়ে জীবন যাপন করবো তখন সকলের জীবন হয়ে উঠবে চির নতুনের মতো।

পুণ্য পিতা ফ্রান্সিস তাঁর প্রৈরিতিক পত্র , **'ফাতেল্ল তুত্তি'-র** মধ্য দিয়ে গোটা বিশ্বের মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন, আমরা সকলে যেন পরস্পর ভাই-বোন হিসেবে বসবাস করি। পারস্পরিক ভালোবাসা, একতা, মিলন, সহযোগিতা ও সহভাগিতার মাধ্যমে একজন আরেকজনকে ভাই-বোন বলে গ্রহণ করি। পারস্পরিক এই ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত ও অনুশীলিত হলেই মানুষ পুনরুত্থিত খ্রিস্টের জীবনের স্বাদ আস্বাদন করতে পারবো। সাধু আথানাসিউস বলেন, ঈশ্বর মানুষ হয়েছেন যেন মানুষ ঈশ্বর হতে পারে। প্রভু যিশুর পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে সেই মিলন আরো ফলপ্রসুতা পেয়েছে। মানুষের জীবনের পরম এবং চরম লক্ষ্যই হল প্রেমময় ঈশ্বরের সাথে মিলন। খ্রিস্ট দেহ গ্রহণ করেছেন, যাতনা-ভোগ করেছেন, মৃত্যুবরণ করেছেন এবং শেষে পুনরুত্থান করেছেন যেন আমরা তাঁর সাথে পুনরুত্থান করতে পারি। তাঁর সাথে পুনরুত্থিত হয়ে চির সুখী হওয়াটাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য।

পুনরুত্থিত খ্রিস্টেতে আমরা নতুন জীবনের সুখ, আনন্দ, শান্তি ও পরিতৃপ্তি লাভ করি তখনই যখন আমরা আমাদের জীবনের স্বার্থপরতা, হিংসা, অহংকার, ক্ষমতা লিপ্সা মনোভাব, জাগতিক ভোগ-বিলাসীতার অভ্যাস পরিত্যাগ করি। "যারা সৎকর্ম করেছে তাদের পুনরুত্থান হবে জীবনের উদ্দেশ্যে, কিন্তু যারা অসৎ কর্ম করেছে, তাদের পুনরুত্থান হবে বিচারের উদ্দেশে" *(যোহন ৫:২৯; দানিয়েল ১২:২)*। আমরা খ্রিস্টেতে নতুন জীবন লাভ করতে চাই। তাই আমাদের জীবনের পুরাতন পাপময়তা ও অন্ধকার জীবন পরিত্যাগ করতে হবে। "আমাদের জীবনের পুনরুত্থান, তাঁর পুনরুত্থানের মতই হবে পরম পবিত্র ত্রিত্বের কাজ। যিনি যিশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাঁর আত্মা যদি তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে থাকেন, তাহলে যিনি খ্রিস্টযিশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি তোমাদের অন্তরে নিবাসী তাঁর সেই আত্মা দ্বারা তোমাদের মরদেহকেও সঞ্জীবিত করে তুলবেন" *(রোমীয় ৮:১১; ১ থেসা ৪:১৪)*।

বিশ্বজুড়ে করোনা মহামারি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসলেও বিশ্ববাসী এখনও ভাল-ভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না। যুদ্ধ, দলাদলি, ক্ষুধা, বিশৃঙ্খলা, মহামারি ইত্যাদি সংকটময় অবস্থায় বিশ্ববাসীকে পুনরুত্থিত খ্রিস্ট আহ্বান জানাচ্ছেন তাঁর পুনরুত্থিত নব জীবনে বসবাস করতে। পারস্পরিক সহযোগিতা ও ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একসাথে পথ চলতে পুনরুত্থিত প্রভু যিশু তাঁর মণ্ডলীর মধ্যদিয়ে আমাদের সকলকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে। পুনরুত্থানের আলোতে আলোকিত হয়ে ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নিচু, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাইকে নিয়ে একত্রে মিলনাবদ্ধ সমাজ গড়াই হোক এ বছরে পাস্কাপর্বে আমাদের সকলের অঙ্গীকার।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সকল লেখক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ী সকলকে জানাই পুণ্যময় পুনরুত্থান পর্বের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আল্লেলুইয়া। †

তারা ভয়ে অভিভূত হয়ে মাটির দিকে মুখ নত করলেন; কিন্তু সেই দু'জন তাদের বললেন, যিনি জীবিত, তাঁকে তোমরা মৃতদের মধ্যে কেন খুঁজছ? তিনি এখানে নেই, পুনরুত্থানই করেছেন। -লুক ২৪: ৫

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী সূচীপত্র

আর্চবিশপের বাণী ◆৫

প্রবন্ধ

❖ খ্রিস্টের পুনরুত্থান: নব জীবন প্রত্যাশা- **ফাদার দিলীপ এস. কস্তা** ◆৭
❖ আমাদের মুক্তির রূপকার পুনরুত্থিত খ্রিস্ট- **প্লাবন মানুয়েল রোজারিও ওএমআই** ◆৯
❖ পাস্কা পর্বের কিছু অজানা তথ্য- **ফাদার আলবার্ট রোজারিও** ◆১০
❖ ইস্টার সানডে'র তাৎপর্য- **ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা সিএসসি** ◆১১
❖ বাংলার ঘরে পুনরুত্থিত যিশুর বাণী- **সিস্টার মেবেল রোজারিও এসসি** ◆১২
❖ পুনরুত্থানের ভাবনা- **ফাদার লেনার্ড আন্তনী রোজারিও** ◆১৩
❖ নবজীবনের মহোৎসব ইস্টার- **নোয়েল গমেজ** ◆১৪
❖ খ্রিস্ট সত্যিই পুনরুত্থান করেছেন- **ফাদার প্রলয় আগস্টিন ডি'ক্রুশ** ◆১৫
❖ খ্রিস্টের পুনরুত্থান: নবজীবনে অংশগ্রহণ- **ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী** ◆১৭
❖ মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে খ্রিস্টানদের সাক্ষ্যদান- **তেরেজা তপতী রোজারিও** ◆১৯
❖ পুনরুত্থানের প্রতিধ্বনি: "তুমি প্রতিনিয়ত নবীন রাখ"- **ড. বার্থলমিয় প্রত্যুষ সাহা** ◆২১

খোলা জানালা

❖ মানুষের ধান্ধা ধরিত্রীর কান্না- **অর্পা কুজুর** ◆২৪
❖ পাথরটি সরাও- **ব্রাদার চয়ন ভিক্টর কোড়াইয়া সিএসসি** ◆২৬
❖ মুজিব নগরে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের শপথ গ্রহণ- **রুবী ইমেল্ডা গমেজ** ◆২৮
❖ জীবন সায়াহ্নের ভাবনা- **জোনেস এ বটলেরু** ◆৩০
❖ ট্রুথ বনাম ফ্যাক্ট- **সিস্টার রাখী গনছালভেস আরএনডিএম** ◆৩২

যুব তরঙ্গ

❖ ফ্রিল্যান্সিং- **সৈকত লরেন্স রোজারিও** ◆৩৩

মহিলাঙ্গন

❖ সাদা-কালো জীবন- ৬ - **মালা রিবেরু** ◆৩৪

স্বাস্থ্য কথা

❖ আইবিএস পেটের অসুখ আইবিএস কি, কেন ও প্রতিকার- **ড. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও** ◆৩৫

গল্প

❖ একটি মনোরম সন্ধ্যার মৃত্যু- **খোকন কোড়ায়া** ◆৩৬
❖ পবিত্র খ্রিস্টযাগ- **ডেভিড স্বপন রোজারিও** ◆৩৭
❖ আমি আজ অনুতপ্ত- **দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ** ◆৩৯
❖ এক টুকরো জমি- **প্রদীপ মার্সেল রোজারিও** ◆৪০
❖ অফুরান যে মায়ের ভালবাসা- **শিউলী রোজলিন পালমা** ◆৪১
❖ ও- **ফাদার সাগর কোড়াইয়া** ◆৪৩
❖ মানুষের মাঝেই ত্রাণকর্তা- **জেন কুমকুম ডি'ক্রুজ** ◆৪৪
❖ বৃষ্টি বিলাশ- **রবীন ভাবুক** ◆৪৫
❖ পলুকাকার মৎস শিকার- **মিল্টন রোজারিও** ◆৪৭

কলাম

❖ অপচয় অমার্জনীয়- **হিউবার্ট অরুন রোজারিও** ◆৪৮

ছোটদের আসর

❖ যিশুর পুনরুত্থান দিবসে দাদু-নাতির বিখ্যাত ও কুখ্যাত ঘটনা নিয়ে সংলাপ- **মাস্টার সুবল** ◆৪৯

বিশ্ব মণ্ডলী সংবাদ - ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু ◆৫০

পুনরুত্থান পর্বের শুভেচ্ছা

মুক্তিদায়ী খ্রিস্ট ও জগৎ পরিত্রাতার পুনরুত্থান উৎসবে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পাঠক, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ীসহ সকল জাতি, ধর্ম-বর্ণের মানুষকে জানাই প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা। আমাদের প্রতিটি হৃদয়ে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের প্রেম ও শান্তি বর্ষিত হোক। মুক্তির লক্ষ্যে উৎসব হোক মঙ্গলময়। সকলকে জানাই শুভ পাস্কার শুভেচ্ছা।

সুচিন্তিত লেখা ও বিজ্ঞাপনের মধ্যদিয়ে ২০২২ খ্রিস্টাব্দের পুনরুত্থান সংখ্যায় অংশগ্রহণের জন্য সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বি:দ্র: পবিত্র পুনরুত্থান পর্ব উপলক্ষে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের সকল বিভাগ ১৪-১৮ এপ্রিল বন্ধ থাকবে এবং ১৯ তারিখ থেকে যথারীতি অফিস খোলা থাকবে।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর পরবর্তী সংখ্যা (সংখ্যা-১৬) ১ মে প্রকাশ পাবে।

– সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

পুনরুত্থান উৎসব উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা

বিটিভি

পুনরুত্থান রবিবার (১৭ এপ্রিল) : আমি তাঁকে দেখেছি
সময় : রাত ১০টার ইংরেজি সংবাদের পর (সময় পরবর্তীত হলে তা জানিয়ে দেয়া হবে)।
গ্রন্থণা : ছনি মজেছ ডি রোজারিও
ব্যবস্থাপনায় : বাণীদীপ্তি

রেডিও ভেরিতাস

পুনরুত্থান রবিবার (১৭ এপ্রিল) : পুনরুত্থানের আনন্দ
সময় : সকাল ১০টা
রচনা : সিস্টার মেরী আন্না গমেজ
ব্যবস্থাপনায় : বাণীদীপ্তি

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর ফেইসবুক পেইজে থাকছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা

ফেইসবুক পেইজের লিংক : https://www.facebook.com/weeklypratibeshi

পুনরুত্থান সংখ্যা, ২০২২

প্রকাশনার গৌরবময় ৮২ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

আর্চবিশপের বাণী

আজকে আমরা বিশ্বের কোটি কোটি খ্রিস্টানগণ আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে ইস্টার সানডে পালন করছি অর্থাৎ প্রভুযিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান পার্বণ পালন করছি।

এ বছর গোপ ফ্রান্সিস উপবাস ও প্রায়শ্চিত্তকালীন সময়ে যে বাণী রেখেছিলেন তাতে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যেন আমরা সর্বদা ভাল, কল্যাণ, সত্য, ন্যায্যতা ও ভালবাসার বীজ বপন করতে থাকি। ভাল কাজ করতে করতে যেন ক্লান্ত হয়ে না পড়ি। দরিদ্রদের দয়া করতে করতেও যেন ক্লান্ত হয়ে না পড়ি। আমাদের ভাল কাজের ফল আমরা নিশ্চিতভাবে লাভ করবো। পাপ ও মন্দতার মূল যাতে আমাদের জীবন থেকে উৎপাটন করে নতুন জীবন শুরু করি। বাণী শ্রবণ ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে যাতে যিশুর পুনরুত্থানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করি। মানব জাতির মুক্তিদাতা যিশুখ্রিস্ট তিন বছর মানুষের মাঝে মঙ্গলবাণী প্রচার করেছিলেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন যাতে আমরা ঈশ্বরকে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসি এবং প্রতিবেশীকেও যেন নিজের মত ভালবাসি। একে অপরকে ক্ষমা করি, এমনকি শত্রুকেও ভালবাসি ও ক্ষমা করি। এই সত্য অনুধাবণ করতে পেরে মাদার তেরেজা বলেছিলেন: ভালবাসাই ভালবাসার জন্য দেয়, একজনকে ক্ষমা করলে সেও ক্ষমা করতে শিখে। যিশু তাঁর প্রচার জীবনে অনেক অসুস্থকে সুস্থ করেছেন, অন্ধকে দিয়েছেন দৃষ্টি, কালাকে দিয়েছেন শোনার ক্ষমতা, এমনকি মৃতকেও দিয়েছেন জীবন।

তৎকালীন সমাজে ইহুদী ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার। ইহুদী ধর্মনেতা ও পুরোহিতদের ভণ্ডামী তিনি কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। লোক দেখানো ও প্রশংসা পাবার জন্য তারা ধর্ম-কর্ম করতো। ধর্মে ভালবাসা, পর-সেবা, আন্তরিকতা, বিশ্বস্ততা ও সততাই প্রধান। তাই তো তিনি বলতে পেরেছিলেন যে, ধর্মের জন্য মানুষ নয় বরং মানুষের জন্য ধর্ম। এমতাবস্থাতে যিশুর জনপ্রিয়তা দেখে ইহুদী ধর্মনেতারা তাঁর বিরোধিতা শুরু করেন এবং শেষ পর্যন্ত রোমান শাসকের মধ্য দিয়ে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। মৃত্যুর তিনদিন পরে তিনি কবর থেকে পুনরুত্থিত হন। তিনি নতুন জীবন লাভ করেন। দুইহাজার একুশ বছর পূর্বে আজকের এই দিনে ইস্টার সানডেতে অতি ভোরে উঠে কয়েকজন মহিলা যিশুর কবরে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে যায় কারণ যিশুকে যেখানে কবর দেয়া হয়েছিল তাঁর দেহ সেখানে খুঁজে পায় নি। তাঁর শিষ্যরা সেখানে গিয়ে শূন্য কবর দেখেছিল। পরে যিশু অনেকবার শিষ্যদের কাছে দেখাও দিয়েছিলেন যে, তিনি জীবিত।

ইস্টার সানডে আমাদের কতকগুলো মূল্যবান শিক্ষা দান করে, প্রথমত: মিথ্যার চেয়ে সত্য শক্তিশালী এবং মৃত্যুর চেয়ে জীবনই বড়। প্রভু যিশুখ্রিস্ট পাপ, অসত্য ও অন্যায়কেই শুধু জয় করেন নি বরং পাপের ফলে মানুষের যে অনন্ত মৃত্যু ঘটে সেই মৃত্যুকে তিনি জয় করেছেন। দ্বিতীয়ত: ইহুদী সমাজনেতারা ভেবেছিল যে, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই যিশুর সমস্ত শিক্ষা, কার্যক্রম ও তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে, কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে জীবিত করে এই প্রমাণ করলেন যে, তাঁর শিক্ষা ছিল সত্য শিক্ষা, তাঁর কার্যক্রম ছিল সঠিক এবং তাঁর জীবন ছিল পবিত্র। সত্য শিক্ষা ও পবিত্র জীবন কখনও ধ্বংস করা যায় না। সত্যকে কখনও কবর দিয়ে চাপা দেয়া যায় না, দিলে সত্য আরও শক্তিশালী হয়ে জেগে ওঠে। সত্য, ভালবাসা ও ন্যায্যতা একদিন জয়ী হবেই, মিথ্যা ও অসত্য চিরতরে পরাজিত হবে। তৃতীয়ত: যারা যিশুর কথায় ও কাজে বিশ্বাস করে এবং সেই অনুসারে জীবন ধারণ করে তারাও যিশুর মত মৃত্যুকে জয় করবে এবং লাভ করবে শাশ্বত জীবন। চতুর্থত: যিশু পুনরুত্থিত হয়েছেন, জীবিত আছেন বলেই বিশ্বে কোটি কোটি খ্রিস্টানরা একই বিশ্বাস ও ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের খ্রিস্টীয় সমাজ গঠন করেছে।

যিশুর পুনরুত্থান আমাদের জন্য বয়ে আনে আশার আলো, অন্ধকারকে করে দূরীভূত এবং আমাদের হৃদয়-মনকে করে আলোকিত, সত্য ও ন্যায্যতার পক্ষে কাজ করার শক্তি দান করে। আজ চারিদিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই কত অসত্য, অন্যায়, মন্দতা, কত অমানবিকতা, পাশবিকতা, শিশু ও নারীর প্রতি সহিংসতা এবং সঙ্গে যোগ হয়েছে ধর্মান্ধতা, ধর্মের নামে অসহিষ্ণুতা, হিংস্রতা, নির্যাতন এমনকি হত্যা। এমনি একটা অবস্থাতে আমরা প্রভু যিশুর পুনরুত্থান পর্ব পালন করছি। ইস্টার সানডে প্রতিটি খ্রিস্টানের নতুন করে শপথ গ্রহণের দিন সেদিন, সে নিজের অন্তরে গভীরভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করবে, সত্য ও ন্যায্যতার পথে জীবন যাপন করবে। সে সত্য, ন্যায্যতা, ভালবাসা ও সেবার মধ্য দিয়ে নতুন সমাজ ও পৃথিবী গড়ে তুলবে। ফলশ্রুতিতে এই পৃথিবীতেই সৃষ্টি হবে সেই কাঙ্ক্ষিত স্বর্গরাজ্য যেখানে থাকবে ন্যায্যতা, শান্তি, আনন্দ ও ভ্রাতৃপ্রেম। ইস্টার সানডেতে প্রভু যিশু আমাদের সবাইকে সেই আশীর্বাদই দান করুন।

খ্রিস্টেতে,

+ বিজয় নি ক্রুজ, ওএমআই

আর্চবিশপ বিজয় এন ক্রুজ ওএমআই
ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ।

পানজোরাতে মহান সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসবে সকলকে আমন্ত্রণ

অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আগামী ১৩ মে ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ রোজ শুক্রবার, নাগরীর পানজোরাতে পাদুয়ার সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসব মহাসমারোহে পালন করা হবে। এই তীর্থোৎসবে পর্বকর্তাদের জন্য শুভেচ্ছা দান ১,০০০ (এক হাজার) টাকা মাত্র। এছাড়াও যারা তীর্থভূমি উন্নয়নে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করতে চান তাদেরকে সরাসরি নাগরী ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিতের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

পর্বকর্তাদের শুভেচ্ছাদান সরাসরি নাগরী ধর্মপল্লীতে অথবা স্থানীয় পাল-পুরোহিতের মধ্যদিয়ে দিতে পারবেন।

ঐতিহ্যবাহী পানজোরার অলৌকিক কর্মসাধক মহান সাধু আন্তনীর এই মহাতীর্থোৎসবে যোগদান ক'রে তাঁর মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও দয়া-আশীর্বাদ লাভ করতে আপনারা সকলেই আমন্ত্রিত।

চলমান উন্নয়ন কর্মকাণ্ড

- ৪২ টি পাকা টয়লেট নির্মাণাধীন, যা এবারের পর্বে ব্যবহার করা যাবে।
- জমি ভরাটের কাজ চলমান।
- দক্ষিণের জলাশয় (পুকুর) ভরাট ও উত্তরের রাস্তা প্রশস্তকরন সম্পন্ন হয়েছে।
- চারিদিকে পানি নিষ্কাশন (ড্রেনেজ) ব্যবস্থা করা হবে।
- চ্যাপেলের ভিতর নতুন করে আস্তর করা হবে।

এসব চলমান উন্নয়ন কাজে আপনিও শরিক হয়ে সাধু আন্তনীর বিশেষ অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ লাভ করুন।

❖ অনুগ্রহ করে মাস্ক পরুন ও সরকারি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন। ❖ প্রয়োজনীয় পানীয় জল ও ঔষুধ সঙ্গে রাখবেন।

নভেনা খ্রিস্টযাগ	পর্বীয় খ্রিস্টযাগ
৪ - ১২ মে ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ সকাল ৬:৩০ মিনিট বিকাল ৪টা	১৩ মে ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ, শুক্রবার ১ম খ্রিস্টযাগ- সকাল ৭টা ২য় খ্রিস্টযাগ- সকাল ১০টা

যোগাযোগের ঠিকানা :=
ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ
পাল-পুরোহিত, নাগরী ধর্মপল্লী
মোবাইল নম্বর: ০১৭২৬৩১১১৯৯

ধন্যবাদান্তে
পাল-পুরোহিত, সহকারী পাল-পুরোহিত,
পালকীয় পরিষদ ও খ্রিস্টভক্তগণ
নাগরী ধর্মপল্লী

বিজ্ঞা/১৯২/২০২২

মোড়ক উন্মোচন

আর্নেস্ট আলম ডি কস্তা
সূর্যোদয়: ১ মার্চ, ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ
সূর্যাস্ত: ১২ এপ্রিল, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

১২ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ লেখক প্রয়াত আর্নেস্ট ডি'কস্তা রচিত "আমার কিছু কথা" গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেছেন প্রধান অতিথি মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ, ওএমআই এবং বিশেষ অতিথি এডভোকেট গ্লোরিয়া ঝর্ণা, এমপি মাননীয় সংসদ সদস্য ও অন্যান্য গণ্যমান্য বিশেষ অতিথিগণ। বিশেষ সহযোগিতায় ছিলেন দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ।

গ্রন্থটির প্রাপ্তিস্থান: প্রতিবেশী প্রকাশনীর সকল বিক্রয় কেন্দ্রে ও
সিস্টার রেবা ভেরোনিকা ডি'কস্তা আরএনডিএম
সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স স্কুল এন্ড কলেজ
লক্ষীবাজার, ঢাকা।

বিজ্ঞা/১৯৩/২০২২

প্রবন্ধ

খ্রিস্টের পুনরুত্থান: নব জীবন প্রত্যাশা

ফাদার দিলীপ এস কস্তা

খ্রিস্টবিশ্বাস ও উপাসনার মধ্যে পুনরুত্থান পর্ব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থপূর্ণ। আদিমণ্ডলীতে যিশুর পুনরুত্থান পর্ব যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে উদ্‌যাপন করা হতো। প্রতি রবিবার যথাযথ মর্যাদার সাথে রুটি ছেঁড়া অনুষ্ঠান করা হতো। খ্রিস্টীয় উপাসনার সাত সপ্তাহব্যাপী তপস্যাকাল বা প্রায়শ্চিত্তকাল উদ্‌যাপনের পরেই পুনরুত্থান উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। পনুরুত্থান পর্ব হলো: যিশুর গৌরবময় রূপ, মৃত্যু বিজয়ের আনন্দ, পাপ-প্রলোভনকে জয় করার মাহাত্ম্য প্রকাশ করে। যিশু নিজেই পুনরুত্থানের বিষয়ে বলেন,"আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন। কেই যদি আমার উপর বিশ্বাস রাখে, তবে সে মারা গেলেও জীবিতই থাকবে; আর জীবিত যে কেউ আমার উপর বিশ্বাস রাখে, তার মৃত্যু হতেই পারে না কোনকালেই না" *(যোহন ১১: ২৬)*। যিশুর এই আশ্বাস ভরা বাণী ভক্তবিশ্বাসী মানুষের জীবনে নতুন চেতনা ও অনুপ্রেরণা দেয়। পুনরুত্থানের উপলব্ধি ও আনন্দ খ্রিস্টবিশ্বাসীদের অন্তরে নতুন চেতনা ও সাহস দান করেন। পুনরুত্থান শব্দটি অতি মধুর, সুন্দর ও তাৎপর্যমণ্ডিত। পুনরুত্থান শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো: উত্থিত হওয়া, জেগে ওঠা, তমসাকে জয় করা, সজীব হওয়া, সতেজ হওয়া, আনন্দিত হওয়া, জীবন ফিরে পাওয়া, রূপান্তর লাভ করা ইত্যাদি। পুনরুত্থান পর্বটি বৎসরের বসন্তকালীন সময় অনুষ্ঠিত হয় যা বিশ্ব প্রকৃতির সাথে মিল রয়েছে। বসন্তকালীন সময়ে গাছ-পালায় নতুন পাতা গজায় এবং নতুন পাতার সজীবতায় ধরিত্রী নতুন সাজে সেজে ওঠে। বিশ্ব-প্রকৃতির তথা আমাদের বাস্তবতায় পুনরুত্থান পর্বটি সত্যিই অর্থপূর্ণ বাস্তবভিত্তিক অনুচিন্তনে বিশ্বাসের জীবন ভরিয়ে তোলা।

খ্রিস্টমণ্ডলীর সূচনা পর্বের কয়েক শতাব্দী ব্যাপী পুনরুত্থান পর্ব এবং রবিবাসরীয় উপাসনাই ছিল প্রধান উপাসনা। রবিবার দিনটিরও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বহন করে। 'রবি' হলো সূর্য-গ্রহ তারকার মধ্যে প্রধান। আর এই রবি সূর্য নামে পরিচিত। সূর্য হলো আলোর প্রধান উৎস। খ্রিস্টযিশু নিজেই নিজেকে জগতের জ্যোতি বলে পরিচয় দেন। তিনি বলেন, "আমি জগতের আলো। যে আমার অনুসরণ করে, সে কখনো অন্ধকারে চলবে না; সে তো জীবনেরই আলো লাভ করবে" *(যোহন ৮: ১২)*। খ্রিস্ট যিশু নতুন সূর্য ও ধর্মরাজ বলে আখ্যায়িত। তিনি জগতের জ্যোতি, তমসা বিনাসী এবং মৃত্যু নাশকারী। পুনরুত্থানের মধ্যদিয়ে তিনি যে নতুন সূর্য ও আলো সেই অর্থের পূর্ণতা লাভ করেছে। খ্রিস্টীয় উপাসনায় তাই পুনরুত্থান পর্ব এবং রবিবাসরীয় উপাসনা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং পুনরুত্থিত খ্রিস্টই বিশ্বাসীদের জীবনে নতুন প্রেরণা, শক্তি ও সাহসের উৎস।

'পুনরুত্থান' উৎসবটির হিব্রু পাস্কা বা নিস্তার পর্বের সাথে মিল রয়েছে। পুরাতন নিয়মে পাস্কা হলো দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করা। প্রতিশ্রুত দেশের প্রবেশের যাত্রা, মুক্তি ও স্বাধীন মানুষ এবং নাগরিক হওয়ার প্রত্যাশায়। পবিত্র নতুন নিয়মে পাস্কা হলো পাপের দাসত্ব ও মন্দতা থেকে মুক্তি লাভ করা। এক কথায়, পাস্কা হলো পার হয়ে যাওয়া বা অতিক্রম করা। মুক্তি লাভের পথ ও আদর্শ হলেন স্বয়ং যিশুখ্রিস্ট। যিনি সকল পাপের জন্য ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে কষ্ট-যন্ত্রণার মধ্যদিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং মৃত্যুকে জয় করে পুনরুত্থিত হয়েছেন। সাধু পল পুনরুত্থিত খ্রিস্টের বিষয়ে বলেন, "খ্রিস্ট যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের প্রচারও বৃথা, তোমাদের বিশ্বাসও বৃথা" *(১ করি ১৫: ১৪)*। ইহুদীদের পর্বটি নিস্তার পর্ব বা Passover নামে পরিচিত। নিস্তার শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো, রক্ষা বা রেহাই পাওয়া, বিপদ বা মন্দতা থেকে রক্ষা পাওয়া। সর্বোপরি, নিস্তার পর্ব হলো ঈশ্বরের সহায়তায় উদ্ধার পাওয়া। লাতিন Pascha, গ্রীক Paskha এবং হিব্রু Pesakh এবং ইংরেজী Easter Resurrection শব্দ ব্যবহার করা হয়। তবে পাস্কা বা পুনরুত্থান আমাদেরকে সত্য ও আলোকময় পথের সন্ধান দেয়, চিরন্তন পিতার রাজ্যে প্রবেশ করার লক্ষ্যে।

পুরাতন নিয়মের পাস্কা পর্বের বর্ণনায় বলা হয়েছে, "

"ইহুদীদের একটি মহাপর্ব; প্রতি বছর "নিশান" মাসের ১৫ তারিখে পর্বটি উদ্‌যাপিত হয় (নিশান হলো নির্বাসিনোত্তর হিব্রু ক্যালেণ্ডারের প্রথম মাস অর্থাৎ আমাদের মার্চ ও এপ্রিল মাস)। এ পর্বের সময় মিশরীয় দাসত্ব থেকে ইস্রায়েলীয়দের উদ্ধারের ঘটনাকে স্মরণ করা হয় *(দ্র: যাত্রা ১২ অধ্যায়)*। পাঠটির বিশেষ দিক হলো যজ্ঞ ভোজ আর অনুষ্ঠানটি শেষ হয় বলির মেষ ভোজনের মধ্যদিয়েই। পরবর্তী দিনগুলোতে খামিরবিহীন রুটির পর্বের সাথে সমন্বয় রেখে পর্বটি সপ্তাহব্যাপী পালিত হয়। খ্রিস্টীয় নিস্তার উৎসব হল-ঈশ্বরের মেষশাবক যিশুখ্রিস্টের বলি-উৎসর্গ যার দ্বারা মানবজাতি পাপের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের স্বাধীন পুত্র-কন্যা হিসাবে পরিগণিত হয়েছে" *(খ্রিস্টধর্মীয় শব্দার্থ, ধারা ২৪৫)*।

যিশুর পুনরুত্থানের কারণেই খ্রিস্টীয় উপাসনা

প্রাণবন্ত ও সজীব হয়েছে। পুনরুত্থিত খ্রিস্টের নামে দীক্ষিত হবার মাধ্যমেই খ্রিস্টমণ্ডলী গড়ে উঠেছে। কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষায় পুনরুত্থান পর্ব শুধু পর্ব নয়; কিন্তু মহাপর্ব। "সুতরাং পুনরুত্থানপর্ব শুধুমাত্র অনেক পর্বের একটি পর্ব নয়, বরং এটি হচ্ছে "পর্বের পর্ব" এবং "মহোৎসবের মহোৎসব" ঠিক যেমনটি হয় খ্রিস্টপ্রসাদের ক্ষেত্রে, কারণ খ্রিস্টপ্রসাদ হচ্ছে "সংস্কারের সংস্কার" (মহা সংস্কার)। সাধু আথানাসিউস পুনরুত্থান পর্বকে "মহা রবিবার" বলে অভিহিত করেছেন এবং প্রাচ্য মণ্ডলীগুলো পুণ্য সপ্তাহকে "মহা সপ্তাহ" বলে আখ্যায়িত করেছে। পুনরুত্থান-রহস্য, যা দ্বারা খ্রিস্ট মৃত্যুকে চূর্ণ করেছেন, তার সেই রহস্যের মহাশক্তি আমাদের পুরনো কালপ্রবাহে প্রবেশ করে যে পর্যন্ত না সবকিছু তাঁর অধীন হয়" *(ধারা ১১৬৯)*।

আলেক্সান্দ্রিয়ার আর্চবিশপ মহান সাধু আথানাসিউস *(২৯৭-৩৭৩)* পুনরুত্থানের ধ্যানলব্ধ চিন্তায় বলেন, "হে খ্রিস্ট, তোমার পুনরুত্থানের এই রবিবার দিনে, তোমার দ্বারা সম্পাদিত মহা আশ্চর্যকাজগুলো যখন ধ্যান করি, তখন আমরা বলি: "ধন্য এই রবিবার, কারণ এই দিনে আরম্ভ হয়েছে সৃষ্টি...পৃথিবীর পরিত্রাণ ...মানবজাতির নবায়ন!...রবিবার দিনে স্বর্গ ও পৃথিবী আনন্দ করেছে এবং সমগ্র বিশ্বমণ্ডল আলোয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে! ধন্য এই রবিবার কারণ এই দিনে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে যাতে আদম ও নির্বাসিত সবাই নির্ভয়ে সেই দ্বারের মধ্যদিয়ে প্রবেশ করতে পারে"।

পুনরুত্থান পর্বের মাধ্যমে আমরা পুনরুত্থিত খ্রিস্টের দু'টি দিক নিয়ে চিন্তা করি। প্রথমত, "তাঁর মৃত্যু দ্বারা খ্রিস্ট আমাদের মুক্ত করেছেন; তার পুনরুত্থান দ্বারা তিনি আমাদের কাছে নব জীবনের পথ উন্মুক্ত করেছেন। এই নতুন জীবন পরমেশ্বরের অনুগ্রহে আমাদের ধার্মিক বলে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, 'মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিস্টকে যেমন পিতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি'। ধার্মিকতার অর্থ দ্বিবিধ: পাপের কারণে যে মৃত্যু এসেছে তার উপর বিজয়ী হওয়া এবং অনুগ্রহে নতুনভাবে অংশগ্রহণ" *(কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, ধারা, ৬৫৪)*।

পুনরুত্থিত খ্রিস্টযিশু প্রেরিত শিষ্যদের সকল প্রেরণা ও শক্তির উৎস ছিল। যিশু পুনরুত্থিত হবার মাধ্যমে নিরাশা ও হতাশাগ্রস্ত প্রেরিত শিষ্যদের জীবনে বিশ্বাসের আলো ও আত্মশক্তি দান করেছিলেন। পুনরুত্থিত খ্রিস্টের নির্দেশনা ছিল "তোমরা জগতের সর্বত্র যাও; বিশ্বসৃষ্টির কাছে তোমরা ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার; যে বিশ্বাস করবে আর দীক্ষাস্নাত হবে, সে পরিত্রাণ পাবে" *(মার্ক ১৬: ১৫-১৬)*। সুতরাং পুনরুত্থিত খ্রিস্টে বিশ্বাস করা এবং দীক্ষিত হবার মধ্যদিয়ে পরিত্রাণ লাভ করা সম্ভব। খ্রিস্টমণ্ডলী প্রেরণধর্মী আর প্রেরণ কাজের নির্দেশনা ও শক্তিদাতা হলেন পুনরুত্থিত খ্রিস্ট। ভয়, হতাশা, নিরাশা ও তমসার পথ থেকে নিস্কৃতি লাভের উপায় বা পথ হলো পুনরুত্থিত খ্রিস্ট যিশুতে বিশ্বাস রাখা। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট যিশুর নামে পথ চলার মধ্য দিয়েই খ্রিস্টীয় জীবনের পূর্ণতা লাভ করেন। পুনরুত্থিত খ্রিস্টযিশুর আশীষ বাণী ছিল 'তোমাদের শান্তি হোক'। শান্তি কামী মানুষ হিসেবে আমাদের পথযাত্রা হোক পুনরুত্থি খ্রিস্ট যিশুর আশীষ ও অনুপ্রেরণা নিয়ে। সকল ভয়, অন্ধকার ও নিরাশা পুনরুত্থিত খ্রিস্ট সকলকে মুক্তি দান করুন। খ্রিস্ট পুনরুত্থিত! সত্যিই পুনরুত্থিত!!

লেখক : পাল-পুরোহিত ও শিক্ষক
বনপাড়া ধর্মপল্লী, রাজশাহী

সোনাবাজু গির্জার প্রতিপালিকা ফাতিমা রাণীর পার্বণে সবাইকে আমন্ত্রণ

সুধী,

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৩ মে, ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ রোজ শুক্রবার সোনাবাজু উপ-ধর্মপল্লীর প্রতিপালিকা ফাতিমা রাণীর পর্বোৎসব মহা আড়ম্বরের সাথে উদ্‌যাপন করা হবে। দেশে বিদেশে অবস্থানরত সকল ভক্তপ্রাণ ভাই বোনদের উক্ত পার্বণে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এই পবিত্র পার্বণে যারা পর্বকর্তা হতে আগ্রহী তাদের জন্য শুভেচ্ছা দান ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা মাত্র।

ফাতিমা রাণী আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করুন।

অনুষ্ঠান সূচী

নভেনার খ্রিস্টযাগ	পর্বীয় খ্রিস্টযাগ
৪ মে- ১২ মে, ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ সময়: বিকাল ৪:৩০ মিনিট	১৩ মে, ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ সময়: সকাল ৯:৩০ মিনিট

ধন্যবাদান্তে
ফাদার পংকজ প্লাসিড রড্রিকস্
এবং খ্রিস্টভক্তগণ
সোনাবাজু উপ-ধর্মপল্লী

বিজ্ঞ/১১৫/২২

আমাদের মুক্তির রূপকার পুনরুত্থিত খ্রিস্ট

প্লাবন মানুয়েল রোজারিও ওএমআই

মৃত্যুঞ্জয়ী প্রভু যিশুখ্রিস্টের পুনরুত্থান সকল খ্রিস্টভক্তদের বিশ্বাসের মূল ভিত্তি। প্রতিবছরই এই পবিত্র মহোৎসবটি আমাদের অন্তরে নিয়ে আসে জীবনকে দেখার ও বোঝার নতুন কিছু অনুভূতি নিয়ে। প্রভু যিশুখ্রিস্টের পুনরুত্থানের মাধ্যমেই আমরা পাপ থেকে মুক্তি লাভ করি আর হয়ে উঠি স্বাধীন মানুষ।

যিশু মৃত্যুঞ্জয়ী। তবে মৃত্যুঞ্জয়ী হবার আগে যিশুকে নিদারুণ মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে, হতে হয়েছে অবহেলিত, অবাঞ্ছিত, পরিত্যক্ত, গ্রহণ করতে হয়েছে অন্যায্য ও প্রহসনমূলক বিচার, সহ্য করতে হয়েছে মিথ্যা অপবাদ ও নিন্দা এবং শেষে ক্রুশীয় মৃত্যুর যন্ত্রণাও। তবে মৃত্যু ও অন্ধকারকে জয় করে প্রভু যিশুখ্রিস্ট মানবের মুক্তির রূপকার হিসেবেই নিজেকে প্রমাণিত করছেন। আর মানুষকে অভয় দিচ্ছেন ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত থেকে আমরাও অন্ধকারকে জয় করতে পারি। সাধু পল করিন্থীয়দের কাছে পত্রে লিখেছেন "আসলে খ্রিস্টের ভালবাসা আমাদের সব-কিছুই নিয়ন্ত্রণ করে, কারণ আমরা মনে প্রাণে বুঝেছি যে, সকলের হয়ে যখন একজন মৃত্যবরণ করেছেন, তখন সকলেরই মৃত্যু হয়েছে। এও বুঝেছি যে, খ্রিস্ট সকলের হয়ে মৃত্যু এই জন্যে বরণ করেছেন, যাতে, যারা জীবিত ,তারা যেন নিজেদের জন্যে আর জীবন যাপন না করে, বরং যিনি তাদের হয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন আর পুনরুত্থিত হয়েছেন, তারা যেন তাঁরই জন্যে জীবন যাপন করে"। *(২ করি ৫:১৪-১৫ পদ)*

আমাদের জন্য পুনরুত্থান বা পাস্কা হল জীবনের পর্ব এবং মহোৎসবের মহোৎসব। চল্লিশদিন ব্যাপী তপস্যা কালের প্রার্থনা, উপবাস আর ধ্যানের পরে আসে পুণ্য শুক্রবার, প্রভু যিশুর মর্মান্তিক ক্রুশীয় যন্ত্রণা ও মৃত্যুর স্মরণানুষ্ঠান। পুণ্য শুক্রবারের সেই দুঃখ, কষ্ট, ব্যথা, নিরাশা ও অন্ধকারকে ভেদ করে রবিবারে আসে মহা পুনরুত্থান! আমরা পাই নব আলো- 'খ্রিস্টের জ্যোতি বা আলো'। সেই উজ্জ্বল আলোয় আমাদের সকলের জীবন ভরে ওঠে এক নতুন আশায়। জীবনের সকল গ্লানি, দুঃখ, কষ্ট, রোগ-জরা, দুর্বলতার মাঝে আমরা পাই নব জীবনের আশ্বাস ও প্রেরণা। যেমনটি আছে পুনরুত্থানের এই গানটিতে :

"প্রভু যিশুর আজিকে হল জয়, সমাধি শূন্য, পাপের পরাজয়।।
মৃত্যুরে তিনি করিলেন জয়, আনিলেন নবজীবন অমৃতময়
দিয়েছেন মুক্তি মানবেরে তিনি, বিশ্ব ভুবন আনন্দময়।।"

পবিত্র বাইবেল আমাদেরকে বার্তা দিয়ে যায়, " আর খ্রিস্ট যদি পুনরুত্থিত না-ই হয়ে থাকেন তাহলে, আমাদের বাণীপ্রচারও অর্থহীন!" *(১ করি ১৫:১৪)*। 'খ্রিস্টের পুনরুত্থানের সহভাগি হতে গেলে আমাদের পুরাতন আমিত্বকে বিসর্জন দিতে হবে' *(কলসীয় ৩:৯)*। খ্রিস্টীয় জীবন হচ্ছে যিশু খ্রিস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানে বিশ্বাস। "মুখে তুমি যদি সকলের সামনে যিশুকে প্রভু বলে স্বীকার কর এবং অন্তরে যদি বিশ্বাস কর যে, পরমেশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই পরিত্রাণ লাভ করবে"। *(রোমীয় ১০:৯)*। অর্থাৎ পুনরুত্থিত খ্রিস্টই আমাদের একমাত্র মুক্তিদাতা।

প্রতিবছরই পুনরুত্থান মহাপর্ব নিয়ে আসে আমাদের জীবনে মহা আনন্দ। সেই সাথে আমাদের ব্যক্তি জীবনেও পুনরুত্থানের মহিমা নিয়ে আসে আমূল পরিবর্তন। কিন্তু মানুষ হিসেবে অনেক সময় আমরা দুর্বল ও কলুষিত। আমরা পাপের দাস হয়ে অনেক সময় জীবন যাপন করি। তাই আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত প্রতিদিনের পথ চলায় পুনরুত্থানের অভিজ্ঞতায় নিজেদের প্রশ্ন করা। আমরা কি পুনরুত্থিত খ্রিস্টের স্পর্শ পেয়েছি? আমার প্রতিবেশিরা কি আমার জীবনে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের ছাপ দেখতে পায়? লোকেরা কি আমার জীবনে সদা জাগ্রত পুনরুত্থিত নব জীবন যাপন দেখতে পায়? আমি কি সত্যিই পুনরুত্থিত ব্যক্তি? কোথায় আমি পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সাক্ষাৎ পেতে পারি? আর এই প্রশ্নগুলিই আমাকে অনুপ্রাণিত করে একজন নতুন মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়তে এবং নতুন শক্তিতে বলীয়ান হতে । আর এই শক্তি মানুষে- মানুষে মিলন নিয়ে আসে, হিংসা বিদ্বেষ- এর পথ ছেড়ে দিয়ে শান্তির সমাজ গড়ে তুলতে এবং ঐশ আনন্দে জীবন ভরে তুলতে সাহায্য করে।

খ্রিস্টের পুনরুত্থান আমাদের আশা প্রদান করে। আমরা খ্রিস্টের পুনরুত্থানে বিশ্বাসীভক্ত। তিঁনি আমাদের মুক্তির রূপকার। যখন আমরা মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিস্টের সহায়তায় আমাদের পাপকে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হই, তখনই আমাদের মধ্যে পুনরুত্থিত যিশুর শক্তি কাজ করে। খ্রিস্টের পুনরুত্থান আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আমাদের কষ্ট ও মৃত্যু বৃথা যাবে না। যিশুর পুনরুত্থান প্রকাশ করে যে, ভালবাসা পাপ ও মৃত্যুর চেয়েও বেশী শক্তিশালী। "কোন- কিছুই আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্টে নিহিত ঐশ ভালবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না: মৃত্যু নয়, জীবনও নয়, কোন দূত, আধিপত্য বা শক্তি, বর্তমান বা ভবিষ্যতের কোন কিছু, উর্ধ্ব বা অতলের কোন প্রভাব, কিংবা সৃষ্ট অন্য কোন কিছুও নয়" *(রোমীয় ৮:৩৯)*।

খ্রিস্ট আজ মহাগৌরবে পুনরুত্থান করেছেন এবং জীবিত আছেন। যিশুর পুনরুত্থানই আমাদের বিশ্বাসের প্রথম ও প্রধান উৎস ও ভিত্তি; যা খ্রিস্টভক্তদের জীবনে আনে প্রকৃত শান্তি ও আনন্দ। তিনিই দাসত্ব থেকে মুক্তিতে, অন্ধকার থেকে আলোয়, মৃত্যু থেকে জীবনে, স্বৈরশাসন থেকে শাশ্বতরাজ্যে আমাদের বের করে আনলেন ও করে তুললেন তাঁর আপনজাতি। খ্রিস্টের এখন আর মুখ নেই, আমাদেরই আছে মুখ। সর্বত্র খ্রিস্টের মুক্তির বাণী প্রচারের জন্য। খ্রিস্টের এখন আর কোন হাত নেই, পা নেই। বরং আমাদেরই আছে হাত ও পা। যেন খ্রিস্টের কাজগুলো আমরা করতে এবং সকলকে সাহায্য করতে এগিয়ে যেতে পারি।

প্রভু যিশুর পুনরুত্থান আমাদের আহ্বান করে, আমরা যেন খ্রিস্টের জন্যই জীবন যাপন করি। কেননা পুনরুত্থিত খ্রিস্টপ্রভু আমাদের অন্তরে জাগিয়ে তুলেছেন বিশ্বাস, ঐশরিক শক্তি, আনন্দ ও শান্তি। প্রভু যিশুর পুনরুত্থানের আনন্দ ও শান্তিবার্তা সকলের অন্তরে নব জাগরণ, উৎসাহ উদ্দীপনায় ভরে উঠুক, কারণ পুনরুত্থিত খ্রিস্টই আমাদের মুক্তির রূপকার। সকলকে জানাই পাস্কাপর্বের প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা!!

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

1. Fr. Roberto B. Manansala, OFM, Echos of God's Love: Homilies for liturgical year cycle B and C, Our lady of the Angels Seminary, Quezon City, Philippines,2014.
২. 'সন্ন্যাস প্রাহরিক উপাসনা'
৩. মঙ্গলবার্তা (নব-সন্ধি)॥ ❑

লেখক: মেজর সেমিনারীয়ান, নয়ানগর, ঢাকা

পাস্কা পর্বের কিছু অজানা তথ্য

ফাদার আলবার্ট রোজারিও

খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের জন্যে পাস্কা পর্ব হলো বছরের সবচেয়ে পবিত্রতম দিন, একটি মহৎ অনুষ্ঠান। ধর্মীয় দিক থেকে পাস্কা পর্বই সবচেয়ে বড় পর্ব। তবে উদ্‌যাপনের দিক থেকে বড়দিনের আয়োজন হলো সবচেয়ে বড়। যিশু পুনরুত্থান না করলে খ্রিস্ট ধর্মের জন্ম হতো কি না সে এক বড় প্রশ্ন থেকেই যায়। নিষ্ঠুর এক যাতনা, বৃহৎ ভারী ক্রুশ বহন এবং ক্রুশের উপর প্রাণ ত্যাগের পর রবিবার দিন প্রত্যুষে যিশু কবর থেকে বের হয়ে আসেন। যিশুর পুনরুত্থান উৎসবকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করা হয়। যথা– পাস্কা পর্ব, ইস্টার সানডে, পুনরুত্থান দিবস, পুনরুত্থান পর্ব বা পুনরুত্থান রবিবার। পুরো খ্রিস্টান বিশ্বে আনন্দ উৎসবের মধ্যদিয়ে পাস্কা পর্ব পালন করা হয়। এদিনে প্রতিটি খ্রিস্টান পরিবারগুলো থাকে আনন্দমূখর। কারণ এদিন হলো মৃত্যুর উপর যিশুর বিজয় উৎসব। যিশুর পুনরুত্থানের মধ্য দিয়েই আমাদের কাছে এই সত্য প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে যিশুখ্রিস্ট হলেন ঈশ্বরের শক্তিমান পুত্র। এই যিশুই আমাদের সবাইকে একদিন স্বর্গে নিয়ে যাবেন।

প্রতি বছর পাস্কা পর্বের তারিখটা বড়দিনের মত ঠিক থাকে না। পাস্কা পর্বের তারিখের কেন এই পরিবর্তন? এর পিছনে রহস্যটা কি? ইস্টার বা পাস্কা পালনের একটা সুনির্দিষ্ট তারিখ ঠিক করার জন্য সম্রাট প্রথম কন্সটেনন্টাইন ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে বিশপদের একটা পরিষদ গঠন করেছিলেন। এই বিশপগণ নিসিয়াতে তাঁদের প্রথম বৈঠকে ইস্টার পর্ব পালনের একটা দিন নির্ধারণের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে ইস্টার হবে বসন্ত বিষুব-এর পর প্রথম পূর্ণিমার পর যে রবিবার পড়বে সেই রবিবার। এই বসন্ত পূর্ণিমার চাঁদকে বলা হয় "ফুল মুন"। হিব্রু শব্দ "পেসাক" এবং গ্রীক শব্দ "পাস্কা" থেকে এই পাস্কা পর্ব। যে কারণে পাস্কা পর্বটি ২২ মার্চ থেকে ২৫ এপ্রিলের মধ্যে যে কোন একটি তারিখে পড়ে থাকে। এজন্যেই পাস্কা পর্বের তারিখ প্রতি বছর আর নির্দিষ্ট থাকে না।

বিশ্বব্যাপী যে সমস্ত স্থানে খ্রিস্টানগণ আছেন সে সমস্ত দেশে পুনরুত্থান পর্বকে ঘিরে যে আনুষ্ঠানিকতাগুলো প্রচলিত আছে তা কিন্তু বেশ সমৃদ্ধ ও অর্থপূর্ণ। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগুলো পৃথিবীব্যাপী মোটামুটি একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে। পবিত্র সপ্তাহ শুরু হয় তালপত্র রবিবার থেকে। পুণ্য বৃহস্পতিবার শিষ্যদের যিশুর পা ধুয়ানো ও শেষভোজ স্মরণানুষ্ঠান খুবই ঘটা করে পালন করা হয়। পুণ্য বৃহস্পতিবারকে 'মোণ্ডি বৃহস্পতিবার' নামেও আখ্যায়িত করা হয় যার অর্থ 'নতুন আদেশ'। নতুন আদেশ হলো যিশু আমাদের যেভাবে ভালবেসেছেন পরস্পরকে সেভাবে ভালবাসতে হবে। জার্মানীতে এদিনটিকে 'সবুজ বৃহস্পতিবার' বলেও আখ্যায়িত করা হয়। তাই এদিন সবুজ শাক-সবজি, সবুজ সালাদ পরিবেশন করা হয়। সুইডেনে এদিনটিকে 'পা ধুয়ানোর বৃহস্পতিবার' বলা হয়।

এরপরের দিনই হলো পুণ্য শুক্রবার। আমাদের সকলের জন্যে শোকের দিন। যিশুর প্রহসনের বিচার, কষাঘাত, ক্রুশ বহন, মৃত্যু এবং দিনান্তে তাঁর কবর এগুলো ধ্যান করে আমরা শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। এবং এরপরই যিশুর পুনরুত্থান উৎসব। ইস্টার পর্ব পৃথিবীর সব দেশেই খুব জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালিত হয়ে থাকে। আমাদের দেশে পুনরুত্থানকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি সামাজিক উৎসবও করা হয়ে থাকে। হিন্দুদের চৈত্র-পর্ব সংস্কৃতির সংমিশ্রণে পাস্কা পর্বে থাকে মেলা, নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নতুন কাপড় পড়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ানো, খেলাধুলা ইত্যাদি। খানা-দানার মধ্যে থাকে দই বা দুধের সাথে চিড়া-মুড়ি ও নানা প্রকার মিষ্টির মিশ্রণে এক পাঁচ মিশালী খাওয়া-দাওয়া। সামাজিক বৈঠকে মুড়ি-গুড় বা মিষ্টি খাওয়ার প্রচলনও কিছু জায়গায় টিকে আছে।

পার্বত্য জেলাগুলোতে পাস্কা পর্ব উপলক্ষে চালের গুড়া দিয়ে পিঠা বা বাঁশের চোঙ্গার ভিতর 'চোঙ্গা পিঠা' তৈরী করে। গারো ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী কীর্তনে মেতে ওঠে। সামাজিকভাবে মিলিত হয়ে এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে। খাদ্য তালিকায় থাকে শুকরের মাংস। উত্তরবঙ্গের আদিবাসী ভাইবোনেরা হালকা মিষ্টি দিয়ে চালের গুড়া বা আটা দিয়ে পিঠা তৈরী করে। এই পিঠাকে বলে 'ছুনুম' পিঠা। বাঙালি ও আদিবাসী অঞ্চলের সকল পর্যায়ে স্থানীয় বিশেষ পানীয়ের একটা সামাজিক প্রচলনতো আছেই।

পাস্কা পর্ব হলো একটি আন্দোৎসব। আমরা যেমন দেখলাম বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের উৎসবের আয়োজনের মধ্য এই পর্বটি উদ্‌যাপন করা হয়। নির্মল আনন্দের সব উপাদানই এখানে থাকে। চল্লিশ দিনের প্রস্তুতি ও ধ্যান সাধনার মধ্যদিয়ে আমরা নতুন মানুষ হওয়ার নতুন প্রেরণা লাভ করে থাকি। এটাই হলো যিশুর পুনরুত্থিত নতুন জীবন। এবারের যিশুর পুনরুত্থান উৎসব পালন আমাদের সকলের জন্য শুভ হোক, মঙ্গল বয়ে আনুক।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : স্যামুয়েল পালমা, **"ইস্টার– যা এখনও অনেকের অজানা"**, স্মরণিকা "দর্পণ", ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ০৯-১৩॥ ❑

লেখক:পুরোহিত ও আইনজীবী, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ

ইস্টার সানডে'র তাৎপর্য

ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা সিএসসি

খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের নিয়ে যে মণ্ডলী গঠিত হয়েছে তাদের কাছে পুনরুত্থান পর্ব বা ইস্টার সানডে অধিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। পাপী মানুষের পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের পরিকল্পনানুসারে খ্রিস্টকে এ জগতে ঈশ্বরীয় এবং মানবীয় স্বভাবে প্রেরণ করেছিলেন। তাই মানবীয় স্বভাবে মানুষের কর্মফলের যে পাপময় অবস্থা তা থেকে মুক্ত করে আলোর মধ্যে ফিরে আসতে এই খ্রিস্টই ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আবার ঐশ্বরিক শক্তিতে মৃত্যুর তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হয়ে খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের মনে সঞ্চার করলেন আশা-আলো, শান্তি ও ভালবাসা।

খ্রিস্টানুসারী, তথা খ্রিস্ট বিশ্বাসে যাদের জীবন গড়ে উঠেছে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস হল: জীবন পথে চলতে গিয়ে খ্রিস্ট প্রদর্শিত সত্য, পথ ও জীবন; এ তিনের মধ্যদিয়ে অগ্রসর হওয়াই প্রকৃত লক্ষ্য। অতএব, ইস্টার সানডে পালনের যে পূর্ব প্রস্তুতি তার গুরুত্বও রয়েছে অনেক। যেমন প্রভু যিশু তার কর্ম জীবনের শুরুতেই পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয়ে মরুপ্রান্তরে চল্লিশ দিন ধরে নির্জন স্থানে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে ধ্যানমগ্ন ছিলেন এবং জাগতিক সর্বপ্রকার চিন্তা-ভাবনা থেকে বিরত ছিলেন যাতে ধ্যানী মনোভাব নিয়ে জগতের অহংকারপূর্ণ ক্ষমতা, ধন-সম্পদের আসক্তি এবং লোক দেখানো সম্মান থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন। আর এমন এক প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে তিনি সমস্ত অসত্য, অন্যায় ও মন্দতার উপর বিজয়ী হয়ে মানুষকে জাগতিক আসক্তি ও শত্রু থেকে মুক্তি দেন।

সুসমাচারের কথা অতীব বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য। পবিত্র বাইবেলে যিশুখ্রিস্টের জন্ম, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কথা নিহিত আছে। "খ্রিস্ট আমাদের পাপের জন্য মরেছিলেন, তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল, শাস্ত্রানুসারে তিনি তৃতীয় দিবসে উত্থাপিত হয়েছেন।" *(১ করিন্থীয় ১৫:৩-৪)*

ইস্টার সানডে'র তাৎপর্যের মধ্যে যে লক্ষ্যণীয় বিষয় তা হচ্ছে; যিশুর নিজের দেওয়া চিহ্ন-তাঁর কথা, দীক্ষাস্নান, পাপের ক্ষমা খ্রিস্ট প্রসাদ এবং আমাদের মধ্যে তাঁর 'প্রদত্ত পবিত্র আত্মা'র উপস্থিতির উপলব্ধিই আমাদের জন্য পুনরুত্থান পর্বের প্রকৃত আনন্দ। খ্রিস্ট বিশ্বাসীগণ যিশুর পুনরুত্থান পর্ব উপস্থাপন করেন এইসব লক্ষ্যণের মধ্য দিয়েই।

পুনরুত্থান পর্বের আনন্দ: খ্রিস্ট জন্মোৎসব মনে যে ভাব ও অবস্থা হয় তা হল-শান্তি ও স্নিগ্ধ-কোমলতা। আর পুনরুত্থান পর্ব বা ইস্টার সানডে'র মূলভাব হচ্ছে শান্তি ও আনন্দ। যিশুর পুনরুত্থান হল আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি ও মহা আনন্দের সুখবর। যিশুর মণ্ডলী আরম্ভ থেকে এই সুখবর সমস্ত জাতির কাছে ঘোষণা করে আসছে এবং শেষ দিন পর্যন্ত তা করবে। পুনরুত্থান ঈশ্বরের এমন মহাকাজ ও রহস্য যা মানুষের কাছে প্রকাশ করে, পরকালে ঐশ সান্নিধ্যে আনন্দময় জীবনের প্রতিশ্রুতি।

যিশুর পুনরুত্থান সমস্ত মানুষের পুনরুত্থানের অঙ্গীকার। তাই তাঁর পুনরুত্থান আমাদের কাছে সবচেয়ে আনন্দের সুখবর। পুনরুত্থান পর্বে থাকবে আনন্দ। জীবনকে দেখার এই দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত্ব করা কঠিন।

আমাদের চারপাশে সমস্ত কিছু যদি সুখময় ও আনন্দময় থাকে তাহলে পুণ্য শুক্রবারে মনের মধ্যে দুঃখবোধ সঞ্চারিত করা কঠিন। কিন্তু তার চেয়েও কঠিন আমাদের চারপাশের জীবনের দুঃখ-বেদনা উদ্বেগের মধ্যে পুনরুত্থানের আনন্দে সুখী হতে পারা। পুনরুত্থানের আনন্দ পেতে হলে চাই পরম নিঃস্বার্থপরতা ও দৃঢ় বিশ্বাস। এই আনন্দ পাওয়া আরও কঠিন এই জন্যে যে, এ আনন্দ; উৎসবের আনন্দ নয়-যদি জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা-ভাবনায় ডুবে থাকি। পুনরুত্থানের আনন্দ আরও আন্তরিক। এ আনন্দ সমগ্র বাস্তব জীবনের মুখোমুখি দাঁড়ায়-সে জীবন থেকে মৃত্যুও বাদ পড়ে না কেননা এ মৃত্যু মৃত্যুঞ্জয়-মৃত্যু অতীত যিশুর জীবনে তা প্রতিষ্ঠিত। "ওহে মৃত্যু, কোথায় তোমার সেই অংকুশ?"

এই আনন্দের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে, তা পাপের ক্ষমার সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত। দীক্ষাস্নান এবং পাপে অনুতপ্ত উপস্থিত জন মণ্ডলীকে দিয়েছে ক্ষমা। "এ জগতে আনন্দ বলে যদি কিছু থাকে, তবে সেই আনন্দ নির্মল হৃদয়ের অধিকারে।"

পৃথিবীতে যত আনন্দ আছে তার মধ্যে পবিত্রতম হল এই পুনরুত্থান-পর্বের আনন্দ। এই আনন্দের একটুখানি আভাস বর্ণনা করতে গিয়ে যিশু সেই আনন্দকে সন্তান-জন্মের পর দাইয়ের আনন্দের সঙ্গে তুলনা করেছেন, "পবিত্র আত্মা'র" বহু ফলের অন্যতম হল এই আনন্দ। সেই জন্যেই যিশু পুনরুত্থানের দিন নয়, স্বর্গে যাওয়ার পূর্বে তাঁর শিষ্যদের গায়ে নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন তাঁর তখনকার স্নিগ্ধ ভঙ্গীটির সঙ্গে তা যুক্ত। তাঁর দীক্ষাস্নান, তাঁর বাণী ও তাঁর ভোজের মতোই এই আনন্দও আমাদের মাঝখানে তাঁর উপস্থিতি সূচিত করে।

অপর যে বিষয় হচ্ছে: 'শান্তি'। আর যার উৎস স্বয়ং পুনরুত্থিত খ্রিস্ট।

"তোমাদের জন্য শান্তি রেখে যাচ্ছি,
তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি আমারই শান্তি।
জগৎ যেভাবে শান্তি দেয়,
সেইভাবে আমি তোমাদের তা দিয়ে যাচ্ছি না।" *(যোহন ১৪:২৭)*

আমাদের এই শান্তির একটি স্বর্গীয় গুণ হল যে, তা কিছুতেই ধ্বংস করা যায় না। দুঃখ-বেদনা, মানসিক অস্থিরতা ও ভয়ে এমনকি যখন আমাদের মনে হয় ঈশ্বর আমাদের ত্যাগ করেছেন, তখনও আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে এই শান্তির আভাস পাই, মর্মস্থলে এক আশ্বাসের বাণী অনুভব করতে পারি। আর এই শান্তি ঈশ্বরের দেওয়া বলে ঈশ্বরের দানের মানদণ্ডেই অনুভব করা যায়।

পুনরুত্থান রবিবার: আমাদের রবিবার আমরা পেয়েছি "পুনরুত্থান রবিবার" থেকে। কর্ম বিরতি দিনের পর দিন খ্রিস্ট মৃত্যু থেকে উত্থিত হয়েছিলেন এবং খ্রিস্ট বিশ্বাসীরা এই দিনটিকে সাপ্তাহিক উৎসবের দিন রূপে স্মরণ করেন। তারপর থেকে প্রতি রবিবারই পুনরুত্থানের স্মরণ দিবস। সমস্ত রবিবারের মধ্যে পরম রবিবার এই পুনরুত্থান-রবিবারকে পুণ্যতর করে তোলার আরও ভাল পথ হচ্ছে নতুন খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করা।

ঈশ্বর খ্রিস্টকে অধিষ্ঠিত করেছেন সমস্ত আধিপত্য, কর্তৃত্ব, শক্তি ও প্রভুত্বের বহু উর্ধ্বে; নিখিলকে তিনি রেখেছেন তাঁর পদতলে এবং তাঁকে সমস্ত কিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত করে তিনি তাঁকে করে তুলেছেন মণ্ডলীর মস্তকস্বরূপ। মানব যিশু ঈশ্বরের মহত্তম সৃষ্টি-সৃষ্টির গৌরব মুকুট। এই জগতে যা কিছু জন্মায়, এ জগতে যে কেউ জন্মায়-সব তাঁর অভিমুখেই ছুটে চলেছে, কেননা তাঁরই মধ্যে ঈশ্বর প্রকাশিত হয়েছেন।

এই কথাটিই সাধু পল একটি স্তবের মধ্যে ব্যক্ত করেছেন:

"খ্রিস্টযিশু অদৃশ্য পরমেশ্বরের প্রতিমূর্তি।
বিশ্ব সৃষ্টির অগ্রজ তিনি।" *(এফেসীয় ১:২০-২৩)* ❑

লেখক: ব্রাদার ও লেখক, প্রবিত্র ক্রুশ সংঘ

বাংলার ঘরে পুনরুত্থিত যিশুর বাণী

সিস্টার মেবেল রোজারিও এসসি

"অনেকেই আমাদের পছন্দ করে
অনেকে আমাদের ভালোও বাসে
শুধুমাত্র একজন যিনি আমাদের ভালোবেসে
তাঁর জীবন দিলেন, ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ করলেন,
তিনি কিন্তু কবরে নেই, তিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন
তিনি জীবিত! তিনি পুনরুত্থিত॥

বেশ কয়েক বছর আগে এক ইস্টারে এই বাণীটি আমার জীবনকে স্পর্শ করেছে, আমার খ্রিস্টীয় বিশ্বাসকে দৃঢ় করেছে এবং আমি মনে করি ইস্টারের জন্য এটা সত্যময় বাণী। ইতিহাসের পাতায় আমরা অনেক দ্বিগীজয়ী বীর, মহিয়সী মানব-মানবী, ধর্ম প্রবর্তক, গুরুজী পাই যারা বিশ্বের বুকে রেখে গেছেন মহান কীর্তি, যাদের আদর্শ অনুসরণীয়, অনুকরণীয়। তাঁরা সবাই মৃত্যুবরণ করেছেন কিন্তু কেউ পুনরুত্থিত হননি। শুধুমাত্র যিশু মৃত্যুঞ্জয়ী, পুনরুত্থিত। এতো এক ঐতিহাসিক, অভিনব, কঠিন সত্য ঘটনা। যিশু যদি পুনরুত্থিত না হতেন তাহলে হয়তো আজ আমরা "খ্রিস্টান" পরিচয়-পত্র পেতামনা। তাই যিশুর পুনরুত্থান আমাদের পথ চলাকে করে আশান্বিত, আলোকিত। আমরা হয়ে উঠি নতুন জীবনের মানুষ। এই ২০২২ খ্রিস্টাব্দ ইস্টারে বর্তমান বাস্তবতার আলোকে যিশু আমাদেরকে বিশেষ বাণী শুনাতে চান। আমার চিন্তা-চেতনায়, ধ্যান-ধারণায় এবারের ইস্টারে সবার জন্য উপহার: বাংলার ঘরে পুনরুত্থিত যিশুর বাণী। আমার চিন্তায় আসে যিশু বলছেন: তোমরা হও

বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘের মতো কর্মচঞ্চল
জৈষ্ঠের রোদের মতো বিশ্বাস তেজোদীপ্ত
আষাঢ়ের বৃষ্টির মতো সেবাকাজে হও প্রাণবন্ত
শ্রাবণ ধারার মতো পবিত্র, আলোকিত মানুষ
শীতের ন্যায় চিন্তা-চেতনায়, ধ্যানে নিমগ্ন
ফাল্গুনের কৃষ্ণচূড়া, শিমুলরাঙা পলাশের মতো
টগবগে বলিষ্ঠ জীবন সাক্ষ্যদানকারী,
চৈত্রের আগুনে
পোড়া সোনার বাংলার খাঁটি সোনার খ্রিস্ট অনুসারী

বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘের মতো কর্মচঞ্চল: প্রায় দু'বছর ধরে করোনা এর কারণে জীবনের সকল স্তরে, সব শ্রেণির মানুষের জীবনে এসেছে স্থবিরতা, থমকে যাওয়া সব। কর্মে ধ্যানী, কাজ পাগল, কর্তব্য নিষ্ঠা, কর্মচঞ্চল চলার গতিতে কেমন যেন ভাটা পড়েছে। বিশেষভাবে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় অমনোযোগিতা, বেশী কথা বলা, কাজ কম, বুদ্ধি খাটিয়ে ভালো কিছু করা বা উদ্ভাবক শক্তি বা ক্ষমতা প্রয়োগে পড়াশুনায় অনীহা বাড়ছে। youtube এ সকল প্রশ্নোত্তর, সমস্যার সমাধান সহজে হাতের মুঠোয়, ইচ্ছাশক্তি, চিন্তাশক্তির ব্যবহার কমে যাচ্ছে। কষ্টস্বীকার করে ভালো ফলাফল অর্জনে অলসতা লক্ষ্যণীয়। তাইতো পুনরুত্থিত যিশু আহ্বান করছেন কর্মমূখর নব উদ্যোগে জীবনের যাত্রা অব্যাহত রাখতে।

জৈষ্ঠের রোদের মতো বিশ্বাসে তেজোদীপ্ত: গত দু'বছর করোনার ছোবলে খ্রিস্ট বিশ্বাস অনুশীলনে এসেছে উদাসীনতা। ছেলেমেয়েরা নিয়ম-শৃঙ্খলার বাইরে অবস্থান করছে। রোব বারে গির্জায় যাওয়া অনেকটাই আনুষ্ঠানিকতা। মীসা চলাকালে কথা, বাইরে দাঁড়িয়ে মোবাইলে কথা, সেলফি তোলা, মিউজিক শোনা ইত্যাদি চলছে। পিতামাতাদের অভিযোগ সন্তান শাসন মানেনা, পারিবারিক সান্ধ্য প্রার্থনায় যোগদান করেনা। আবার অনেক পিতা-মাতা, অভিভাবক চাকুরী, অন্যান্য পেশাগত কারণে গির্জায় যায়না, সময় খুঁজে নেয়না, ছেলেমেয়েদের উৎসাহিত করেনা। অনেকেই ভুলে যাচ্ছে বিশ্বাসে বলীয়ান, তেজোদীপ্ত না থাকলে আধ্যাত্মিক করোনায় আক্রান্ত হয়ে জীবন পঙ্গু হয়ে পড়বে, মৃতের মতো বেঁচে থাকতে হবে।

আষাঢ়ের বৃষ্টির মতো সেবা কাজে প্রাণবন্ত হও: স্নেহ-মায়া মমতা, সেবা ভালোবাসা পরিবারের প্রাণকেন্দ্র। বর্তমানে পরিবারগুলোতে পারস্পরিক ছোট্ট ছোট্ট সেবা কাজ, শ্রদ্ধা প্রদর্শন, বৃদ্ধদের যত্ন নেওয়া, সংলাপ, মতামত বিনিময় এ গুলো রূপ নিয়েছে স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা। কর্তব্যের খাতিরে দায়বদ্ধতা সরিয়ে নেওয়ার মনোভাব কাজ করছে। পুনরুত্থিত যিশু বলছেন, "সেবা-ভালোবাসা ছিল আমার মূলমন্ত্র, জীবন ব্রত; তোমরা প্রেমপূর্ণ সেবা কাজে প্রাণবন্ত হও।

শ্রাবণ ধারার মতো আলোকিত, পবিত্র হও: "তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন পবিত্র, তেমনি তোমরাও পবিত্র হও।" তপস্যাকালে বিভিন্ন ত্যাগ সাধনার ফলে আমরা মন্দতাকে বর্জন, ভালোকে অর্জন, আত্মশুদ্ধি, আত্মসংযম কিছুটা হলেও আমাদের পুরানো আমিত্বটাকে নবীকৃত করেছে। আত্মমূল্যায়ন অনুশীলন চলমান রেখে আমরা যেন আলোকিত হৃদয়-মন পবিত্র থাকার যাত্রা আব্যাহত রাখি।

শীতের ন্যায় চিন্তা-চেতনায়, মননে, কর্মে ধ্যানে প্রকৃত পুনরুত্থিত খ্রিস্টের অনুসারী হওয়ার একটি বড় চ্যালেঞ্জ এই ইস্টার। ধ্যানী, জ্ঞানী, গুণী, মানী হয়ে উঠতে প্রয়োজন যিশুর শিক্ষায় নিমগ্ন হওয়া। প্রতিনিয়ত আমরা একটি গানের কলি যেন ধ্যানে রাখি: "ওহে খ্রিস্টভক্তগণ, খোল নয়ন, যিশুর প্রেমের শিক্ষায় হও মগন"- হৃদয়-মন খোলা রাখি, নব দৃষ্টি পরিধান করি।

বাংলার ঘরে পুনরুত্থিত যিশুর সর্বশেষ বাণী: জীবন সাক্ষ্যদানকারী, সোনার বাংলার খাঁটি সোনার খ্রিস্ট অনুসারী হওয়া। আমরা পচা-গলা কবরে মৃত দেহ নই; পক্ষান্তরে পুনরুত্থিত, জীবন্ত খ্রিস্টের সাক্ষ্যদানকারী। ২০০০ খ্রিস্টাব্দ যিশুর জন্ম-জয়ন্তীতে আমি একটা ধর্মপল্লীর একটি খ্রিস্টান, মুসলিম, হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামে গিয়েছিলাম একটা ইন্টারভিউ নিতে। প্রশ্ন রেখেছিলাম অন্যধর্মাবলম্বী একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির কাছে। "খ্রিস্টানদের পাশাপাশি বসবাস করছেন, সু-সম্পর্ক বজায় রেখেছেন, আপনার দৃষ্টিতে, অভিজ্ঞতায় একজন খ্রিস্টানের কি পরিচয় আপনার অনুভূতি প্রকাশ করবে?" উনার উত্তর ছিল আমার জন্য বিস্ময়কর হতাশাজনক। খ্রিস্টানরা রোববারে গির্জায় যায়, মদ খায়, শুকরের মাংস খায়।" এটাই কি আমাদের পরিচয়? না, আমাদের পরিচয় হোক খ্রিস্টের সাক্ষ্যদান, আমরা ভালোবাসার মানুষ, সৎ পথে চলি, সত্য কথা বলি, ক্ষমাশীল ভালোবাসায় খ্রিস্টীয় পরিবার গড়ি। পুনরুত্থিত যিশু আমাদের পথ চলার সাথী, "যা কিছু সুন্দর, কল্যাণকর, শোভনীয় তাই আমাদের ধ্যান-জ্ঞান।" ❑

লেখক:সিস্টার, অব-চ্যারিটি সংঘ, বোর্ণী ধর্মপল্লী

পুনরুত্থানের ভাবনা

ফাদার লেনার্ড আন্তনী রোজারিও

পৃথিবীর সুদীর্ঘ যাত্রা কালের পরিক্রমার সুদীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমরা জানতে পারি যে ঈশ্বরপুত্র যিশুখ্রিস্ট মৃত্যুর তিনদিন পরে তার আপন মহিমা গুণে পুনরুত্থিত হয়েছেন। এটা সমগ্র পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া সকল ঘটনা সমূহের মধ্যে এক, অনন্য এবং অসাধারণ ঘটনা। যিশুখ্রিস্টের জন্ম, মৃত্যু ও পুনরুত্থান হলো একটি রহস্যাবৃত্ত সত্য ঘটনা। প্রথম আদমের অবাধ্যতার ফলে যে পাপ, মন্দতা এবং দূরত্ব ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল তা দ্বিতীয় আদম অর্থাৎ যিশুখ্রিস্টের জন্ম, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের গুণে আমাদের পাপ থেকে মুক্তিদানের মাধ্যমে পুনরায় ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। তাহলে আমরা দেখি যে যিশুর পুনরুত্থানের ঘটনা কোন আকস্মিক ঘটনা নয় বরং এটা ঈশ্বরের মহা পরিকল্পনার একটা অংশ। যার প্রধান ও অন্যতম লক্ষ্য ছিল তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যেন পাপে পতিত হয়ে তার কাছ থেকে চিরতরে দূরে সরে না যায় বরং তার একমাত্র পুত্রের ক্রুশীয় মৃত্যু ও পুনরুত্থানের গুণে যেন আমরা পুনরায় তার কাছে ফিরে যেতে পারি।

যিশুর গৌরবময় পুনরুত্থান শুধুমাত্র অতীতের ঘটে যাওয়া সাধারণ কিছু ঘটনার সমষ্টিকে স্মরণ করা নয় বরং এগুলো আমাদের জীবনে জীবন্ত প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা। পুনরুত্থানের সময় আমরা স্মরণ করি যে, যিশু আমাদের সকলের পাপের কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তিন দিন পরে পুনরুত্থান করেছেন অর্থাৎ তিনি মৃত্যুকে জয় করে আমাদের জন্য নব জীবনের সন্ধান দিয়েছেন যেন আমরাও পাপময় মৃত্যুকূপ থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর সাথে মিলিত হতে পারি অর্থাৎ পাপময় অবস্থা থেকে নতুন জীবনে প্রবেশ করতে পারি। খ্রিস্টীয় উপাসনার বর্ষপুঞ্জি অনুসারে যদিও আমরা শুধুমাত্র একটি দিন অর্থাৎ রবিবার পুনরুত্থান উৎসব পালন করে থাকি কিন্তু এটি মূলত শুরু ভস্ম বুধবার থেকে এবং চলে পঞ্চাশত্তমী পর্যন্ত। পুনরুত্থান কালকে উপাসনা বর্ষপুঞ্জির কেন্দ্রীয় দিন বা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

পুনরুত্থান পর্ব হচ্ছে উপাসনা বর্ষের শ্রেষ্ঠ পর্ব। কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষার ১১৬৯ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "পুনরুত্থান পর্ব হচ্ছে পর্বের পর্ব" এবং "মহোৎসবের মহোৎসব"। মহান সাধু আথানাসিউস পুনরুত্থান দিবসটিকে 'মহারবিবার' হিসেবে অভিহিত করেছেন। বহু বছর ধরে আমরা জেনে আসছি যে, এই মহান ঘটনার উপর ভিত্তি করেই প্রেরিতদূতদের বিশ্বাস, আদি খ্রিস্টসমাজের বিশ্বাস, সমগ্র মণ্ডলীর বিশ্বাস তথা আমাদেরও বিশ্বাস গড়ে উঠেছে। সুতরাং পুনরুত্থান পর্ব পালন করার মধ্যদিয়ে আমরা আমাদেরই পর্ব পালন করে থাকি। পুনরুত্থান অর্থ মৃত্যুর উপর জয়লাভ, নতুন জীবনের সূচনা। পাপের ফলে মানুষ ও সমগ্র সৃষ্টি বাধা-বন্ধন ও মৃত্যুর শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। প্রভু যিশু সেই মানব সমাজের একজন হয়ে আমাদের নামে ও আমাদের স্থানে মৃত্যুবরণ করে পিতার শক্তিতে পুনরুত্থান করেছেন। এভাবে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর অধীন মানুষের জন্য চিরস্থায়ী গৌরবময় জীবন লাভের সম্ভাবনা এনে দিয়েছেন। পুনরুত্থিত খ্রিস্টে বিশ্বাসী হয়ে জীবন যাপন করলে আমরাও এই নতুন সৃষ্টির অধিকারী হয়ে উঠি। সাধু আগষ্টিন যথার্থই বলেছেন, "আমরা পুনরুত্থানের জনগণ এবং আল্লেলুইয়া আমাদের গান"।

নিস্তার পর্বের রহস্য হলো যিশুর জীবনের মূল রহস্য এবং খ্রিস্ট মণ্ডলীর গোটা জীবনের চলিকা শক্তি। তাই বলা যায় যে নিস্তার পর্বের নতুন রূপ হলো পাস্কা পর্ব এবং খ্রিস্ট নিজেই হলেন বলিকৃত মেষ। যিশুর পুণ্য রক্তের গুণে আমাদের মুক্তির পথ রচিত হয়েছে। পাস্কা পর্ব উদ্‌যাপনের মধ্যদিয়ে পুরাতন এবং নতুন নিয়মের মুক্তি রহস্যটি প্রাধান্য পায়। ইহুদীদের মুক্তি ছিলো ভৌগলিক এলাকা থেকে স্বাধীন দেশে বা প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশের মুক্তি ও আনন্দ এবং অন্যদিকে নতুন নিয়মের মুক্তি হলো পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তি, সামাজিক জীবনের মন্দতা, বন্ধন ও সামাজিক বৈষম্যের বন্ধন থেকে মুক্তি। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার উপাসনা বিষয়ক দলিলে নিস্তার রহস্যে বর্ণনায় বলা হয়েছে-পুরাতন নিয়মের জনগণের মধ্যে ঈশ্বরের বিস্ময়কর কাজগুলো মানুষের মুক্তি সাধনে ও ঈশ্বরকে পরিপূর্ণ প্রশংসা নিবেদনে যন্ত্রণাভোগ, পুনরুত্থান ও গৌরবময় স্বর্গারোহণের যে নিস্তার রহস্য তারই মধ্যদিয়ে, যার মাধ্যমে যিশু মৃত্যুবরণ করে আমাদের মৃত্যু নাশ করেছেন এবং পুনরুত্থিত হয়ে আমাদের জীবন ফিরিয়ে এনেছেন। কারণ ক্রুশে প্রাণ দেয়ার সাথে সাথে খ্রিস্টের বক্ষ থেকেই নিঃসৃত হয়েছে সমগ্র মণ্ডলীর বিস্ময়কর সংস্কারটি। উষর-ধূসর, ধুলিকণার শুষ্ক পরিবেশে পুনরুত্থিত খ্রিস্ট আসে বিশ্বাসের নব জাগরণে প্রাণে প্রাণে নব চেতনায় দোলে জীবনের শুভারম্ভে।

খ্রিস্ট যদি পুনরুত্থান না করতেন তাহলে আমরা পাপ থেকে মুক্ত হয়ে অনন্ত পরিত্রাণের আশা করতে পারতাম না। খ্রিস্টের পুনরুত্থান মিথ্যা হলে সারা পৃথিবীর মানুষ খ্রিস্টকে বিশ্বাস করত না, শিষ্যদের প্রচারেরও কোন অর্থ হতো না। কারণ আমাদের বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা সবকিছুর চরম লক্ষ্য ও পরম পাওয়া হচ্ছে অনন্ত জীবন, ঈশ্বরের শ্রীমুখ দর্শন, আর পুনরুত্থানেই আমাদের জন্য সেই অনন্ত জীবনের দ্বার উন্মোচন করে। এই নশ্বর দেহের পুনরুত্থানের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়, কারণ মরদেহ গ্রহণ করে খ্রিস্ট নিজেই এই দেহকে মহিমান্বিত করেছেন এবং আমাদেরও একই মহিমার সহভাগী করেছেন। শেষদিনে আমরা পুনরুত্থিত হয়ে ঐশরাজ্যের মহা মিলনভোজে একত্রে মিলিত হব। তাই খ্রিস্টের জন্ম বা জাগতিক জীবন অপেক্ষা তাঁর স্বশরীরে পুনরুত্থান এবং আমাদের কাছে পুনরুত্থিত হওয়ার অঙ্গীকারই হচ্ছে আমাদের বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু। এই বিশ্বাসেই আমরা পরিত্রাণ লাভ করব। তাই সাধু পৌল বলেন, "মুখে তুমি যদি সকলের সামনে যিশুকে প্রভু বলে স্বীকার করে এবং অন্তরে যদি বিশ্বাস কর যে, পরমেশ্বর তাকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই পরিত্রাণ লাভ করবে", *(রোমীয় ১০:৯)*। খ্রিস্ট পৃথিবীতে প্রতিনিয়তই পুনরুত্থান করছেন এবং আমাদেরকে প্রতিনিয়তই আহ্বান করে যাচ্ছেন যেন আমরা পাপ মুক্ত হয়ে নব জীবনের দিকে দিন দিন এগিয়ে চলি। খ্রিস্ট যেভাবে পুনরুত্থিত হয়ে মৃত্যুর অহংকার নাশ করে অমর হয়ে আমাদের মাঝে সদা বিরাজমান আমরাও যেন তেমনি তার পুনরুত্থানের গুণে হতাশা-নিরাশা শৃঙ্খলা ভেঙ্গে ফেলে নতুন আশা ও নতুন উদ্দীপনা নিয়ে সত্যের পথে এবং জীবনের পথে অগ্রসর হতে পারি। এটাই হোক আমার, আপনার এবং সকলের একান্ত সাধনা॥ ❑

লেখক: সহকারী পাল পুরোহিত
মিরপুর ধর্মপল্লী, ঢাকা

নবজীবনের মহোৎসব পুনরুত্থান

নোয়েল গমেজ

সারা পৃথিবীতে খ্রিস্টবিশ্বাসীরা মহাসমারোহে পালন করছে মৃত্যুঞ্জয়ী প্রভু যিশুর গৌরবময় পুনরুত্থান মহোৎসবে পাস্কা বা ইস্টার। সবাই উচ্চ কণ্ঠে গেয়ে উঠছে: আল্লেলুইয়া অর্থাৎ জয় প্রভুর জয়! পাস্কা-রহস্যটি যতই অনুধ্যানে অনুধাবন করতে পারব, ততই তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে যিশুর সাথে নতুন হয়ে উঠতে পারব।

আলোর মহোৎসব ইস্টার: পুনরুত্থান মোমবাতি ও নিস্তার বন্দনা: বস্তুত শনিবার রাত থেকেই এই নবজীবনের মহোৎসবে পাস্কা শুরু হয়। অন্ধকারের। মাঝে আগুন আশীর্বাদ; প্রার্থনায় যাচ্না করা হয় খ্রিস্টের পুনরুত্থানের আলো যেন মানুষের মনের সকল অন্ধকার দূরীভূত করে। আশীর্বাদিত আগুন থেকে জ্বালানো হয় পুনরুত্থান প্রদীপ, চলতি সাল সমেত পঞ্চক্ষতের পাঁচটি ধূপকাঠি লাগানো এক বিরাট আকারের মোমবাতি যা ঘোষণা করে: আদি ও অন্ত যিনি সেই যিশুর পুনরুত্থান মানুষের জীবনে এনেছে নতুন আলো, নতুন জীবন; যিশুর পুনরুত্থান দূরীভূত করেছে পাপের অন্ধকার; মানুষ মৃত্যুঞ্জয়ী যিশুখ্রিস্টের সাথে হয়েছে নবীভূত। আজকের এই মহোৎসব আলোর মহোৎসব। তাই পুনরুত্থান বাতি সামনে নিয়ে প্রজ্জ্বলিত বাতি হাতে নিয়ে শোভাযাত্রা করে প্রবেশ করে উপাসনালয়ে; ঘোষণা করে পুণ্য জ্যোতির মহিমা।

আহ্বান: এই উৎসব আমাদের সবাইকে আলোকিত ও নবায়িত মানুষ হয়ে যিশুর সাথে পুনরুত্থিত হয়ে তাঁর আলোতে উদ্ভাসিত হতে আহ্বান জানায়। আর তাই ভক্তসমাজ তার দীক্ষার প্রতিজ্ঞা নবায়ন করে এবং আশীর্বাদিত দীক্ষাজল দ্বারা নিজেকে সিঞ্চিত করে। আর এইভাবেই ভক্ত পাপ পরিত্যাগ করার সংকল্প করে আর বিশ্বাস নবায়ন করে পুনরুত্থিত খ্রিস্টে নতুন 'আমি'তে পরিণত হয়।

আসুন সাধু পলের মতো আমরাও বলি: আমার পুরাতন 'আমি' যিশুর সাথে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে; যিশুর সাথে আমার নতুন 'আমি'টি জেগে উঠেছে। *(গালাতীয় ২:২০-২১)*।

পুনরুত্থান রবিবার, ইস্টার সানডে: এদিন নতুন সাজে ছোটবড় সবাই ইস্টার সানডে বা পুনরুত্থান রবিবারের খ্রিস্টযাগে তথা উপাসনায় অংশগ্রহণ করে। গির্জাঘর থাকে খ্রিস্টভক্তগণ পূর্ণ:উপাসনার পরেই চলে আপন আপন কৃষ্টিতে ইস্টারের শুভেচ্ছা বিনিময়।

ইস্টার ও আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি: বাংলাদেশের মানুষ ঐতিহ্যগতভাবে শান্ত মানুষ; উগ্রতা তার ধর্ম নয়। ঐতিহ্যগতভাবেই আমাদের দেশের মানুষ মিলনের কৃষ্টির মানুষ, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান একত্রে বাস করে আসছে যুগ যুগ ধরেই। বাংলার মানুষের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে যায় বিদেশি বন্ধুরা। ঘরে ঘরে আয়োজন করা হয় দৈ, চিড়া-মুড়ি-মুরকির মতো হরেকরকম মুখরোচক আহার সামগ্রী। শুভেচ্ছা বিনিময়ে ও আহারে অংশগ্রহণ করবে ঘরের সবাই, পাড়া প্রতিবেশি সবাই। এই আসরে অনেক সময়ই নিমন্ত্রিত হয় হিন্দু-মুসলিম ভাই-বোনেরাও। অতএব এই মহোৎসবে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির প্রকাশ পুনরুত্থিত যিশুর বা ইস্টার সান ডে'র একটি আশীর্বাদ।

ইস্টার তথা যিশুর পুনরুত্থান-রহস্য খ্রিস্টধর্মের একটি প্রধান ধর্মীয় বিষয়, ধর্মীয় অনুষ্ঠান। খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের ভিত্তিই হলো যিশুর এই পুনরুত্থান। অন্যান্য ধর্মের যেমন প্রধান প্রধান ধর্মীয় পূজা বা ঈদ রয়েছে ইস্টার তেমনই একটি মুখ্য খ্রিস্টীয় ধর্মীয় মহোৎসব।

পরিতাপের বিষয়, ইস্টারের দিনটি সরকারী ছুটির দিন নয়। দেশের সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ বিষয়টি বিবেচনায় আনবেন, এটি আমাদের প্রত্যাশা। এই ইস্টারে খ্রিস্টবিশ্বাসী আমাদের সবার বিনম্র অনুরোধ যে, এই দিনটিকে ঐচ্ছিক নয় বরং সাধারণ ছুটি বা Public Holiday হিসেবে অনুমোদন দিলে পুনরুত্থান রবিবারে মুক্ত মন নিয়ে খ্রিস্টান ছাত্র-ছাত্রীরা, চাকুরিজীবীরা এবং সকল পর্যায়ের খ্রিস্টান নারী-পুরুষ গির্জায় যেতে পারবে এবং পারিবারিক, সামাজিক, কৃষ্টিগত ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবে; সর্বোপরি সর্বজনীনভাবে খ্রিস্ট বিশ্বাসের কেন্দ্রীয় রহস্যভিত্তিক এই মহোৎসবটি সবার কাছেই সর্বাধিক গুরুত্ব পাবে, পরিচিত হবে।

হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবার প্রতি রইলো শুভ পাস্কা পর্বের প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা। পুনরুত্থিত যিশুর শান্তি ও আনন্দ সবার ঘরে ঘরে বিরাজ করুক। শুভ পাস্কা, শুভ পুনরুত্থান, হ্যাপি ইস্টার!! খ্রিস্ট সত্যই পুনরুত্থান করেছেন, আল্লেলুইয়া!!

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:
ফাদার প্যাট্রিক গমেজ, **মাসিক ইছামতি বাণী,** সংখ্যা ৯-১০, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ॥ ❑

নিয়মিত লেখক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

খ্রিস্ট সত্যিই পুনরুত্থান করেছেন!

ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ডি'ক্রুশ

খ্রিস্ট সত্যিই পুনরুত্থান করেছে আল্লেলুইয়া; পুনরুত্থানকালে এই বার্তা, বিশেষত পুনরুত্থান অষ্টাহে এই মন্ত্রই প্রতিজন খ্রিস্টভক্তের মুখে মুখে উচ্চারিত একমাত্র বাণী। ভক্ত সকলের মুখে মুখে এই বাণী ধ্বনি, প্রতিধ্বনি হতেই থাকে কি উপাসনায়, কি শুভেচ্ছায়। এই বাণী উচ্চারণের মাধ্যমেই আমরা সকলে প্রভুর পুনরুত্থানের বার্তা ঘোষক হই, আমরা মঙ্গলবাণীর বাহক হই, আমরা খ্রিস্টের পুনরুত্থানের সাক্ষী হই। হ্যাঁ, মৃত্যুই শেষ নয়, কারণ তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন। আর তাঁর পুনরুত্থানই খ্রিস্ট বিশ্বাসের মূলস্তম্ভ। তিনিই একমাত্র মহাপুরুষ যিনি পুনরুত্থান দ্বারা মৃত্যুকে জয় করেছেন এবং শয়তানের অপশক্তি পরাজিত করেছেন। সুতরাং খ্রিস্টবিশ্বাসীদের ভয় কেটে গেছে। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জন্য মৃত্যু বা শয়তানকে ভয় পাওয়ার আর কোন কারণ নেই। কারন আমাদের প্রভ যিশুখ্রিস্ট মৃত্যু বিজয়ী হয়েছেন। মৃত্যুরহুল, শয়তানের অপশক্তিকে পরাজিত করেছেন। তাদের রাজত্বের অবশান এনেছেন।

খ্রিস্টযিশুর পুনরুত্থানে বিশ্বাসের ফলেই আমরা খ্রিস্টান। পবিত্র বাইবেল এই সাক্ষ্য দেয় যে, যখন মাগ্দালার মারীয়া ও যিশুর অন্য শিষ্যরা তাঁর মৃত্যু ও সমাধির তৃতীয় দিন অর্থাৎ রবিবার দিন ভোরে সমাধি স্থানে এলেন, যেখানে যিশুর মৃতদেহ রাখা হয়েছিল। তারা সেখানে যিশুর মৃতদেহ পায়নি। পেয়েছে স্বর্গ দূতের সাক্ষাৎ *(মথি ২৮:৫-৭)*। স্বর্গদূত তাদের বলেছেন যিশু জীবিত হয়েছেন। তিনি মৃতদের মধ্যে আর নেই। তিনি যেমনটি বলেছেন তিনি পুনরুত্থান করবেন এবং শাস্ত্রবাণী পূর্ণ করে তিনি মহাপরাক্রমে পুনরুত্থান করেছেন। যিশুর জন্মের সংবাদ যেমন একদল স্বর্গদূত উল্লাসে ঘোষণা করেছেন ঠিক পুনরুত্থানের পরেও স্বর্গদূত মানুষের অন্তরে বিশ্বাসের দ্বার খুলে দিয়েছেন।

খ্রিস্ট মণ্ডলীর শুরুতেই যিশুর পুনরুত্থানের বিষয়টিই ছিল প্রচারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সাধু পিতরের প্রচার কার্যে তিনি পুনরুত্থিত যিশুর কথাই প্রচার করেছেন *(শিষ্যচরিত ২:৩২)*। তিনি পুনরুত্থিত যিশুর নামে রোগীদের সুস্থ করেছেন। পুনরুত্থিত যিশুর নামে সহ্য করেছেন নির্যাতন, অপমান, বেত্রাঘাত, কটুকথা আরো কত নির্মমতা। কিন্তু যার নামে এত কিছু সেই যিশু কি সত্যিই পুনরুত্থান করেছেন? এমন কোন প্রমাণ কি আছে যা দ্বারা আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে, যিশু পুনরুত্থান করেছেন? এমন কোন যুক্তি কি আছে যা দ্বারা আমরা অন্যের কাছে যিশুর পুনরুত্থানের রহস্য ঘোষণা করতে পারি? হ্যাঁ এই রকম অনেক প্রমাণই আছে যে যিশু পুনরুত্থান করেছেন।

যিশুর পুনরুত্থান বিশ্বাস করতে হলে আমাদের সর্ব প্রথমে পুনরুত্থান বলে যে কিছু আছে তাতে বিশ্বাস করতে হবে। যদি আমরা পুনরুত্থান বিশ্বাস না করি তাহলে যিশুর পুনরুত্থানও আমাদের জন্য অর্থহীন হবে; যেমন সাদুকীরা পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতো না। তাই তাদের কাছে পুনরুত্থান বলে কোন কিছুই নাই। যিশুর পুনরুত্থানে বিশ্বাসের জন্য যিশুর যন্ত্রণাময় ক্রুশীয় মৃত্যুতে বিশ্বাস করতে হবে। যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যু একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, যা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তাঁকে নিরবে, নিভৃতে হত্যা করা হয়নি, বরং হাজার হাজার লোকের সামনে তাঁকে নির্যাতন করা হয়েছে এবং এমন একটি স্থানে তাঁকে ক্রুশে দেয়া হয়; যেখান থেকে তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যু সকলের কাছে দৃশ্যমান হয়। এই সত্য শুধু মাত্র মনের বিশ্বাসের বা ধর্মগ্রন্থের কথা নয় এটা একটা ইতিহাস। তিনি যদি মৃত্যুবরণ না করেন, তাঁকে যদি সমাহিত করা না হয়, তাহলে তাঁর পুনরুত্থানের দাবীও অবান্তর। তাই যিশুর পুনরুত্থানে বিশ্বাসের পূর্বে তার মৃত্যুতে বিশ্বাস করা জরুরী। ইসলাম ধর্মানুসারীরা বিশ্বাস করে যে যিশু ঈশ্বর প্রেরিত এক মহান ব্যক্তি যিনি মরতে পারেন না বা ঈশ্বর তাঁকে মরতে দিতে পারেন না। তাই তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে যিশু ক্রুশে মারা যাননি। দয়ালু ঈশ্বর তাঁর (যিশুর) স্থলে অন্য কাউকে রেখে দিয়েছিলেন এবং সেই ব্যক্তিই ক্রুশে মারা যান আর ঈশ্বর যিশুকে উর্ধ্বে তোলে নিয়েছেন *(কোরান ৪:১৫৭-১৫৯)*।

যিশুর পুনরুত্থানের সত্যতার প্রমাণ মেলে তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে। কেননা তারা যিশুর নির্যাতন, যন্ত্রণা ও মৃত্যুর চাক্ষুস সাক্ষী। তারা বিশ্রামবারের পরে যিশুকে সমাধি স্থানে খুঁজতে গিয়েছিলেন। তারা মৃতদেহ খুঁজে পাননি। কিন্তু তারা পুনরুত্থিত যিশুর দেখা পেয়েছেন, তার মধ্যে অন্যতম একজন নারী মাগ্দালার মারীয়া *(যোহন ২০:১১-১৮)* এবং পরে অন্য শিষ্যগণও। তারা শুধুমাত্র পুনরুত্থানে বিশ্বাসই করেননি কিন্তু তারা তাদের বিশ্বাসের ফল স্বরূপ স্বশরীরে তাঁর দেখা পেয়েছেন। তাদের বিশ্বাস ও চর্ম চৌক্ষে দেখা পুনরুত্থিত যিশুর সত্যতা তারা ঘোষণা করেছেন। সাধু পল সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন যে যিশু পাঁচশ'র বেশী লোককে দেখা দিয়েছেন, যাকোব এবং অন্যান্য প্রেরিতদূত এমনি কি তিনি নিজেও পুনরুত্থিত যিশুকে দেখেছেন *(১ম করিন্থিয় ১৫:৩-৮)*। যারা পুনরুত্থানের পর যিশুর দেখা পেয়েছেন তারা সবাই তার সাক্ষ্য দিয়েছেন। সুতরাং যিশু যে পুনরুত্থান করেছেন তার অনেক অকাট্য যুক্তি রয়েছে, সম্পূর্ণ বাইবেল জুড়েই তার প্রমাণ মেলে।

যিশু ব্যক্তি বিশেষে আবার হাজার জনতাকে দেখা দিয়েছেন। তিনি যেমন হাজার জনতার সামনে ক্রুশে ঝুলেছেন, মৃত্যুবরণ করেছেন; তেমনি পুনরুত্থানের বিজয় নিশানাও উড়িয়েছেন হাজার মানুষের মাঝেই। যারা তাঁকে দেখেছে তারাই বলেছে "আমরাই এই সবকিছুর সাক্ষী"। তিনি ব্যক্তিগতভাবে বেশ কয়েকজন শিষ্যকে দেখা দিয়েছেন। আবার শিষ্যদের সমাবেশে, বন্ধ ঘরে অনেকের মাঝে দেখা দিয়েছেন। যারা তাঁর সাক্ষাতের বিষয় প্রশ্ন তোলেছে তিনি তাদেরকেও সন্দেহ মুক্ত করেছেন। তিনি (অবিশ্বাসী) সাধু টমাসের মনের অবিশ্বাস নিরসনের জন্য নিজের হাত, পা বাড়িয়ে দিয়েছেন, বুকের পাশ মেলে দিয়েছেন। তিনি নিজেই সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে তিনিই সেই যিশু যাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, তিনিই সেই যিশু যিনি পুনরুত্থান করেছেন।

মৃত্যুর পূর্বে জীবিত যিশু যেমন আপন শক্তি দ্বারা আশ্চর্য কর্ম সাধন করেছেন। মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পরেও তিনি অলৌকিক কর্ম ঘটিয়েছেন এবং যারা যিশুর পুনরুত্থানের সাক্ষাৎ পেয়েছে তারাও সেই শক্তির অধিকারী হয়েছেন। তাই এটা খুবই লক্ষ্যণীয় যে পুনরুত্থিত যিশুর সাক্ষাতে শিষ্যগণ শক্তিমান হয়েছেন, তাদের জীবন পরিবর্তন হয়েছে, তারা সাহসী ও উদ্যোগী হয়েছে। পুনরুত্থিত যিশুর নামে তারা অনেক আশ্চর্য কাজ করেছে *(শিষ্যচরিত ৪:১০-১৩)*। যিশুর পুনরুত্থানের কথা ঘোষণা করেছে এবং পরাক্রমশালী ঈশ্বরের মহাপরিকল্পনার বিষয় সাক্ষ্য বহন করেছেন। যিশুই যে খ্রিস্ট, ঈশ্বরের পুত্র এবং ঈশ্বর তাঁকে পুনরুত্থিত করেছেন সেই বাণী ঘোষণা করেছেন *(শিষ্যচরিত ১০:৪০-৪১)*।

যিশুর পুনরুত্থানের অন্য একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ হল শূন্য সমাধি। কিভাবে শূন্য সমাধি আমাদের কাছে যিশু পুনরুত্থানের মহিমা প্রকাশ করেছে। কারণ সমাধিস্থানে গিয়ে মাগ্দালার মারীয়া ও শিষ্যগণ যিশুর দেহ খুঁজে পাননি। যারা পাহাড়ায় ছিল, সেই সময় তারাও সেখানে ছিল না, কারণ পাহাড়ার আর কোন প্রয়োজন ছিল না। তাহলে সেখানে কি ঘটেছে? শাস্ত্রী ফরিসি এবং সমাজনেতাদের ও রোমীয় প্রশাসন সন্দেহ করেছিল যিশুর মৃতদেহ চুরি হতে পারে। তারা ভেবে রেখে ছিল যে যিশুর শিষ্যরা মৃতদেহ সরিয়ে ফেলবে এবং পুনরুত্থান করেছে বলে রব রটাবে। তাই তারা সেই বিষয়ে সতর্ক ছিল এবং কবরের পাশে পাহাড়াদার নিয়োগ করেছিল, অন্তত

তিন দিনের জন্য; কারণ যিশু এ ও বলেছিলেন যে, তিনি তিনদিনের দিন পুনরুত্থান করবেন। মৃত্যুর তৃতীয় দিনের ভোরে সেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সেখানে পাহাড়াদারগণ ছিলেন না। রবিবার ভোর যে সময়টা সমাধি ক্ষেত্রে নজর রাখাটা জরুরী, জেগে থাকাটা প্রহরীদের জন্য অত্যন্ত বেশী গুরুত্বপূর্ণ, সেই সময়ই তারা সেখানে নেই। তাদের সেখানে থাকার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। যিশুর যে মৃতদেহ তারা যত্ন করে পাহাড়া দিবে, তা তো আর সেখানে নেই।

যিশুর মৃতদেহ চুরি হয়নি, চোরে নেয়নি। কেননা যাদের উপর সমাজ নেতারা চুরির সন্দেহ করেছিল সেই শিষ্যরা সেইখানে পৌছবার আগেই পাহাড়াদারাগণ উদাও এবং সমাধি শূন্য। আর তারাই সাক্ষ্য দিয়েছে যে যিশু পুনরুত্থান করেছেন। তাই আর পাহাড়া দেওয়ার কোন প্রয়োজনও নেই। সেক্ষেত্রে বলা যায় যে, যারা সমাধি ক্ষেত্র পাহাড়ায় নিযুক্ত ছিল তারাই যিশুর পুনরুত্থানের প্রথম সাক্ষী এবং ইহুদী ধর্মনেতারাই প্রথম ব্যক্তি যারা যারা অবগত হয় যে, যিশু সত্যিই পুনরুত্থান করেছেন। এই সত্য ধামাচাপা দেবার জন্য তারা পাহাড়ায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের টাকা পয়সা দিয়ে আপাতত মুখবন্ধ করেছিল *(মথি ২৮:১১-১৫)* যে বর্ণনা আমরা পবিত্র মঙ্গলসমাচারে উল্লেখ পাই।

সুতরাং যিশুর পুনরুত্থান নানাভাবে প্রমাণিত। বরং বলা যায় যারা তার পুনরুত্থান ঠেকাতে চেয়েছিল, যারা বেশী বিচলিত ছিল ও অবিশ্বাস করেছে, তারাই পুনরুত্থানের সংবাদ আগে জেনেছে। যিশুর পুনরুত্থান আমাদের সকলের আনন্দের কারণ, কেননা তিনি একাই পুনরুত্থান করেননি বরং আমাদের সকলকে তার পুনরুত্থানের অংশীদার করে মহিমার রাজ্যের ভাগী করেছেন। তাই আমরা আনন্দময় হৃদয়ে প্রভুর পুনরুত্থানের বাণী ঘোষণা করি এবং তাঁর পুনরুত্থানের শরীক হওয়া প্রত্যাশায় জেগে থাকি আর প্রহর গুনি যেন তাঁর সাথে মিলিত হতে পারি৷ ❑

লেখক: *পরিচালক, সাধু জন ভিয়ান্নি সেমিনারী, ঢাকা*

১ম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত টমাস ক্রুজ

জন্ম: ০২ জানুয়ারি, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১০ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
৪৭/৩নং পূর্ব তেজতুরী বাজার
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

একটি বছর হলো আমাদের সংসারের মোহমায়া ত্যাগ করে, তুমি স্বর্গস্থ পিতার কোলে আশ্রয় নিয়েছ। আমাদের বিশ্বাস মা-ও তোমার সঙ্গে আছেন। এ সুন্দরতম পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী আনন্দ-বেদনা থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছো স্বর্গের দিকে, যেখানে প্রতিটি মানুষের চিরস্থায়ী আবাসস্থল, শান্তির প্রার্থনাস্থল। আমরা তোমার স্নেহ ভালবাসা শাসন প্রতিনিয়ত অনুভব করি। জানি সেদিন হয়তো খুব বেশী দূরে নয়, যেদিন এমনি করে তোমার মতো, মায়ের মতো, আমাদের চলে যেতে হবে এই জগৎ সংসারের মায়া-মমতা ত্যাগ করে, কিন্তু তারপরও যতদিন বেঁচে থাকবো এই ধরণীতে তোমরা বেঁচে থাকবে আমাদের ভালোবাসায়। তোমাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা, ভালবাসা, প্রার্থনা সবসময়ই বিরাজমান থাকবে আর আমাদের জন্য স্বর্গ থেকে প্রার্থনা ও আশীর্বাদ করো যেন আমরা সকলে ভাল থাকি। প্রভু তোমাকে অনন্ত জীবন দান করুন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষ থেকে

ছেলে ও ছেলে বউ: সংকর ক্রুজ ও পল্লবী ক্যাথারীনা ক্রুজ।
ছেলে ও ছেলে বউ: সঞ্জু ক্রুজ ও অঞ্জনা ভেরোনিকা ক্রুজ।
মেয়ে ও মেয়ে জামাই: চন্দনা রোজারিও ও মাইকেল রোজারিও।
মেয়ে ও মেয়ে জামাই: লিজা প্যারিস ও ডেজমন্ড প্যারিস।
মেয়ে ও মেয়ে জামাই: সারা ক্রুজ ও মিলন।

বিজ্ঞ/১৬/২২

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে
বসন্তের বাতাসটুকুর মতো
সে যে ছুঁয়ে গেল, নুয়ে গেল রে
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত

"যেখান দিয়ে হেসে গেছে হাসি তার রেখে গেছে রে.....।"

সময় প্রবহমান। প্রকৃতির ঘোরতর বিধান, "জন্মিলে মরিতে হবে।" দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল একটি বছর। তুমি সব ভলবাসার বন্ধন ছিন্ন করে ওপারে চলে গেছ। তোমার শূন্যতা অনুভব করি আমাদের বিশ্বাসে, নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে। তোমার অমায়িক হাসি, সরলতা, সদালাপ, সদাচারণ বন্ধুবাৎসল্য, স্নেহপরায়ণতা, গভীর আন্তরিকতা ও হৃদয়গ্রাহী ভালবাসা আজও আমাদের হৃদয়ে নাড়া দেয় নীরবে-নিস্তব্ধতায়। তুমি ছিলে, আছ, থাকবে আমাদের অন্তরে, অন্ধকারের আলো হয়ে, সুদিন হয়ে প্রতিদিন।

প্রয়াত লতিকা জার্লেট কস্তা

জন্ম: ৪ এপ্রিল, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৮ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: রাঙ্গামাটিয়া, পো:অ: কালীগঞ্জ
জেলা: গাজীপুর

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

ছেলে ও ছেলে বউ: পলাশ ও লিজা কস্তা
মেয়ে: লিপি, নূপুর, ঝুমুর ও ঝুমা
মেয়ে জামাই: প্রদীপ, বিলাশ ও রিচার্ড
নাতি: স্ট্রীগ ও রিদম

নাতনী: স্ক্যাবি, স্ক্যালি, স্ক্যারি, লীথী, লরা, লায়না ও লিরিক।

বিজ্ঞ/১৭/২২

খ্রিস্টের পুনরুত্থান: নবজীবনে অংশগ্রহণ

ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী

প্রভু যিশুখ্রিস্টের মানব বেশে জগতে আগমন ও তাঁর নামেই নতুন যুগের সূচনা। তিনিই সমস্ত সৃষ্টির অগ্রজাতক আবার তিনিই সৃষ্টিকে রক্ষা ও পুনর্মিলনের জন্য নিজেকে যোগ্যরূপে উৎসর্গ করেছেন। তিনি খ্রিস্ট, অভিষিক্তজন; মানবজাতির মুক্তিদাতা। কিন্তু তিনি জগতে থাকা সত্ত্বেও মানুষ তাকে চিনল না। সেই বাক্য জগতে ছিল এবং এই জগত তাঁর দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছিল; কিন্তু জগত তাঁকে চিনতে পারে নি *(যোহন ১:১০)*। তাই তিনি নিজেকে প্রকাশ করে বলেন; "আমি এসেছি যাতে মানুষ জীবন পায়, পুরোপুরি ভাবেই তা পায় *(যোহন ১০:১০)*। খ্রিস্ট, নিজেকে প্রকাশ করেন সকলের কাছে, যাতে সবাই তাঁর পরিচয় পায় ও তাঁরই নামে পরিত্রাণ পায়। যিশুতেই মানবজাতির মুক্তি, নতুন জীবন শুরু অংশগ্রহণ, সহভাগিতা ও প্রচারে।

নামেই পরিত্রাণ ও মণ্ডলীর সূচনা: যিশুর পরিচয়, তিনি ঈশ্বরপুত্র। "ইম্মানুয়েল" অর্থাৎ "আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর"। যিশুর নাম পরিচয়, প্রচারেই মণ্ডলীর পরিচয়ও পাওয়া যায়। যিশু নামের অর্থ: "ঈশ্বর পরিত্রাণ করেন"। খ্রিস্ট নামের অর্থ: "ঈশ্বরের অভিষিক্ত জন"। তিনি নিজেই প্রচার করেন ও জগতে আসার জন্যে তাঁর জন্যে যে প্রাবক্তিক বাণী উচ্চারিত হয়েছে তারও পূর্ণতা পায়। যিশু যে সকল শ্রেণির মানুষের মুক্তিদাতা হয়ে পরিত্রাণ করে অনুগ্রহের বর্ষকাল ঘোষণা করবেন তা যেমন প্রবক্তারা ঘোষণা করেছেন, তেমনি যিশুও তা উচ্চারণ করেন *(ইসাইয়া ৬১:১-২; লুক ৪:১৭-২০)*। প্রবক্তার মুখে উচ্চারিত বাণী সত্য হয় যিশুর জীবনকালে। যিশুর প্রচার কাজে তা-ই হল; "তোমরা যা শুনছ ও দেখছ, যোহনকে গিয়ে তা বল: অন্ধেরা দৃষ্টিশক্তি পাচ্ছে, খোঁড়ারা হাঁটছে, কুষ্ঠরোগীরা আরোগ্য লাভ করছে, কালারা শুনতে পাচ্ছে, মরা মানুষ বেঁচে উঠছে, আর দরিদ্র লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা হচ্ছে *(মথি ১১:৪-৫)*।

যিশু যেমন দলগত আহ্বান করেছেন তেমনি ব্যক্তিগত আহ্বান করেছেন; তা তাঁর প্রথম শিষ্যদের আহ্বানেই প্রকাশ পায় *(মার্ক ১:১৬-২০; মথি ৯:৯)*। আর এখানে লক্ষ্য করি ছেড়ে দেওয়া বা ত্যাগ করে নতুন একটা অবস্থায় বা জীবনে প্রবেশ করা। তাঁর আহ্বান ও নিরাময়তার মধ্যেই প্রকাশ পায় ব্যক্তি যিশু ও তাঁর জীবন। নতুন অবস্থার সৃষ্টিই নতুন জীবন, যা শুরু হয়েছে যিশুতে বিশ্বাস ও নির্ভর করে, পূর্ণতা পায় সহভাগিতায়। আর এতেই মণ্ডলীর স্বরূপ প্রকাশ পায়। মণ্ডলী বিশ্বাসী ভক্তজনগণের সমাবেশ। আরও প্রকাশ পায় মাণ্ডলিক জীবনধারা, যেখানে সকল শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণ। এমনকি শিষ্যদের মধ্যেও বিভিন্ন পেশার ও অবস্থার মানুষ ছিল।

তিনি শিষ্যদের আহ্বান করে একটা দল গঠন করেছেন। তিনি জনতার মাঝে প্রকাশ্যে প্রচার করেছেন আর ব্যক্তিগত প্রার্থনায় পিতার সাথে যুক্ত হয়েছেন। তিনি সবাইকে: গরীব, অসুস্থ, অশুচি পাপী (করগ্রাহক) ও নারীদের গুরুত্ব দিয়েছেন। "সুস্থ সবল যারা, তাদের তো চিকিৎসকের কোনো প্রয়োজন হয় না; প্রয়োজন হয় তাদেরই, ব্যধিগ্রস্ত যারা! আসলে আমি ধার্মিকদের নয়, পাপীদের পরিত্রাণের জন্যে ডাকতে এসেছি" *(মথি ৯:১২-১৩)*। যিশুতে বিশ্বাস, নির্ভরতা ও সহভাগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে চলাই হল খ্রিস্টযিশুর শিষ্যত্ব বরণ করা।

শিষ্যত্ব বরণে দরকার পুনরুত্থানের রহস্যে প্রবেশ করা, যেখানে রয়েছে খ্রিস্টযিশুর যাতনাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থান। এখানে রয়েছে ত্যাগ, আত্মসমর্পণ ও আত্মবলিদান। আর এতে ফিরে যেতে যিশুর আহ্বানে সাড়াদানে। যেখানে থেকে শুরু হবে মুক্তির রহস্যে প্রবেশ করে মুক্তির উৎসবে যোগদান করা। মন পরিবর্তন ও মঙ্গলসমাচার বিশ্বাসের আহ্বানে শুরু হয়েছে আমাদের মুক্তির উৎসব পুনরুত্থানে অংশগ্রহণের যাত্রা। "সময় হয়ে এসেছে: ঐশরাজ্য এখন খুব কাছেই। তোমরা মন ফেরাও; তোমরা মঙ্গলসমাচারে বিশ্বাস কর" *(মার্ক ১:১৫)*। মনের পরিবর্তন, সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন ও আত্মনিবেদন পিতার চরণে। ফিরে আসো মাণ্ডলিক জীবন ধারায়।

যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান: পুরাতন নিয়মে পশুর বলিদান ও রক্তের গুণে ঈশ্বর নিস্তার করেছেন আর ইস্রায়েল জাতি মিশর থেকে মুক্তি পেয়েছে ও বংশ পরম্পরায় এই নিস্তারপর্ব অনুষ্ঠান করত *(যাত্রা. ১২:২-১৫)*। কালের পূর্ণতায় যিশু নিজেকেই নিজে মিলন যোগ্যবলি উৎসর্গ করে নতুন রীতি চালু করলেন। তিনি একবার চিরকালের মত এই যজ্ঞ নিবেদন করলেন সকল মানবজাতির মুক্তির জন্য *(হিব্রু. ১০:১০-১৪)*। খ্রিস্ট যিশু আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলি। পুনরুত্থান মুক্তির স্মরণানুষ্ঠান।

খ্রিস্টযিশুর মৃত্যুতেই সত্য হল যে যিশু ঈশ্বরপুত্র। যিশু যখন প্রচার করছিলেন, তিনি শিষ্যদের জিজ্ঞেস করেছেন; "আমি কে, এ বিষয়ে লোকেরা কি বলে?" বিভিন্ন মতবাদ: দীক্ষাগুরু যোহন, এলীয় বা প্রাচীনকালের কোন প্রবক্তা। যিশু জিজ্ঞেস করেন, আর তোমরা? শিমন পিতর উত্তর দেন, "আপনি সেই খ্রিস্ট" *(মার্ক ৮:২৭-২৯)*। এখানে নানান মতামত থাকলেও যিশুর মৃত্যুতে রোমান সেনাপতি যিশুর দেহ থেকে নিঃশারিত রক্ত ও জলে সিঞ্চিত হয়ে বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন আর বললেন, "উনি সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন" *(মার্ক ১৫:৩৯)*। এখানেই চূড়ান্ত প্রমাণ হল যিশু ঈশ্বরপুত্র। রোমান সেনাপতি (বিজাতীয়, ইহুদি নন) স্বীকার করল যিশু ঈশ্বরপুত্র। এতেই প্রমাণিত হল যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান বিশ্বাসের জন্ম দেয়।

যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান জগতে যুগান্তকারী ঘটনা। ঈশ্বরের চরম ভালোবাসার প্রকাশিত হল ক্রুশে। সৃষ্টি হল নতুন যুগের, যেখানে আছে ক্ষমার আনন্দে *(লুক ২৩:৩৪-৩৫)*, পরমদেশে (স্বর্গরাজ্য) প্রবেশ অধিকার অর্থাৎ

পরিত্রাণ *(লুক ২৩:৩৯-৪৩)*। আর তার জন্য সহ্য করতে হয়েছে নিদারুণ যন্ত্রণা, এমনি প্রত্যাখানের অভিজ্ঞতা *(মথি ২৭:৪৫-৪৬)* ও পিপাসার জ্বালা ও দুঃখভোগ *(যোহন ১৯: ২৮-২৯)*। সমাপ্ত ও সাধিত হল মানব জাতির প্রায়শ্চিত্ত বলি *(যোহন ১৯:৩০)*। আর পূর্ণতা পেল পিতার চরণে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণে *(লুক ২৩:৪৬)*। এইভাবে যিশুর মৃত্যু আমাদের পরিত্রাণ দিয়েছে, পেয়েছি পিতার সাথে মিলিত হওয়ার অধিকার। এভাবেই গড়ে উঠেছে নতুন সমাজ (মণ্ডলী)।

যিশুর মৃত্যু আমাদের পাপের মৃত্যু ও পুনরুত্থান নতুন জীবনের সূচনা। যিশুর ক্রুশ মৃত্যু জগতকে দেখিয়েছে ঈশ্বরের প্রেম ও পরিত্রাণ। তাই ক্রুশের নিচে জড় হয়েছে সকল দেশের ও ভাষার মানুষ। করা হল অপমানের জন্যে কিন্তু পূর্ণতা পেল পরিত্রাণের জয়োল্লাসে। তাই পুনরুত্থানে মহানন্দে বিশ্বাসীভক্ত গেয়ে ওঠে পরমেশ্বরের মৃত্যুঞ্জয় অদ্বিতীয় পুত্র অমরত্বের প্রবেশদ্বার, করেছেন উন্মুক্ত। এসো সবে উল্লাসে ভরি ধরণী, জাগিয়ে তুলি সুপ্ত প্রাণী।

পুনরুত্থানের নবজীবন ও সহভাগিতায় অংশগ্রহণ: যিশুর মৃত্যু যেমন এক মুক্তিকামী ঘটনা তেমনি যিশুর পুনরুত্থান মানব ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই ঘটনায় মানুষ যেমন আনন্দিত হয়েছে তেমনি ভয়ে ম্রিয়মাণও হয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় ঘটনা একটি নতুন সমাজ (মণ্ডলী) গড়ে উঠেছে। বিশ্বাসী সমাজ। আজ গড়ে উঠেছে এক নতুন সমাজ, পুণ্য প্রেমে এ যে মিলনের সাজ । নতুন একটি সমাজ গড়ে উঠেছে, খ্রিস্টীয় সমাজ (খ্রিস্টমণ্ডলী)। বিশ্বাসী ও সহভাগিতার সমাজ। যে খ্রিস্টীয় সমাজ (খ্রিস্টমণ্ডলী) পুনরুত্থিত যিশুর নামে গড়ে উঠেছে।

যিশুই সমাজে নতুন বার্তা বা সুসমাচার ঘোষণা করে শান্তি সম্ভাষণ জানান ও তাদের শান্তির সুসমাচারে প্রচার করতে প্রেরণ করেন *(যোহন ২০: ১৯-২১)*। যিশু এ-ও নির্দেশ দেন, "তোমরা জগতের সর্বত্রই যাও, বিশ্ব সৃষ্টির কাছে ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার" *(মার্ক ১৬:১৫)*। এই নির্দেশ ও আদেশ পুনরুত্থিত খ্রিস্টের। পুনরুত্থানের আহ্বান হল মঙ্গলসমাচার বিশ্বাস ও প্রচার করা। আর নির্ভয়েই তা করতে হয়, কেননা খ্রিস্টযিশুই আমাদের সঙ্গে আছেন। "আর জেনে রাখ, জগতের সেই অন্তিম কাল পর্যন্ত আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে আছি"*(মথি ২৮:২০)*। দায়িত্ব নিতে হয় ভালোবাসায় ও যত্নে। পবিত্র আত্মার দানে প্রাপ্ত মণ্ডলীর দায়িত্ব।

মণ্ডলীতে আমরা মিলন ও সহভাগিতার সমাজ যা ছিল আদি মণ্ডলীতে, তারা প্রায়ই একমন হয়ে প্রেরিত শিষ্যদের শিক্ষা মনোযোগ দিয়ে শুনত। নিজেদের যা কিছু ছিল তা সহভাগিতা করত ও নিয়মিত প্রার্থনা ও রুটিভাঙ্গা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করত *(শিষ্যচরিত ২:৪২)*। সক্রিয়, সহভাগিতার মিলন সমাজ। খ্রিস্টযিশুই জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। "তোমরা সবাই মিলে খ্রিস্টেরই দেহ; তোমরা এক একজন সেই দেহের এক একটি অঙ্গ"*(১ম করিন্থীয় ১২:২৭)*। সবার সক্রিয় অংশগ্রহণে মণ্ডলী হয়ে উঠবে খ্রিস্টের দেহরূপ মিলন-সমাজ।

উপসংহার: খ্রিস্টযিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্যদিয়েই মানবজাতি মুক্তি লাভ করে ও সমস্ত সৃষ্টি ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়েছে। যিশু নিজেই এক হওয়ার প্রার্থনা করেছেন। তিনি সবাইকে তাঁর ভালবাসার আশ্রয়ে রাখার মধ্যদিয়ে পিতা ভালবাসা প্রকাশ ও মহিমান্বিত করার প্রার্থনা নিবেদন করেন *(যোহন ১৭:৩-৫)*। খ্রিস্টের পুনরুত্থান জগতে নতুন জীবনের সূচনা করে যা শুরু হয় শান্তি আনন্দের সম্ভাষণে ও সম্মিলিত অংশগ্রহণে ও সুসমাচার প্রচারে। আর এ জীবন বিশ্বাসের জীবন। "আমাদের মহাযাজক খ্রিস্টযিশু যিনি স্বর্গে বাস করেন, তিনি ঈশ্বর পুত্র। তাই এসো আমরা বিশ্বাসে অবিচল থাকি" *(হিব্রু. ৪:১৪)*। এসো সবার সক্রিয় অংশগ্রহণে গড়ে তুলি বিশ্বাসের নতুন সমাজ (মণ্ডলী)॥ ❑

লেখক: ফিলিপাইন

যিশুখ্রিস্ট উঠেছেন!

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

চারদিকেই রাতের গহীন আঁধার
কবরের ভয়াল নিস্তব্ধতা
অনিবার্য যত দুঃস্বপ্নের কালো মেঘ
জগতকে করেছে গ্রাস।
একজন নিরপরাধ যুবককে
টেনে হিঁচড়ে রাজদরবারে দাঁড় করানো হলো
তিনি নাকি তাঁর কর্মকাণ্ডে, কথায়, কাজে
ঈশ্বরনিন্দা ক'রেই এসেছেন
তাঁর একমাত্র প্রাপ্য ক্রুশীয় মৃত্যু।
এ যুবকের কণ্ঠে সমুচ্চারিত বাক্য
'স্বর্গরাজ্য সমাসন্ন! তোমরা সকলে
স্বর্গস্থ পিতার কাছে ফিরে এসো!
এসো তোমরা অন্ধ, খঞ্জ, রোগাক্রান্ত,
মৃত্যুপথগামী! আমার কাছে এসো
আমাতে পাবে স্বর্গের সন্ধান
আমি সত্য, পথ ও জীবন
জীবনময় জল আমার কাছেই পাবে তোমরা।

তথাকথিত ধর্মীয় নেতাদের অভিযোগ
যিশুখ্রিস্টের দাবী, তিনি নাকি ঈশ্বরপুত্র
শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা, পাপ ক্ষমাকারী
তিনি নাকি মন্দির গুড়িয়ে মাত্র তিন দিনেই
আবার পুনঃনির্মাণ করবেন
কী আস্পর্ধা তার?
তাঁর মাথায় পরানো হল কাঁটার মুকুট!
গায়ে রাজকীয় পোশাক, হাতে রাজদণ্ড
চরম তামাশা ও ঠাট্টায় অভিবাদন
'প্রণাম ইহুদীরাজ'
বিচারের নামে, সাজানো নাটক মঞ্চস্থ
হয় ইতিহাসের নাট্যমঞ্চে।

গা থেকে খুলে নেয়া হল রক্তসিক্ত রাজবস্ত্র
নির্মম ভাবে টেনে হিঁচড়ে
শোয়ানো হল ক্রুশের উপর
দু'হাত, দু'পা টেনে বিদ্ধ করা হলো
মাথায় পড়ানো হলো কাঁটার মুকুট
হায়! পুরো জগতটাই দাঁতাল শয়তানের
নারকীয় হোলিখেলায় মত্ত।
ক্রুশের নিচে খুনিদের কণ্ঠে ঝলসে ওঠে বিদ্রুপ

আর যিশুর কণ্ঠে ধ্বনিত হলো,
'পিতা! এরা কী করছে, তা তারা জানে না
তুমি তাদের ক্ষমা কর।
যন্ত্রণা সমস্তই সাঙ্গ হল!
তাঁর মাথা নুয়ে পড়লো নীচের দিকে!
ইতিহাসের জঘন্যতম বিচারের প্রহসনচিত্র
ধর্মের নামে অবিচার, বিচারের নামে
প্রাণ কেড়ে রক্তের হোলি খেলার
ঐতিহাসিক নাটক মঞ্চায়িত হল কালভেরী
বধ্যভূমিতে।
মৃত্যুর তৃতীয় দিবস প্রারম্ভে
যেরুশালেমে নব সূর্যের উদয়
সরকারি সৈনিকেরা সাক্ষী হল
এ অভাবনীয় অভূতপূর্ব ঘটনার।
আদম-হবার পাপে
রুদ্ধ স্বর্গের দ্বার খুলে দিতে
নিজ পরাক্রমে কবর ছেড়ে উঠেছেন!
তিনিই একমাত্র ঈশ্বরপুত্র
তিনি বিশ্বমানবের পরিত্রাতা,
স্বর্গাধিরাজ তিনি, যিশুখ্রিস্ট॥

মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে খ্রিস্টানদের সাক্ষ্যদান

তেরেজা তপতী রোজারিও

বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রামে জনগণের ত্যাগ তিতিক্ষা আজ শুধু দেশীয় নয় আন্তর্জাতিক পরিসরেও স্বীকৃত। কিন্তু যে প্রশ্নটি আজও অনুত্থাপিত রয়ে গেছে, তা হলো বাঙালির মুক্তি সংগ্রাম চলাকালে অর্থাৎ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অভ্যন্তরে অবস্থান করে এ অঞ্চলের দেশীয় ও বিদেশি খ্রিস্টান মিশনারিদের ভূমিকা কেমন ছিল? ইতিহাসের এই অধ্যায়টি আজও বলা চলে অনিরীক্ষিত থেকে গেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল স্রোতধারার সঙ্গে স্বতস্ফূর্তভাবে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রতিটি পরিবার ও সদস্য এমনকি দেশী-বিদেশী মিশনারীরাও তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং প্রথম সারিতে থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। বাংলাদেশের প্রতিটি খ্রিস্টান মিশনই পাকবাহিনী দ্বারা নির্যাতিত নিরন্ন মানুষদেরকে যারা ভয়ে বাড়ি-ঘর ছেড়ে অজানার উদ্দেশে চলে আসতো, তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। তাদেরকে নির্ভয়ে নির্দ্বিধায় অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান এবং চিকিৎসা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ ও খ্রিস্টান মিশনারিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী খ্রিস্টান সশস্ত্র বীর মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তে রঞ্জিত আত্মত্যাগের সঠিক ইতিহাস ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের জানাতে হবে।

বাংলাদেশের এক অনন্য ঐতিহাসিক ঘটনার বিরল অংশীদার ভবরপাড়া কাথলিক মিশন, সেখানকার দায়িত্বে থাকা দু'জন বাঙালি যাজক, কয়েকজন কনভেন্ট সিস্টার, কাটেখিস্ট-মাষ্টার, হোস্টেল ছাত্রীবৃন্দ এবং গোপনীয়ভাবে বেছে নেয়া বিশেষ কয়েকজন ভক্ত জনসাধারণ। ভবরপাড়ায় সংরক্ষিত ঐতিহাসিক কিছু স্মারক মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরে ঠাঁই পেয়েছে ৩০ এপ্রিল, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে। ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখে মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে খ্রিস্টান মিশনারীদের অবদান অনেক গুরুত্বপূর্ণ। প্রাপ্ত তথ্যের উৎস ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ (সেমিনারীর রেক্টর, পরে ময়মনসিংহের বিশপ) মুক্তিযুদ্ধের সময় গোপনে বাঙালিদের সহায়তার জন্য ও বাঙালি বুদ্ধিজীবী হিসেবে তার নাম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী লিপিবদ্ধ করেছিল। আরও আছেন ফাদার সুজিত সরকার, ফাদার রানা মন্ডল, ফাদার বাবুল বৈরাগী, ফাদার মার্টিন বিশ্বাস, সিস্টার ক্যাথরিন গনসালভেস, সিস্টার তেরেজিনা গমেজ, সিস্টার আন্তনিয়েত্তা, সিস্টার পাওলা, সিস্টার জাসিন্তা ক্রুশ, কাটেখিস্ট স্টিফেন বিশ্বাসসহ আরও অনেক ফাদার, সিস্টার ও ভক্তজনগণ।

বৈদ্যনাথতলা থেকে মুজিবনগর : বর্তমান মুজিবনগরের আগের নাম ছিল ভবরপাড়া বৈদ্যনাথ তলা। তার নামেই পরিচিতি পেয়েছিল বৈদ্যনাথতলা। এখানে আছে বড় একটি আম বাগান সবাই বলতো ঘের বাগান। ভবরপাড়া গ্রামে আছে একটা কাথলিক মিশন। মুক্তিযুদ্ধকালে সীমান্ত এলাকা থেকে বিদেশী মিশনারীদের সরিয়ে নিলে পর ঢাকা থেকে দেশীয় যাজকগণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাই ঐ মিশনের পালক পুরোহিত ছিলেন ঢাকা ধর্মপ্রদেশের ফাদার ফ্রান্সিস এ গমেজ, সহকারী পুরোহিত ছিলেন ফাদার পিটার সাহা। ভবরপাড়া বৈদ্যনাথতলা থেকে উত্তর দিকে মেহেরপুর শহর ছিল ১০ মাইল দূর, জেলা কুষ্টিয়া। রাস্তা ছিল কাঁচা।

মুজিবনগরে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার: ১০ এপ্রিল মুজিবনগর অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়। সদ্য গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর রাষ্ট্রপতি ঘোষিত হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু তখন তিনি ছিলেন হানাদার বাহিনীর হাতে বন্দী। কাজেই তার অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম হলেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন পেলেন তাজউদ্দিন আহমদ। পররাষ্ট্রমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব অর্পিত হল যথাক্রমে খোন্দকার মোস্তাক আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং জনাব কামরুজ্জামানের উপর। কর্ণেল (অব) আতাউল গণি ওসমানীর উপর অর্পিত হল প্রধান সেনাপতির দায়িত্বভার। ১৭ এপ্রিল '৭১ সদ্য গঠিত বিপ্লবী সরকার দেশী বিদেশী সাংবাদিকের উপস্থিতিতে আত্মপ্রকাশ করল কুষ্টিয়া জেলাধীন মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথ তলার আমবাগানে। মুজিবনগরই ঘোষিত হল বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী হিসেবে। অস্থায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাজধানী হিসেবে এই মুজিবনগর নামই সাড়ে সাত কোটি বাঙালি এবং বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত ছিল '৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত।

মুজিবনগর সরকারের নির্দেশে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য। সৈয়দ নজরুলের ভাষণের মূল কথা ছিল-দু'শ বছর আগে পলাশীর আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতা অস্তমিত হয়েছিল এবার মুজিবনগর আম্রকাননে সেই সূর্যকে প্রজ্বলিত করা হল। আজ থেকে এ জায়গার নাম হবে মুজিবগনগর। প্রতিষ্ঠিত হল মুজিবনগর

সরকার। স্বল্প সময়ে সভা শেষ করে সবাই ভারতে বর্তমান স্বাধীনতা সড়ক দিয়ে চলে যায়। ভারত থেকে আনা চার পয়সা দামের কিছু মিষ্টিও বিতরণ করা হয়।

১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে খ্রিস্টান মিশনারীদের সহযোগিতা : ১৫ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে সন্ধ্যার সময় ২ জন ব্যক্তি গাড়ি নিয়ে মিশনে প্রবেশ করেন। সাথে কয়েকজন স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা। তারা ভারত থেকে আসেন এবং ফাদার ফ্রান্সিসের সাথে তার অফিসে বসে কিছু সময় আলোচনা করেন। পরে ওনারা ফাদারকে সাথে নিয়ে কোথায় মিটিং হতে পারে সে স্থান দেখতে যান। স্থান ঠিক করেন। ফাদার ফ্রান্সিস টেলিফোনে খুলনার বিশপ মাইকেল ডি'রোজারিও সিএসসি এবং ঢাকার আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীকে জানান এবং তাদের পরামর্শ চাইলেন। পরদিন ১৬ এপ্রিল সকাল ৭টার সময় ফাদার ফ্রান্সিস গ্রাম্য কমিটিকে ডাকেন এবং বিষয়টি প্রকাশ করেন। তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন ফাদার পিটার সাহা, সিস্টার ক্যাথরিন, সুশিল মল্লিক, লুইস মল্লিক, লুইস নওদা, ভুপতি মন্ডল, সন্তোষ খাঁ, নিকু মন্ডল, যোহন সরকার (ভট্টাচার্জী) কালো মল্লিক, শিমন মল্লিক, খোকন মল্লিক, সন্তোষ দফাদার, পিন্টু বিশ্বাস, বেঞ্জামিন মল্লিক আরও অনেকে। ভবরপাড়ার লোকজন বেশি কিছু জানতে বা বুঝতে পারেনি। ১৭ এপ্রিলের দিন যা কিছু প্রয়োজন হয়েছে, তা মিশন থেকেই নেওয়া হয়েছে, যেমন- চৌকি, চেয়ার, টেবিল, টেবিল ক্লথ, বেঞ্চ, কারপেট, ফুল, ফুলদানি, ফুলের টব, পতাকা টাঙ্গানোর পাইপ ইত্যাদি। স্টেজ করা হয়েছিল ৬টা খাট বা চৌকি দিয়ে। স্টেজটি উপরে এবং পিছনে পলিথিন দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল। গেইট করা হয়েছিল দেবদারু গাছের পাতা দিয়ে। সিস্টার ক্যাথরিন গণসালভেস নিজ হাতে ২টা ব্যানার তৈরী করেন ১টি "স্বাগতম বাংলাদেশ" আর ১টি "ওয়েলকাম" ব্যানার। ২টি গেইটে লাগানো হয়। পতাকা উত্তোলনের জন্য সাধারণ একটি পাইপ বসানো হয়। তার আগের কয়েকদিন মিশনে সেই পতাকা উত্তোলন করে "আমার সোনার বাংলা" গানটি হোস্টেলের মেয়েদের নিয়ে প্র্যাকটিস করানো হয়। ভারত থেকে আগত দুজন শিল্পী গানটি তুলে দিয়েছিলেন। ১৭ এপ্রিল সকালে ভবরপাড়া গ্রামটি আর্মি দিয়ে ভরে যায়। গাড়ীতে করে আনা হয়েছিল ফোল্ডিং চেয়ার, ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম। সকালে সিস্টার ক্যাথরিনসহ স্কুলের ছেলেমেয়ে শিক্ষক শিক্ষিকাসহ ডুগি, তবলা হারমোনিয়াম নিয়ে উপস্থিত হন। ইতোমধ্যে গাড়িতে করে প্রচুর শিখ আর্মি, বিভিন্ন দেশের সাংবাদিক এসে হাজির হন। আসে মন্ত্রীদের বহনকারী গাড়ী। সৈয়দ নজরুল ইসলাম পতাকা উত্তোলন করেন। অনেকের সঙ্গে পরিবেশনা করেন জাতীয় সঙ্গীত সিস্টার ক্যাথরিন ও পিন্টু বিশ্বাস হারমোনিয়াম বাজান। রাষ্ট্রপতিকে কয়েকজন যুবক ছেলে গার্ড অব অনার দেন (লহর, সিরাজ, কেছমত, মফে, অস্থির, মহিম, লিয়াকতসহ মোট ১২জন)। ওদের সম্মানে এখন একটি ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে। সভার শুরুতে পবিত্র কোরান শরীফ থেকে পাঠ করেন মেহেরপুর হতে আগত একজন মাষ্টার। পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ করেন স্টিফেন বিশ্বাস। ফাদার ফ্রান্সিস সেদিন অনেক মূলবান ঐতিহাসিক ছবি তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন।

ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরে দানকৃত জিনিসপত্র : নিজের তোলা ঐতিহাসিক প্রথম মন্ত্রীপরিষদের শপথ গ্রহণ ও বিদেশী সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভার চল্লিশটি ছবি, সিস্টার ক্যাথরিনের তৈরি করা ঐ সময়ের ব্যবহৃত বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত ১টি পতাকা, শপথ গ্রহণের পর প্রথম অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ এর স্বাক্ষরিত ছোট ডায়েরী, আম্রকাননে সভায় ব্যবহৃত ভবরপাড়া মিশনের ৮টি চেয়ার, ১টি টেবিল (স্বাধীন বাংলা দেশের যে দলিল সেদিন স্বাক্ষরিত হয়েছিল তা ছিল রেভারেন্ড ফাদার ফ্রান্সিস গমেজের ডাইনিং টেবিলের উপরে), বাকী দুটি চেয়ারের মধ্যে একটি ভবরপাড়ায় আর অন্যটি ঢাকাস্থ সিবিসিবি সেন্টারে রক্ষিত আছে। মহান স্বাধীনতার ৩৪ বছর পর সযতনে আগলে রাখা ঐতিহাসিক স্মারক হস্তান্তরকালে আবেগতাড়িত হয়ে স্মৃতি রোমন্থন করে বলেছিলেন: "মুক্তিযুদ্ধের সময় নানা ঝুঁকি নিয়েও এপাড় ওপাড়ের মুক্তিযোদ্ধা আর শরণার্থী মানুষের সেবা করতে পেরে আজ নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে। আসলে ঐ সময় কোন আলাদা জাতি বা ধর্মের ভেদাভেদ ভুলে আমরা সবাই এক, আমরা সবাই মানুষ এই ভাবনাতেই বিভোর ছিলাম। আমার সাথে সিস্টারগণও অসুস্থ, বিপন্ন মানুষ আর মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাধিক যত্ন নিয়েছেন। ভবরপাড়া মিশনে পালিয়ে আসা ও স্কুল ঘরে আশ্রয় নেয়া চল্লিশজন ইপিআর সদস্যের প্রয়োজন সিস্টার আর আমাকেই মিটাতে হতো। সিস্টার ক্যাথরিন বলেছিলেন "আমি জানতাম না সেদিন এত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছি। এখনও আমার চোখে ভাসে সেলাই মেয়েদের লাল কাপড়ে ডিসপেনসারীর সাদা তুলা দিয়ে আমি যেন ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে লিখেছি "স্বাগতম বাংলাদেশ" আর 'ওয়েলকাম'।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস কাথলিক চার্চ ও প্রতিষ্ঠানগুলো হয়ে উঠেছিল শরণার্থীদের নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে। হাজার হাজার শরণার্থীর জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল লঙ্গরখানা। ফাদার, সিস্টাররা শরণার্থীদের নগদ অর্থ, বস্ত্র ও খাদ্য সরবরাহ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করার অপরাধে শহীদ হয়েছেন ফাদার উইলিয়াম পি ইভান্স, ফাদার লুকাশ মারান্ডী, ফাদার মারিও ভেরোনেসি ও সিস্টার ইম্মানুয়েল। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নেওয়ার জন্য অনেক খ্রিস্টান পরিবারের সদস্য গণহত্যায় শহীদ হয়েছেন এবং খ্রিস্টান গ্রামগুলো অগ্নিসংযোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আমরা খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীগণ প্রভু যিশুখ্রিস্টকে হৃদয়ে ধারণ করে তাঁর দেখানো পথে ত্যাগ, দয়া, সেবা ও ভালবাসায় উদ্দীপ্ত হয়ে অসহায় মানুষের পাশে এবং দেশ রক্ষার কাজে সর্বদা সহযোগিতা করেছি এবং ভবিষ্যতেও করব। প্রভুযিশু যে সত্যই পুনরুত্থান করেছেন, তারই সাক্ষ্য আমরা দিব। সকলকে পাস্কা পর্বের শুভেচ্ছা রইল।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

ড. ফাদার তপন ডি'রোজারিও, বিজয় ম্যানুয়েল ডি'প্যারেস, নির্মল রোজারিও, রঞ্জনা বিশ্বাস: **স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির জনকের জন্মশত বার্ষিকী স্মরণিকা**-অর্জন, জেরী প্রিন্টিং, লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০।

শামসুল হুদা চৌধুরী: **"মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর"** প্রকাশক-বিজয় প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫, মীরপুর, ঢাকা-১৬।

এসএম তানভীর আহমদ, **"বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে খ্রিস্টান মিশন ও মিশনারিদের ভূমিকা"**, বাংলা একাডেমি পত্রিকা, ৬৪ বর্ষ: ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ২০২০। ❑

লেখক: সিনিয়র প্রভাষক, নটরডেম কলেজ, ঢাকা

তোমার আলোয় আলোকিত আমাদের পথ

রোজ পুতুল রোজারিও
জন্ম: ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ
বিবাহ: ১০ জুলাই ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১০ মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: ফরমা বাড়ী, ছোট গোল্লা,
গোল্লা ধর্মপল্লী, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।
শহর: ৩০/এ, তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা -১২১৫

মা!

মাগো! তুমি আর আমাদের মাঝে নেই, আমরা তা মানতে পারছি না। তোমার হাসি মাখা মুখ, তোমার মধুর কণ্ঠস্বর, তোমার হাতের ছোঁয়া, ঘরময় তোমার হাঁটা ও মালা প্রার্থনা করা এখনও পাপা ও আমরা তা অনুভব করি। তুমি তোমার প্রিয় চার সন্তানকে এক ছাদের নীচে রেখে ছিলে, যেন তোমার মায়া-মমতা ও বিপদে-আপদের সময় এক সাথে আমরা থাকতে পারি। তোমার নামের পাঁচ তলা বাড়িতে আমরা সবাই আছি, শুধু তুমি নেই। সকালে যখন আমরা অফিসে যাই, নাতি-নাতনীরা যখন স্কুল কলেজে যায়, তখন তুমি রোজারী মালা হাতে নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে, তেমনি ভাবে আমাদের বাড়ী ফেরার সময়ও তুমি বারান্দায় অপেক্ষা করতে। রোদ, বৃষ্টি, ঝড় হলে তুমি অস্থির হয়ে ফোন করতে, আমরা অসুস্থ হলে তুমি চিন্তায় পাগল হয়ে যেতে, বড়দিন ও ইস্টারের সময় নানা ধরনের পিঠা ও মজার মজার খাবার রান্না করে নাতি-নাতনীদের দিতে। ডিউক, দীপা, প্রমা, কাব্য, দিব্য ও কেসিয়া তোমার কাছে কত আবদার করেছে। কেসিয়াকে কোলে বসিয়ে কত প্রার্থনা, ধর্মীয় গান, নানা ধরণের কবিতা শিখাতে। করোনার সময় আমরা সবাই ছাদে বসে কত গল্প, গান, নাচ ও খাবার খেয়েছি। পল্লব, বাপ্পি, কাব্য ও প্রমা তোমার সাথে ফোনে কতো দুষ্টুমি করেছে। এখন এসব কার সাথে করবো মা? আমরা দু'বোন তোমার কাছে কত সুখ-দুঃখের কথা বলেছি, এখন কার কাছে বলবো? কে আমাদের সান্ত্বনা দিবে, অভয় দিবে? তুমি আমাদের ছেড়ে এতো তাড়াতাড়ি স্বর্গরাজ্যে চলে যাবে তা আমরা ভাবতেই পারি নাই।

আমাদের মা (রোজ পুতুল) ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ ময়মনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা স্বর্গীয় জর্জ কেরাপিট, মাতা স্বর্গীয় মেরী রাণী কেরাপিট। তিন বোন ও এক ভাই এর মধ্যে মা (রোজ পুতুল) তৃতীয় সন্তান। লেখাপড়ার ময়মনসিংহ জেলার মিশনারী স্কুলে। লেখাপড়ার পাশাপাশি ভাল গানও করতেন। মা দেখতে খুব সুন্দরী ও চুল অনেক বড় ছিল। তাই দশম শ্রেণীতে পড়া-লেখা চলাকালীন আমাদের পাপা (রেমন্ড রোজারিও) চাকুরী সূত্রে ময়মনসিংহে গেলে, এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মাধ্যমে মাকে প্রথম দেখায় পছন্দ করেন। আঠারো গ্রামের ছেলে হয়েও ভিন্ন শহরের মেয়ে আমার মাকে তার জীবন সঙ্গী করেন। ১০ জুলাই ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ লক্ষীবাজার পবিত্র ক্রুশ গীর্জায় স্বর্গীয় ফাদার উইলিয়াম পি. ইভান্স সিএসসি তাদের বিবাহ সাক্রামেন্ট দেন। তাদের ঘরে ঈশ্বর চার সন্তান দেন। মা সন্তানদের লেখাপড়ার পাশাপাশি গান, নাচ, তবলা, গিটার শেখান যেন সন্তানেরা সমাজে প্রতিটি কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করতে পারে। সন্তানদের স্কুল কলেজে নিজে নিয়ে যেতেন, নিয়ে আসতেন এবং পড়াশুনার খোঁজ খবর রাখতেন। আজ তার চার সন্তানই নিজ নিজ কর্ম ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মা হাস্যউজ্জ্বল, স্পষ্টভাষী এবং খুব মিশুক ছিলেন। নীজের বাড়ীর পাশে বাগান করা, নানা ধরণের ফলের, ফুলের গাছ লাগাতেন। হাঁস, মুরগি, কবুতর, কুকুর, বিড়াল পুষতেন।

আমাদের মা (রোজ পুতুল) তেজগাঁও প্যারিসের উপাসনালয়ের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। নিয়মিত বাইবেল পাঠ ও রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগে ও পর্বীয় খ্রিস্টযাগে গানের দলের সদস্য ও ওস্তাদ পি. সি. গমেজের গানের ক্লাশের সদস্য ছিলেন।

হলিক্রশ সম্প্রদায়ের মিস্টার মার্গারেট শীল্ড ও এসএমআরএ সিস্টার মেরী রাণীর সাহায্যে (বি. সি. সি) খ্রিস্টীয় সমাজ গঠন সংগঠনে কাজ করেছেন এবং বাইবেল পাঠের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

তেজগাঁও মহিলা সমিতির সদস্য হয়ে অনেক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেছেন।

এস. এস. সি ও এইচ. এস. সি. শিক্ষার্থীদের যুব প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতে গিয়েছেন।

শ্রদ্ধেয় ফাদার আবেল বি. রোজারিওর অনুরোধে তেজগাঁও প্যারিসে যুবক যুবতিদের ১৪ বছর যাবৎ বিবাহের ক্লাস নিয়েছেন। এতে হাজার হাজার যুবক-যুবতি বিবাহের ক্লাস শুনে উপকৃত হয়েছেন।

বনানীর পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ বর্ষের সেমিনারীয়ান ও ডিকনদের ক্লাশ নিয়েছেন ২৫ বছর যাবৎ। বর্তমানে অনেক ফাদার এসব ক্লাশ পেয়ে অনেক উপকৃত হয়েছেন। এসব কিছু মা ও পাপা দু'জনে মিলে একসাথে করেছেন।

১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ সিস্টার পলিন নাভুর অনুপ্রেরণায় পাপা, মা ও সাত জোড়া দম্পতি এবং দুইজন ফাদার বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মেরেজ এনকাউন্টার প্রশিক্ষণ নেবার জন্য বোম্বে এবং পরে কোলকাতায় যান। বাংলাদেশের মেরেজ এনকাউন্টার প্রতিনিধি হিসাবে জাপান, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, মালোয়েশিয়া, ব্রাজিল ও আরো অনেক দেশে মেরেজ এনকাউন্টার কনফারেন্সে যোগদান করেন। পাপা ও মা, শ্রদ্ধেয় বিশপ জের্ভাস রোজারিওর সাথে তিন বছর একলেশিয়ার টিমভুক্ত ছিলেন। এ সময় বাংলাদেশের অনেক দম্পতিদের মেরেজ এনকাউন্টার প্রশিক্ষণ দান করেছেন। এ ছাড়া দম্পতিদের নানা ধরণের সমস্যা সমাধানের জন্য দু'জন অনেক বছর কাজ করেছেন। এতে অনেক দম্পতি বর্তমানে সুখে-শান্তিতে দাম্পত্য জীবন যাপন করছেন। এসব কাজের অবদানের জন্য মেরেজ এনকাউন্টার তোমাকে চিরদিন স্মরণ করবে।

২০০৮ খ্রিস্টাব্দ নভেম্বর মৃত লোকের মাসে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে মৃত্যু বিষয়ক "তোমার আমার মৃত্যু" নামক একটি আর্টিকেল প্রকাশ করা হয়। মৃত্যু বিষয় কিছু কথা ও মার লেখা একটি পত্র পাপার উদ্দেশ্য লেখা-তা নিম্নে সহভাগিতা করা হলো :-

"আমরা ভালবাসার জন্য বিয়ে করি। বিবাহ সাক্রামেন্ট অর্থাৎ সন্ধির মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী এক দেহে পরিণত হয়। আমরা হয়ে উঠি জীবন্ত সাক্রামেন্ট। আমরা একে অন্যকে ছাড়া থাকতে পারি না। শুধু মৃত্যু আমাদের দু'জনকে পৃথক করতে পারে। দাম্পত্য জীবনে মৃত্যু একে অপরকে পৃথক করে দেয়। মৃত্যুর দয়া মায়া নেই। মৃত্যু হলো নির্দয় ও কঠিন। তাই কারও মৃত্যু আমাদের কাম্য নয়। মা পাপাকে উদ্দেশ্য করে "মৃত্যু" বিষয়ক একটি চিঠি লেখেন:-

"প্রিয় রেমন্ড,

আমার ভালবাসা নিও। মৃত্যু শব্দটি ভয়াবহ। মৃত্যু মানুষকে হতাশায় নিরাশায় একাকীত্বে নিয়ে যায়। মৃত্যু আমাকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি না থাকলে তুমি একা হয়ে যাবে। তোমার আপনজন বলতে আর কেউ থাকবে না। নিজেকে অসহায় মনে করবে। সুখ দুঃখের কথা কার কাছে বলবে? রাতে যখন ঘুমাতে যাবে আমার কথা মনে হবে। একা তোমার বিছানায় ঘুম আসবে না। কে তোমাকে সুন্দর সুন্দর রান্না করে খাওয়াবে। আমাদের মেরীজ ডের বদলে তোমাকে করতে হবে মৃত্যু দিবস। এ সবই তোমাকে মনে কষ্ট দিবে। ছেলে-মেয়ের অনেক জ্বালা যন্ত্রণা তোমাকে সইতে হবে। ওরা মা ছাড়া হয়ে কাঁদবে। তুমি ওদের মায়ের স্নেহ দিয়ে দেখ, ওরা মা বলে আর কাউকে ডাকবে না। এক সাথে তোমাকে নিয়ে কত জায়গায় গিয়েছি। গীর্জায় যাবে, দেখবে আমার কবর; আমি ঘুমিয়ে আছি তোমার প্রতিক্ষায়। আমার কবরের পাশে গিয়ে বলবে, পুতুল; তুমি কেমন আছ ? আমি শুধু দেখব তোমার চোখের জল। আমি তোমাকে বলব, রেমন্ড তোমাকে কত ভাবে কত কষ্ট দিয়েছি। ৪০ টি বৎসর তোমার সাথে কাটিয়েছি। অনেক ভাবে তোমাকে কষ্ট দিয়েছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও। আবার যদি ফিরে আসতে পারতাম তোমাকে আরও ভাল ভাবে সেবা যত্ন দিয়ে তোমায় সুখে ভরিয়ে তুলতাম। দুঃখ কর না লক্ষীটি এই খানেই শেষ নয়, তোমার সাথে আবার আমার দেখা হবে। সেখানে পাবে অনন্ত সুখ ও শান্তি, দেখতে পাবে পরমেশ্বরকে।

- ইতি তোমারই পুতুল

চিঠির এই কথা গুলো এখন বাস্তব হলো। মা তুমি কি করে জানতে আমাদের ছেড়ে তুমি চলে যাবে? আমরা তোমার কবরের পাশে বসে এখন শুধু প্রার্থনা করি। মা পাপার মেরীজ ডে প্রত্যেক বছর পালন করা হতো। এ ভাবেই ২৫ বছর, ৫০ বছরের জুবিলী পালন করেছি। গত বছর ৫৪তম মেরীজ ডে পালন করেছি। মনে করেছি ৬০ তম মেরীজ ডে খুব আনন্দ করে পালন করবো। এখন আর তোমাকে নিয়ে মেরীজ ডে পালন করতে পারব না।

মা, তুমি তো ছিলে ঈশ্বরের সেবিকা। প্রতিদিন পরিবারের সবাইকে নিয়ে মালা প্রার্থনা করতে। অসুস্থ থাকাকালীন অবস্থায় প্রায়শ্চিত্তের প্রথম রবিবার ও প্রথম ক্রুশের পথ শুনেছ। মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসির কাছে আশীর্বাদ নিয়েছ। ফাদার এসে তোমাকে পাপস্বীকার ও রোগীলেপন দিয়ে গেছেন। তোমার হাতে সব সময় রোজারী মালা থাকতো, তাই তো ঈশ্বর তোমাকে তেমন কষ্ট না দিয়ে তাঁর কোলে তুলে নিয়ে গেছেন।

মৃত্যুর আগের দিন অর্থাৎ বুধবার সকালে চার সন্তানকে ডেকে তার চলে যাওয়ার অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। নাতি-নাতনীদের আশীর্বাদ করেছেন। বড় সন্তান রেক্সোনাকে ডেকে পরিবারের সবাইকে দেখে রাখতে বলেছেন। তাকে নিয়ে আর কোন চিকিৎসা খরচ ও হয়রানি না করতে বলেছেন।

মাকে বুধবার সকালে ক্ষয়ার হাসপাতালের ইমারজেন্সীতে নিয়ে যাওয়া হয়। ইমারজেন্সী থেকে আরম্ভ করে কেবিনে থাকাকালীন ও রাতে আইসিইউতে নিয়ে যাওয়ার সময় পর্যন্ত সকল কর্তব্যরত ডাক্তার, নার্স ও অফিসের স্টাফগণ অনেক পরিশ্রম করেছেন। রাত ১২টার সময় আইসিইউতে যাওয়ার সময় নিজ হাতে ক্রুশের চিহ্ন করেছেন এবং বড় ছেলেকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছেন। ডাক্তারগণের আপ্রাণ চেষ্টা সব বৃথা করে বৃহস্পতিবার ভোর ০৪:৪৫ মিনিটে আমার (পাপিয়া) ও বড় ভাইয়ের চোখের সামনে থেকে তুমি ঈশ্বরের কাছে চলে গেলে। মা তোমার মত এত পবিত্র মৃত্যু আমরা আর কখনও দেখিনি।

পরিবারের পক্ষ থেকে তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত শ্রদ্ধেয় ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজকে বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই তার সার্বিক সহযোগিতার জন্য। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গকারী শ্রদ্ধেয় বিশপ জের্ভাস রোজারিও এসটিডি ডিডি, শ্রদ্ধেয় বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি, শ্রদ্ধেয় ফাদার যাকব গমেজ ও পাল-পুরোহিত ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজকে।

ধন্যবাদ জানাই বিপুল সংখ্যক খ্রিস্টভক্তগণ যারা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অংশগ্রহণ করেছেন। ধন্যবাদ জানাই তেজগাঁও সম্মিলিত গানের দলকে, আরো ধন্যবাদ জানাই পাড়া-প্রতিবেশি, আত্মীয়-স্বজন যারা খবর পেয়ে দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে এসেছিলেন এবং আমাদের সান্ত্বনা দিয়েছেন। মুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই-তারা আমাদের বাসায় এসে পরিবারের সদস্যদের সান্ত্বনা দিয়েছেন ও মসজিদে দোয়া পড়েছেন।

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই ক্ষয়ার হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, পি. সি. এ. সকল কাস্টমার সার্ভিস এর কর্মীগণ ও ক্ষয়ার হাসপাতালের ড্রাইভারদের তাদের সহযোগিতার জন্য।

মানবীয় দুর্বলতা বশতঃ মা যদি সচেতন বা অবচেতন ভাবে কারো মনে আঘাত দিয়ে থাকে পরিবারের পক্ষ থেকে আমরা আপনাদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি।

মা, তুমি আমাদের প্রত্যেককে আর্শীবাদ করো যেন তোমার আদর্শে এবং শেখানো পথে আমরা সবাই সুন্দর জীবন যাপন করতে পারি। সকলকে আবারো কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই ।

পরম করুণাময় ঈশ্বর মাকে অনন্ত সুখ দান করুন। তার আশা পূর্ণ করুন। - আমেন ।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

সন্তানগণ: মেরিয়ার রেক্সোনা মন্ডল, জন বাপ্পী রোজারিও, বৃজেট পাপিয়া রোজারিও এবং ইভান্স পল্লব রোজারিও

নাতী-নাতনীগণ: ডিউক যোষেফ মন্ডল, দীপা জ্যাকলিন মন্ডল, ইমেল্ডা প্রমা ডি'ক্রুজ, রেমন্ড কাব্য রোজারিও, জেমস দিব্য রোজারিও এবং রোজ-আরিয়া কেসিয়া রোজারিও

ছেলে বউগণ: বারবারা কাকলী রোজারিও এবং এনেট লাবণী রোজারিও

মেয়ে জামাইগণ: মার্ক দিলীপ মন্ডল এবং কর্ণেলিয়াস টুটুল ডি'ক্রুজ

ছোট বোন: পূর্ণিমা সিসিলিয়া রোজারিও

স্বামী: রেমন্ড রোজারিও

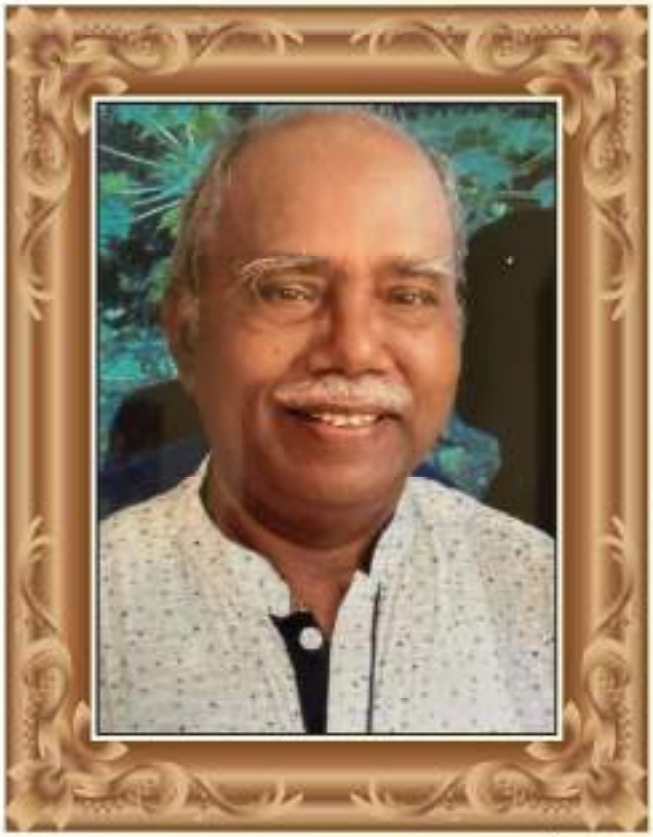

বাবা / দাদু
আমরা তোমায়
অনেক অনেক ভালবাসি

প্রয়াত আলফন্স রোজারিও

জন্ম : ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ

রাঙ্গামাটিয়া মিশন, ছোট সাতানীপাড়া

মৃত্যু : ৬ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

(ইউনাইটেড হাসপাতাল, ঢাকা)

গ্রাম: কুচিলাবাড়ি

মঠবাড়ি মিশন, কালিগঞ্জ, গাজীপুর।

দেখতে দেখতে এক বছর ছয় মাস চলে গেল, আবার ফিরে এলো পাস্কা। এতো তাড়াতাড়ি তুমি আমাদেরকে ছেড়ে এভাবে চলে যাবে, তা কোনদিন ভাবতেও পারিনি। তেমন কোন অসুস্থতার লক্ষণও তোমার মধ্যে আগে থেকে পরিলক্ষিত হয়নি। তারপরেও কঠিন নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে-সব মিলিয়ে প্রায় এক মাসের মধ্যেই একজন জলজ্যান্ত মানুষ থেকে শুধুই ছবি হয়ে গেলে সবার কাছে। অনন্তের অসীম নীলিমায় হারিয়ে গেলে তুমি। তোমাকে ছাড়া আমাদের কোন কিছুই আর পরিপূর্ণতা পায় না। কোন পার্বণ বা কোন পারিবারিক অনুষ্ঠান, কোন কিছুতেই না। একটা অপূরণীয় শূন্যতায় নিমগ্ন থাকে সবাই। খেতে গেলে ও সন্ধ্যা প্রার্থনার সময় তোমার চেয়ারখানা খালি পড়ে থাকে। রাতে ঘরে ফিরতে দেরী হলে – আর তোমার কল বেজে ওঠে না। কেউ আর আদরমাখা গলায় বলে না "দেরী করতেছো কেন? তাড়াতাড়ি বাড়ি এসে খেয়ে বিশ্রাম করো।" আবার বাড়ি ফিরলে তোমার স্নেহমাখা স্নিগ্ধ হাসি দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যেতো – সব কালিমা দূর হয়ে যেতো। এখন সেইসব কিছুই একটা ছবিতে আবদ্ধ হয়ে আছে। হাসপাতালে থাকা অবস্থায় শত কষ্টের মধ্যেও কোনদিন বলো নাই- কষ্টের কথা। "কেমন আছো" - জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিতে "আমি তো ভালই আছি।" জীবনযুদ্ধে তুমি কখনও পিছু পা হওনি - ছোটবেলা হতে অধ্যবসায়ের দ্বারা কিভাবে বড় হওয়া যায় ও জীবনে উন্নতি করা যায় - তা তুমি আমাদেরকে শিখিয়েছ। অলসতা তুমি মোটেও পছন্দ করতে না। তুমি ছিলে কঠোরভাবে নিয়মানুবর্তী। সময়ের কাজ সময়ে ও নিজের কাজ নিজে করতে তুমি উৎসাহিত করতে সবাইকে। মা মারীয়ার প্রতি তোমার অসীম ভক্তি ছিলো। রোজই রোজারীমালা হাতে করে হাঁটতে বেরোতে এবং সন্ধ্যায় পরিবারের সবাইকে নিয়ে নিয়মিত রোজারীমালা প্রার্থনা করতে - নিয়মিত গির্জায় যেতে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করতে।

তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো আমরা যেন তোমার আদর্শে চলতে পারি এবং ঈশ্বরের পথ থেকে যেন বিচ্যুত না হই।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদের বাবা / দাদু-কে স্বর্গে অনন্ত শান্তি দান করুন।

সবার প্রতি রইলো পাস্কা ও বাংলা নববর্ষের অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

তোমার সহধর্মিনী
সিসিলিয়া রোজারিও

তোমার স্নেহধন্য -
পুত্র ও পুত্রবধূগণ এবং একমাত্র কন্যা ও জামাতা

তোমার অনেক আদরের নাতি-নাতনিরা -
ঐশী, যাকোব, অর্থী, অথৈ, অহনা, প্রাপ্তি, কৃপা, অদ্রি, অবনী, রাহেল, মার্সিয়া ও স্যাম।

পুনরুত্থানের প্রতিধ্বনি : "তুমি প্রতিনিয়ত নবীন রাখ"

ড. বার্থলমিয় প্রত্যুষ সাহা

প্রতি বছরেই প্রভু যিশুর গৌরবময় পুনরুত্থান উৎসবে আমার মনে কোনো না কোনো সুর বা ধ্বনি বার বার অনুরণিত হ'তে থাকে। কোনো কোনো বছর এ সময়ে শুনি আমার বহু দিন আগে রচিত "উঠেছেন আজি প্রভু যিশু কবর ছেড়ে" গানের সেই কলি:

"পেয়েছি মোরা নতুন পৃথিবী, নতুন জীবন আজ
পেয়েছি মোরা নতুন আলো, নতুন মোদের সাজ
পেয়েছি মোরা নতুন ইশারা, নতুন মোদের কাজ।"

অথবা মনে জাগে "পরমেশ্বরের মৃত্যুঞ্জয় অদ্বিতীয় পুত্র" গানটির কথা আর সুর :

"এই শুভদিন তিনিই করেছেন সৃষ্টি
এই শুভ লগ্নে তিনিই করুণার বৃষ্টি।"

কোনো কোনো বার গেয়ে উঠি "কবর তোমাকে বেঁধে রাখতে পারেনি" গান থেকে :

"তোমার ওই শূন্য করব প্রতিদিন বলে দেয়
জীবনে আর এক জীবন আছে
সে তো শুধু ওই জ্বালাময় মৃত্যু নয়।"

এ বছর আমার মনে যে বাণী ও সুর ধ্বনি-প্রতিধ্বনি হয়ে বার বার বেজে উঠছে, তা একটি সামগীত- "আমার প্রাণের সামগীত" গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিতব্য, ১০৪ নং সামগীত, গানটির "স্থায়ী" এরূপ:

"তুমি প্রতিনিয়ত নবীন রাখ এই ধরণীতল
তোমার মহিমা বিরাজিত হোক, হে প্রভু চিরকাল।"

এর পেছনে হয়তো রয়েছে গত দুই বছরের এই কোভিড মহামারির প্রেক্ষিত, এবং বিশ্ব মানুষের অপরিসীম দুর্ভোগ। এই প্রেক্ষিতে গোটা পৃথিবীর মানুষইতো এখন চাইছে এক "নবীন জীবন," চাইছে সমগ্র সৃষ্টির নবজাগরণ!

প্রতি বছরেই পুনরুত্থান পর্বটি আসে নতুন জীবন দিতে। নব বসন্তে যেমন প্রকৃতি জেগে ওঠে মহাসমারোহে, আর চারিদিক ভ'রে যায় সবুজে সবুজে, তেমনি এই দিনে পুনরুত্থিত খ্রিস্টপ্রভু আমাদের সকলের জীবনে ঘটান "নব জাগরণ"! পুনরুত্থানের ডাক তাই নব জীবনে প্রবেশ করার ডাক।

তাইতো "নিস্তার জাগরণী" (Easter Vigil) মধ্য-রাতের উপাসনায় আমরা পাই এই নবজাগরণের বহু প্রতীক। এই উপসনা প্রার্থনায়, বাইবেল পাঠে সাক্রামেন্তে ও গানে আমরা পাই নতুন জীবনে চলার প্রয়োজনীয় শক্তি আর অনুপ্রেরণা।

"নিস্তার জাগরণীর" ওই রাতের ভাবগম্ভীর উপাসনা অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ অংশ হচ্ছে পবিত্র বাইবেল থেকে নির্ধারিত সাতটি পাঠ। এই পাঠের প্রথমটি হচ্ছে আদি পুস্তকের প্রথম অধ্যায় থেকে, যেখানে বর্ণিত হয়েছে সৃষ্টিকর্তা প্রভু পরমেশ্বরের গড়া এই মহাসৃষ্টির রচনা-কাহিনী। এই পাঠে আমরা স্মরণ করি কীভাবে তিনি সৃষ্টি করলেন আলো, এই আকাশ, বাতাস, চাঁদ, তারা, আর এই বিশাল পৃথিবীটাকে। স্মরণ করি কীভাবে তিনি সৃষ্টি করলেন জগতের পশু-পাখী, জীব-জন্তু আর অবশেষে নর ও নারী। আর পরম প্রভু দেখলেন যে তিনি যা যা সৃষ্টি করেছেন তা সবই ভাল।

এই বিস্ময় জাগানো পাঠের পরে আমরা যে বন্দনা গীতিটি গেয়ে উঠি তা ১০৪ নং সামসঙ্গীত থেকে। সেই সামসঙ্গীতে আছে ৩৫টি পদ এবং যে পদটি সামসঙ্গীতের ধূয়ো হিসেবে মণ্ডলী বেছে নিয়েছে তা হল ৩০ নং পদ থেকে:

"তোমার সে প্রাণ বায়ু যেই তুমি সঞ্চারিত কর,
তখনই জীবের সৃষ্টি হয়।
তুমি তো এমনি করে নিয়ত নবীন রাখ এ ধরণীতল।"

ইংরেজীতে এই সামসঙ্গীতের যে ধূয়োটি গাওয়া হয়, তা এরূপ:

"Lord, send forth your Spirit,
and renew the face of the earth "

বোঝাই যাচ্ছে ওই পুণ্য রজনীতে সৃষ্টির বিষয়ে বাইবেল পাঠের পরে ১০৪ নং সামসঙ্গীতটি কতই না তাৎপর্যপূর্ণ, কতই না উপযুক্ত! এই সামসঙ্গীতের মাধ্যমে আমরা পরমেশ্বরের স্তুতিগান করি গোটা সৃষ্টির জন্যে; স্তুতিগান করি, কারণ তিনি তাঁর অসীম দয়ায় জগতকে জীবন্ত রাখেন,"নবীন" রাখেন তিনি নব তৃণদল অঙ্কুরিত ক'রে বাঁচিয়ে রাখেন গবাদি পশু, আর মানুষকে দিয়ে যান প্রয়োজনীয় অন্ন আহার।

ওই সামসঙ্গীতের অনুসরণে গান রচনা করতে গিয়ে আমার প্রাণে যে গানটি এলো তা-ই: "তুমি প্রতিনিয়ত নবীন রাখ" গানটি। এই গানের সম্পূর্ণ কথা আর স্বরলিপি নিম্নে দেওয়া হ'ল:

তুমি প্রতিনিয়ত নবীন রাখ

তুমি প্রতিনিয়ত নবীন রাখ এই ধরণীতল
তোমার মহিমা বিরাজিত হোক
হে প্রভু চিরকাল।

১। ভাবনা আমার তোমার কাছে হোক সুমধুর
পৃথিবী জুড়ে বাজুক তোমার আনন্দ-নূপুর
অন্তর আমার করুক প্রভু তোমার স্তুতিগান
গৌরবে বিভূষিত প্রভু মহীয়ান।

২। উর্দ্ধে জলরাশির উপর বাঁধো তোমার ভবন
বায়ুর পাখায় পাখায় তুমি কর সঞ্চরণ
মেঘের রথেই কর তুমি কর আনাগোনা
জ্যোতির্ময় প্রভু তুমি, করি বন্দনা।

৩। তোমার কর্ম ফলভারে জগৎ তৃপ্ত রয়
অঙ্কুরিত নব তৃণ তোমার দয়ায় হয়।
মানুষের অন্ন-আহার তোমারই দান জানা
জ্যোতির্ময় প্রভু তুমি, করি বন্দনা॥

তুমি প্রতিনিয়ত নবীন রাখ

কথা, সুর ও স্বরলিপি : ড. বার্থলমিয় প্রত্যুষ সাহা

				II গা রা তুমি
	গা ধা ধা প্র তি নি	ধা ধা । য় ত ০	র্সা না ধা ন বী ন্	পা ধা । রা খ ০
	গা । রা এ ই ধ	সা রা । র নী ০	রা গা । ত ল্ ০	। । । ০ ০ ০
	গা পা । তো মা র্	গা ধা ধা ম হি মা	র্সা না ধা বি রা জি	পা ধা । ত হো ক্
	গা পা । তো মা র্	গা ধা ধা ম হি মা	ধা র্রা র্সা বি রা জি	ন ধা । ত হো ক্
	পা । গা হে ০ প্র	রা সা ন্া ভু চি র	সা ধ্া । কা ০ ল্	। (গা রা) II ০ তু মি
II {	গা । গা ভা ব্ না	রা সা । আ মা র্	গা পা । তো মা র্	গা পা । কা ছে ০
	ধা । না হো ক্ সু	ধপা ধা । ম ধু র্	। । । ০ ০ ০	। । । ০ ০ ০
	র্সা র্সা র্সা পৃ থি বী	না ধা । জু ড়ে ০	ধা না । বা জু ক্	পা গা । তো মা র্
	রা সা । আ ন ন্	রা । রা দ ০ নূ	গা । । পু ০ ০	। । । } র্ ০ ০
	পা । ধা অ ন্ তর্	পা ধা । আ মা র	র্সা র্সা । ক রু ক্	র্সা র্সা । প্র ভু ০
	র্রা র্রা । তো মা র্	র্সা । না স্ত ০ তি	ধ্া । । গা ০ ০	। । । ন্ ০ ০
	ধা । পা গৌ ০ র	গা । রা বে ০ বি	সা । রা ভূ ০ ষি	গা । । ত ০ ০
	সা । রা প্র ০ ভু	ন্া । সা ম ০ হি	ধ্া । । য়া ০ ন্	। (গা রা) II ০ তু মি
II	র্সা । র্সা উ র্ দ্ধে	র্সা র্সা । জ ল ০	র্রা র্সা । রা শি র্	না ধা । উ প র্
	ধা না । বাঁ ধো ০	পা ধা । তো মা র্	ধা ধা । ভ ব ন্	। । । ০ ০ ০
	র্সা র্সা । বা য়ু র্	র্সা র্সা । পা খা য়্	র্রা র্সা । পা খা য়্	না ধা । তু মি ০
	ধা না । ক র ০	পা । ধা স ন্ চ	ধা । । র ০ ০	। । । } ণ্ ০ ০
	ধা ধা । মে ঘে র্	ধা ধা । র থে ই	পা পা । ক র ০	পা পা । তু মি ০

	গা	গা	া	রা	সা	া	রা	গা	া	া	া	া	
	ক	র	০	আ	না	০	গো	না	০	০	০	০	
	গা	গা	া	গা	া	া	রা	সা	া	রা	গা	া	
	জ্যো	তি	র্	ম	০	য়্	প্র	ভু	০	তু	মি	০	
	সা	া	রা	ন্া	া	সা	ধা	া	া	া	(গা | রা)	
	ক	০	রি	ব	ন্	দ	না	০	০	০	তু	মি	II
II	র্সা	র্সা	া	র্সা	া	র্সা	র্রা	র্সা	া	না	ধা	া	
	তো	মা	র্	ক	র	ম	ফ	ল	০	ভা	রে	০	
	ধা	না	া	পা	া	ধা	ধা	া	া	া	া	া	
	জ	গ	ৎ	তৃ	০	ণ্ড	র	০	০	য়্	০	০	
	র্সা	া	র্সা	র্সা	র্সা	া	র্রা	র্সা	া	না	ধা	া	
	অ	০	ঙ্কু	রি	ত	০	ন	ব	০	তৃ	ণ	০	
	ধা	না	া	ধপা	ধা	া	ধা	া	া	া	া	া	
	তো	মা	র্	দ	য়া	য়্	হ	০	০	য়	০	০	
	ধা	ধা	া	ধা	া	া	পা	া	পা	পা	পা	া	
	মা	নু	০	ষে	০	র্	অ	০	ন্ন	আ	হা	র্	
	গা	গা	া	রা	সা	া	রা	গা	া	া	া	া	
	তো	মা	র্	ই	দা	ন্	জা	না	০	০	০	০	
	গা	গা	া	গা	া	া	রা	সা	া	রা	গা	া	
	জ্যো	তি	র্	ম	০	য়্	প্র	ভু	০	তু	মি	০	
	সা	া	রা	ন্া	া	সা	ধা	া	া	া	(গা | রা)	
	ক	০	রি	ব	ন্	দ	না	০	০	০	তু	মি	IIII

লেখক: গীতিকার, সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী, কানাডা

ট্রুথ বনাম ফ্যাক্ট

(৩২ পৃষ্ঠার পর)

হবে। তবে আমরা কিভাবে আমাদের পাপের বোঝা বহন করতে পারি? আমরা কেবলমাত্র তা যিশুর দিকেই ছেঁড়ে দিতে পারি, কারণ তিনি সম্পূর্ণরূপেই নিষ্পাপ ছিলেন, ঈশ্বরের নিষ্পাপ সন্তান। যিশুর বাণী অনুযায়ী ঈশ্বরের পুত্রকে যে বিশ্বাস করবে সে অনন্ত জীবন পাবে। এখানেই ঈশ্বরের অসীম দয়া নিহিত। আর আমরা যেহেতু যিশুর কষ্টভোগে আমাদের পরিত্রাণ- এই মুক্তিপণ তত্ত্বে বিশ্বাসী, কাজেই আমাদের নিজেদের পাপ আমাদের শৃঙ্খলিত করতে পারে না।" প্লিমাউথ-ভ্রাতার এই যুক্তি গান্ধীজীকে উদ্বুদ্ধ করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হয়। প্লিমাউথ-ভ্রাতাদের সাথে পরিচয়ের আগেই তিনি জেনেছেন যে সব খ্রিস্টিয়ানগণ এধরনের মুক্তিপন তত্ত্বে বিশ্বাসী নন। মিঃ কোটস্ (তার পূর্ব পরিচিত) একজন ঈশ্বর-ভীরু, খাঁটি হৃদয়ের মানুষ যিনি আত্মশুদ্ধিতে বিশ্বাস করতেন। গান্ধীজী প্লিমাউথ-ভ্রাতাকে নম্রচিত্তে উত্তর দেন, "যদি এই খ্রিস্টানত্ব সকল খ্রিস্টানগণ দ্বারাই স্বীকৃত হয় তবে আমি তা সমর্থন করতে পারি না। আমি পাপের পরিণতি থেকে মুক্তি খুঁজি না, আমি মুক্ত হতে চাই স্বয়ং পাপ থেকে,অধিকতর পাপের প্রকৃত চিন্তা থেকে।" আর এভাবেই গান্ধীজী জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে 'ফ্যাক্ট' এর যৌক্তিক জ্ঞান এবং 'ট্রুথ' এর গভীরতা, মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য্য অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

পিলাতরাজ্যে যে শাসন-ব্যবস্থা, ক্ষমতা, বিচার-বিধির প্রাধান্য ছিল তা অপ্রাসঙ্গিক নয়। এহেন রাজ্যের বিচারে দণ্ডাদেশের পরিমাপক হল কঠোর নীতি কিংবা কূটনীতি। তবে যিশুরাজ্যে বিরাজে ভালবাসা, ন্যায্যতা, দয়া, ক্ষমা, উদারতার বিধান। কঠোর নীতি কিংবা কূটনৈতিকতাকে তো সে সমর্থন করেই না বরং নৈতিকতারও অনেক উর্দ্ধে, আর সেই সত্য-সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করার পরম জ্ঞান পিলাতের থাকবার কথা নয়। আর যিশুর দেখানো ভালবাসা,দয়া এবং ক্ষমাই হোক আমাদের সত্য-তপস্যার পরিচায়ক, সকল প্রকার ভ্রষ্টতাকে ছাপিয়ে।

জীবনের শেষ দিনগুলোতে যিশু শিষ্যদের বলেছিলেন- "সত্য তোমাদের স্বাধীন করে দিবে।" *(যোহন ৮:৩২)* বাহ্যিক স্বাধীনতার অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে। তবে অন্তরের স্বাধীনতা যাদের নিকট প্রকৃত স্বাধীনতা সত্য-অন্বেষণ, সত্য-সাধনা তাদেরকে প্রবুদ্ধ করবে। হোক সে সাধনার পথ কঠিনতর, সত্য-সাক্ষাতে তারা মুক্তিলাভ করবে; আত্মমুক্তি॥ ❑

সহায়ক গ্রন্থ: এ্যান অটোবায়োগ্র্যাফী - দ্য স্টোরি অফ মাই এক্সপেরিমেন্টস উইথ ট্রুথ।

লেখক: শিক্ষিকা, রাঙামাটি

পুনরুত্থিত খ্রিস্ট

টুটুল রড্রিগস

নেই কোন সংশয়
নেই কোন ভয়,
খ্রিস্টপ্রভু মৃত্যুকে
করেছেন জয়।
মোদের পাপের ভার
তিনিই নিলেন,
মোদের পাপের তরে
জীবনও দিলেন।
কবর ছাড়ি পুনঃ
উঠলেন তিনি,
মুক্তিদাতা খ্রিস্ট জেনে
তাঁকে মোরা মানি॥

খোলা জানালা

মানুষের ধান্ধা ধরিত্রীর কান্না

অর্পা কুজুর

প্রলোভন মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। লোভের বশবর্তী হয়ে মানুষ বিভিন্ন অসৎ উপায় অবলম্বন করে অন্যের ক্ষতি করে। লোভের কারণে মানুষের ধান্ধাবাজ চরিত্রটি বিকশিত হতে থাকে। সাধারণ অর্থে লোভী এবং নীতিবোধহীন মানুষকেই ধান্ধাবাজ বলা যেতে পারে। যে মানুষ যথেষ্ট থাকার পরেও আরও পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে এবং নীতিবোধহীনভাবে পাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালায় এবং নীতিহীন কাজকেও অন্যায় বলে বিবেচনায় নেয় না সেটিই হলো সেই মানুষের ধান্ধা। ধান্ধা হলো সম্পদ অর্জনের বিবেকহীন অনুসন্ধান যেখানে মানুষ ও প্রকৃতির ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে। ধান্ধাবাজ মানুষ প্রকৃতির উপর চরম শক্তি প্রয়োগ করে। বর্তমান সমাজে ধান্ধাবাজ মানুষ দিয়ে ভরে যাচ্ছে। মানুষের ধান্ধার কারণে ধরিত্রী কাঁদছে। ধরিত্রীর আর স্বাভাবিক অবস্থা নেই প্রকৃতিতে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজমান। ধরিত্রীর মাটি পানি বায়ু এবং সৌর শক্তির যে আধার রয়েছে পৃথিবীতে সেটির সক্রিয়তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে এবং এর জন্য দায়ী ধান্ধাবাজ মানুষের কর্মক্রিয়া।

মানুষের ধান্ধা এবং ধরিত্রীর কান্নার একটি বড় উদাহরণ হলো অপরিকল্পিত নগরায়ন। মানুষের ধান্ধা এবং লোভ প্রকৃতিকে ধ্বংস করছে নগরায়নের মাধ্যমে। মানুষ গাছ-পালা কেটে প্রকৃতিকে উজাড় করে দিচ্ছে এবং সেখানে ইট, পাথর এবং কংক্রিটের দেয়াল তুলছে। ইট পাথর কখনই তাপকে ধরে রাখে না বরং তাপকে বাতাসে ছেড়ে দেয় ফলে বাতাস ক্রমশ গরম হতে থাকে এবং চারিপাশের পরিবেশকে গরম করে তোলে। এই তাপ হলো কার্বন-ডাই অক্সাইড যা বাতাসে মিশে বাতাসকে গরম করছে। এখানে প্রয়োজন ছিল সকল দালান কোঠার চারিপাশে পরিকল্পিতভাবে প্রচুর গাছপালা রোপণ এবং গাছপালা তাপকে অর্থাৎ বাতাস থেকে কার্বনডাই অক্সাইডকে শোষণ করে পরিবেশকে ঠাণ্ডা রাখে কিন্তু ধান্ধাবাজ মানুষ তা হতে দেয় না। স্বাভাবিকভাবেই শহরাঞ্চলে গরম বেশী। ধান্ধাবাজের যদি একটি বাড়ী সে চায় আরো বাড়ী করতে। একটি ব্যবসা থাকে সে চায় সেটা আরোও বাড়াতে কারণ ধান্ধাবাজের সঙ্গে ব্যবস্যা এবং অধিক মুনাফা লাভের সম্পর্ক রয়েছে। অধিক মুনাফা লোভীরা তাদের প্রয়োজনে পরিবেশ প্রকৃতিকে ধ্বংস করতে খুব বেশী তোয়াক্কা করে না কারণ তাদের লক্ষ্য পরিবেশ রক্ষা নয় মুনাফা অর্জন। আমরা যদি শহরের দিকে তাকাই দেখতে পাবো ইট পাথরের অনেক অবকাঠামো যেখানে সবুজের কোন স্পর্শ নেই। শহরের অবকাঠামো দেখো মনে হতে পারে আমাদের অনেক উন্নয়ন হয়েছে কিন্তু সবারই মনে রাখা প্রয়োজন পরিবেশকে ধ্বংস করে কোন উন্নয়নই টেকসই হয় না। পরিবেশ ধ্বংসের কারণে মানুষ স্বাস্থ্যহানিসহ বহুবিধ সমস্যায় পড়ে জীবন যাপনেও ব্যাঘাত ঘটে। প্রকৃতিও তখন নীরবে কাঁদে কারণ মানুষ তো প্রকৃতিরই সন্তান।

ধান্দাবাজ মানুষের ধান্ধার কারণে পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটবে অবধারিতভাবে। ইতিমধ্যেই আমরা তা অনুধাবণ করতে পারছি এবং প্রতিনিয়ত অভিজ্ঞতাও করছি। আমরা পরিবেশের দিকে তাকালে অনেক কিছুর পরিবর্তন দেখতে পাই। আগে যে ফুল ফুটতো এখন হয়তো সে ফুল আর ফোটে না কিংবা দেখা যায়না। আগে বিভিন্ন ধরণের পাখির ডাক শোনা যেত বনে, জঙ্গলে অথবা ঘর-বাড়ীর আশে পাশে গাছের কোন ডালে কিংবা সন্ধ্যা হলে জোনাকিরা আলো জ্বালাতো আমাদের চারপাশ ঘিরে সাথে ছিল ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। এখন আর কিছুই নেই সব কিছু কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। কত ধরণের ফসল ছিল কৃষকের জমিতে। একের পর এক ফসল ফলানো বিভিন্ন জাতের ধান মৌসুমি ডাল, মৌসুমি ফল ও সব্জি উৎপাদনে কৃষক ব্যস্ত থাকতো সারাবছর। ধানের কত জাত ছিল যেমন আউশ, আমন, বুরো ছাড়াও সুগন্ধি চালের ধান, চিড়ামুড়ি অথবা খৈ এর ধান, পিঠা পায়েসের জন্য ভিন্ন জাতের ধান ছাড়াও আরও কত ধরনের ধান। সেই ধানগুলি আজ কিন্তু আর নেই এখন সবই হাইব্রিড। সেই ফসল শুধু ফসলই ছিল না, তা ছিল একটি বন্ধন, সম্পর্ক ও ভালবাসার সংস্কৃতি। বাড়ীতে আত্মীয় স্বজন এলে অথবা বিভিন্ন উৎসব পার্বণে পিঠা পায়েস দই খৈ- এর যে আন্তরিক আপ্যায়ন এবং খাবারের স্বাদ তা আজও হৃদয় মনকে ছুঁয়ে যায়। এখন আর সে ফসলগুলি আর আবাদ হয়না কারণ এ ফসলের জন্য মাটির গুণাগুণ ও পরিবেশের যে ভারসাম্য দরকার তা আর নেই বিধায় এই ফসলের জাতগুলিই বিলুপ্তির পথে আর সেখানে জায়গা করে নিয়েছে উচ্চপ্রযুক্তির ফসল হাইব্রিড যেখানে উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং বিপনন সকল ক্ষেত্রেই উচ্চ প্রযুক্তি ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। হতে পারে খুব শিঘ্রই দেশী ও স্থানীয় জাতের বৈচিত্র নষ্ট হবে এবং আমরা কখনই তা আর খুঁজে পাবো না। এমনিভাবে বিভিন্ন দেশীয় ফল যেমন জাম, জামরুল, কৎবেল, আতাঁ, কাঠাল, নারিকেল, তাল, তরমুজ, আমড়া, কামরাঙ্গা, বেল, পেয়ারা, পেঁপে, ডালিম, জলপাই, বরই আগের মত আর বাড়ীর আঙ্গিনায় দেখা যায়না। দেশী ফলের বানিজ্যিক চাষ সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতাকে কেড়ে নিয়েছে। মাছ ও গাছের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। দেশী মাছ টেংরা, পুটি, চিংড়ি, খৈলসা, রুই, শিং, মাগুর আর নদী জলাশয়ে নেই। সবই বিলুপ্তির পথে কিন্তু বর্তমানে বাজারে যা দেখা যায় তা প্রযুক্তিগত এবং বানিজ্যিক উৎপাদন এবং পূর্বের এবং বর্তমানের মধ্যে গুণে, মানে, স্বাদে গন্ধে বিস্তর ফারাক। বৈরি আবহাওয়া অতি গরম, অতি বৃষ্টি, অতি খড়া, শীত এইসব প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর ব্যাপক প্রভাব নিয়ে আসে। অতি বন্যার কারণে অনেক গাছ মারা যায় পরে আর সেই গাছগুলি নতুন করে গজায়না আবার বৈরী আবহাওয়া কারণেই ফুল ফোটে না অথবা সময়ের অনেক আগে অথবা অনেক পরে ফোটে কিন্তু পরাগায়ন হয়না এবং ফলও ধরেনা এইভাবে অনেক গাছের প্রজাতিই আজ বিলুপ্ত। এরকম অনেক প্রাণীর ক্ষেত্রেও প্রজনন সংকট তৈরী হচ্ছে এমনকি বিভিন্ন পত্র পত্রিকা পর্যালোচনা করলে ভয়ঙ্কর খবর চোখে পড়বে যে হাইব্রিড ফল, ফসল এবং খাদ্যে ভেজাল এবং বিষাক্ত বায়ু, দূষিত পরিবেশের কারণে বর্তমানে অনেক দম্পতি সন্তান ধারণে অক্ষম হয়ে পড়ছেন। এমন খবর নিশ্চয় সুখকর নয়। সন্তান ধারণ ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকলে মানব জাতিও একদিন বিলুপ্তি হবে এমন ধারণা বর্তমানে অমূলক নয়। প্রশ্ন হতে পারে স্বাভাবিকভাবে জন্ম নেয়া বেড়ে ওঠা,

বেঁচে থাকা প্রাণীকুল এবং জীবজন্তুর স্বাভাবিক প্রজনন কেন ব্যাহত কেন বিলুপ্ত হচ্ছে? সর্বাগ্রে উত্তর আসবে জলবায়ু পরিবর্তন। অবশ্যই জলবায়ু পরিবর্তন তবে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে জলবায়ু পরিবর্তন যতটা না প্রাকৃতিক তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশী মনুষ্যসৃষ্ট। বাতাসে সিসার উপস্থিতি অর্থাৎ ইসপাতের ছোট ছোট টুকরা, সালফারডাই অক্সাইড অর্থাৎ বিভিন্ন কলকারখানার চিমনি থেকে বাইরে বেরিয়ে আসা ছাই যা বাতাসে থাকা জলীয় বাষ্পের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে সালফারডাই অক্সাইডে রূপান্তরিত হয় তা বাতাসকে বিষাক্ত করছে। বাইরে উন্মুক্ত স্থানে ফেলে দেওয়া ময়লা আবর্জনা পঁচে যাওয়া থেকে উৎপত্তি মিথেন গ্যাস বাতাসে মিশে কার্বনডাই অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়। সিএফসি গ্যাস এসি, রিফ্রিজারেশন থেকে নির্গত বিষাক্ত ধোয়া যা বাতাসে অনবরত মিশছে এবং বাতাসকে গরম করছে। প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনে বছরের সকল সময় আমরা গরম এবং বিষাক্ত বায়ু সেবন করছি। এইভাবে পরিবেশ দূষণের জন্য মূলত বিবেকহীন এবং ধান্ধাবাজ মানুষই দায়ী যারা অধিক মুনাফা লাভের জন্য সবকিছুকে বানিজ্যিকিকরণ করছে। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে না থেকে বড় বড় কলকারখানায় কয়লা ও গ্যাসের ব্যবহার বাড়িয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবেশকে ধ্বংস করছে। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য যা কিছু দরকার তার সকল কিছুই আমরা প্রকৃতি থেকেই পাই। বিষয়টি ব্যবসায়িক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি কখনই তার বিবেক দিয়ে দায়িত্বের সাথে চিন্তা করে না কারণ ব্যবসায় মুনাফা একটি বড় বিষয় এবং সেটিই তার কাছে প্রধান বিবেচ্য, পরিবেশ প্রকৃতি গুরুত্বপূর্ণ নয়। বেঁচে থাকার জন্য মানুষসহ সকল প্রাণীকুল, জীবজন্তু, গাছ-পালা প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতির পরিবেশ এবং প্রতিবেশ সম্পর্ক বা ইকোলজিক্যাল সিস্টেম আমাদের এমনভাবে সম্পৃক্ত করে রেখেছে আমরা প্রকৃতিতে একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল। এটি একটি শেকলের মত। এই নির্ভরশীলতার শেকল বা সম্পর্ক যদি ছিন্ন হতে থাকে তাহলে আমরা কেউই বাঁচবো না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই ইকোলজিক্যাল সিস্টেম ঈশ্বর নিজে সৃষ্টি করেছেন, কোন মানুষ নয়। ঈশ্বরের সৃষ্টি রহস্য এতো গভীর যা আমাদের সাধারণের পক্ষে বোঝা অসম্ভব। কিন্তু আমাদের হৃদয় দিয়ে গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে যে আমরা যেন ধরিত্রীর বুকে ঈশ্বরের সৃষ্টি সম্পর্ককে ভালবেসে, যত্ন করে দায়িত্বের সাথে টিকিয়ে রাখি নইলে এই ধরিত্রীর যখন বিরাগ হবে আমরা হয়তো নিশ্চিহ্নই হয়ে যাবো। ধান্ধবাজদের প্রকৃতির প্রতি উদার হৃদয় ও সচেতন বিবেক তৈরীর জন্য ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রতিনিয়ত প্রার্থনা নিবেদন করা প্রয়োজন।

পলিথিনের অতি মাত্রায় বানিজ্যিক ব্যবহার পরিবেশ দুষণের একটি অন্যতম কারণ। পলিথিন পঁচে না, নষ্টও হয় না। জলাবদ্ধতা তৈরী করে। পরিবেশকে দুষিত করে। আমাদের এমন কোন দিন নেই যে দিন আমরা পলিথিন ব্যবহার থেকে বিরত থেকেছি। দৈনন্দিন জীবন যাপনে পলিথিনের ব্যবহার আমাদের সংস্কৃরি অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছুতেই যেন এড়িয়ে চলা সম্ভব হয়ে উঠছেনা। পলিথিন উৎপাদন ও বিক্রির মূলে রয়েছে সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের উদ্দেশ্য কারণ যারা এর উৎপাদক এবং বিপননকারী প্রত্যেকেই সচেতনভাবে জানেন যে পলিথিন একটি হাইড্রোকার্বনেট উপকরণ এবং এর ব্যবহার যত বাড়বে ততই পরিবেশের ক্ষতি হবে। কিন্তু ধান্ধাবাজ ব্যবসায়ীগণ অধিক মুনাফা লাভের প্রত্যাশায় পলিথিন উৎপাদন কখনই বন্ধ করে না। সাধারণ ক্রেতা বা ব্যবহারকারীগণ ব্যবহারের উপযোগীতার দিকটিই মাত্র চিন্তা করেন কারণ তৈজসপত্র হিসাবে গৃহস্থালী কাজে পলিথিনের জনপ্রিয়তা রয়েছে। পলিথিন সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সচেতনতার বিষয়টি পরিবার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, স্কুল কলেজ, মাদ্রাসা, বিভিন্ন ক্লাব, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা এবং ইন্সিটিটিউশনগুলিতে ব্যাপকভাবে জোরদারের প্রয়োজন রয়েছে। পলিথিন পরিবেশকে কিভাবে ক্ষতি করছে তা বিস্তারিত তুলে ধরতে সচেতনতা দরকার। শুধুমাত্র এখানে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না এটিকে সামাজিক আন্দোলনের সাথে রাজনৈতিক আন্দোলনেও পরিণত করা প্রয়োজন। রাজনৈতিকভাবে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ কারণ পলিথিনের ব্যবহার ও উৎপাদন আইনগতভাবে নিষিদ্ধ হলে এর বিকল্প উপায়ে কাপড়ের বা কাগজের উপকরণ দিয়ে তৈরী ব্যাগ বা উপকরণ ব্যবহারে মানুষকে উদ্বুদ্ধকরণ সহজ হবে।

ধান্ধা কখনই ভাল অর্থকে বোঝায় না। এটি ব্যক্তি স্বার্থ থেকে উদ্বুদ্ধ। ব্যক্তি স্বার্থ যখন বড় হয় তখন সর্বজনীনতা হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু আমাদের ধরিত্রী তো সর্বজনীন। আমাদের ধরিত্রীর ক্ষতি মানে সমগ্র বিশ্বের ক্ষতি, সবকিছুরই ক্ষতি। আমাদের সকলের উচিত ব্যক্তিস্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে গণমঙ্গলের জন্য চিন্তা করা। আমাদের আচরণে ও কাজে যেন আমরা পৃথিবী তথা ধরিত্রীর ধ্বংস না করি। আমরা যেন আমাদের বিবেককে জাগ্রত করি, পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করি। ভালবেসে ঈশ্বরের সৃষ্টিকে যত্ন করি যা ঈশ্বরই ভালবেসে আমাদের দান করেছেন॥ ❑

লেখক: গবেষক, সিডিআই
কারিতাস বাংলাদেশ

স্বাধীনতা কি নষ্ট হয়ে যাবে?

দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ

বাংলার সবুজ মাটিতে আজও
রক্তের দাগ দেখা যায় নিত্য
মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে
রক্তের সাগরে ভেসেও
অনেকর স্বপ্নছিলো
শোষণমুক্ত সুন্দর একটি সোনার
বাংলা দেখার।

কিন্তু তারা আজও কাঁদে
কাঁদে তাদের স্বপ্নগুলো
কারণ আজও
সকাল হতে গভীর রাতে
ডাষ্টবিনের ধারে
ক্ষুধার্ত মানুষের ভীড়
অথচ চালের গুদামে চাল লুটপাট হচ্ছে
পঁচে যাচ্ছে বস্তায় বস্তা চাল
দুর্নীতি কালোটাকার ছড়াছড়ি
ভোগবাদীদের।

অনেক বীর মুক্তিযোদ্ধাদের
দুর্বিসহ মানবেতর জীবনের
বোবাকান্না শোনা যায়
স্বাধীনতা ও বিজয়ের
সূবর্ণ জয়ন্তী পার হলেও
অন্তরে ভীষণ চাপা কষ্ট
স্বাধীনতা বিরোধীদের গাড়ীতে
মুক্তিযুদ্ধের রক্তে রাঙা
জাতীয় পতাকা দেখে।
জীবনের শেষ বেলায়
আমার শুধু একটি প্রশ্ন
স্বাধীনতা তাহলে কি
নষ্ট হয়ে যাবে?

পাথরটি সরাও

ব্রাদার চয়ন ভিক্টর কোড়াইয়া সিএসসি

ইস্টার সানডে শব্দটির অর্থ হচ্ছে পুনরুত্থান রবিবার। কট্টরপন্থী ইহূদীদের সাথে যিশুর মতবিরোধ চরমে উঠলে বিচারে যিশুকে দোষী সাব্যস্থ ক'রে ক্রুশে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং তাকে কবরস্থও করা হয়। যিশুর অনেক শিষ্য থাকা সত্ত্বেও কবরস্থ যিশুকে নিজ টাকায় ক্রয় করা সুগন্ধি তেল লেপন করার জন্য তিনজন মহিলা কবরে আসলো। যদিও তারা জানতো যে কবরটির প্রবেশ পথ পাথর দিয়ে বন্ধ আছে। যিশুর প্রতি তাদের এতো ভালোবাসা ও বিশ্বাস ছিলো যে তারা যিশুর কাছে ছুটে গেলো। বর্তমানে পারস্পরিক এই ভালোবাসার বড়ই অভাব। তাই পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস সিনডাল চার্চ এর ঘোষণা দিয়েছেন, যেখানে থাকবে মিলন, অংশগ্রহণ এবং প্রেরিত হওয়া। অর্থাৎ এই মণ্ডলী গড়ে উঠবে সকলের সহভাগিতায় ও ভালোবাসায়। ছুটে যেতে হবে সকলের কাছে বিশ্বের প্রান্তসীমায় আবার এই কাজে সকলকে অংশগ্রহণও করতে হবে। কিন্তু এই কাজে যে অনেক বাঁধা আসবে তা খুবই নিশ্চিত। তবুও এই পাথরস্বরূপ বাঁধাগুলোকে ভয় পেলে চলবে না। পথ পরিষ্কার করতে হবে, সরাতে হবে পাথর, তা যতোই বড় হোক না কেন।

পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় অংশগ্রহণমূলক মণ্ডলী গড়ার যে প্রয়োজনীতা উপলব্ধি করেছেন তা খুবই সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই মণ্ডলী আমাদেরকে আহ্বান করে ঐক্যবদ্ধভাবে সকলের অংশগ্রহণে প্রেরণ কাজে যোগদান করতে। এখানে ঐশ জনগণ স্থানীয় মণ্ডলীতে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা সহভাগিতা করতে পারবে। এই সিনড্- এর মধ্যদিয়ে পোপ ফ্রান্সিস আমাদেরকে মণ্ডলীর 'মিলন-সমাজ' এর বৈশিষ্ট্য পুনরাবিষ্কার করতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। এই মণ্ডলী হবে এমনই একটি আদর্শ মণ্ডলী যেখানে প্রতিটি স্থানীয় মণ্ডলীকে সহায়তা করা হবে, নির্দেশনা দেওয়া নয়। একাজগুলো অবশ্যই বিশ্বাসীভক্তদের কৃষ্টি ও প্রেক্ষাপট বা বাস্তবতা, তাদের সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতাকে গুরুত্ব ও সম্মান দিয়ে করতে হবে। এখানে থাকবে সহভাগিতা ও তা শ্রবণের খোলাখুলি পরিবেশ। একে-অপরের কথা শ্রবণের এই যাত্রা আমাদেরকে বলে দেবে পবিত্র আত্মার কণ্ঠস্বরকে চিনবার উপায়। কারণ এই যাত্রায় আছে গভীর অনুধ্যান, পারস্পরিক আস্থা, সর্বজনীন বিশ্বাস এবং মহৎ উদ্দেশ্যের সহভাগিতা। লিখিত আকারে প্রকাশিত বিষয়গুলো শুনতে ও দেখতে বেশ সুন্দর ও সহজ মনে হলেও তা বাস্তবায়নে অনেক বাঁধা ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন হতে পারে। মণ্ডলীর সকলকে একই ছাতার নিচে নিয়ে এসে, তাদের মনের কথা শুনে, তাদের সাথে সহমর্মী এবং সহভাগিতার মিলন-সমাজ গড়তে হলে আমাদের সমাজ থেকে পাথরগুলো সরাতে হবে, যাদের জন্য পুনরুত্থিত খ্রিস্টের আলো সবার মাঝে আসতে বাঁধাগ্রস্থ হচ্ছে। কী এমন সব বিষয় যা আমাদের মাঝে ঐক্যবদ্ধ, অংশগ্রহণ এবং প্রেরণ কাজে পাথরের ন্যায় বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে?

বাড়িতে বাড়িতে জমা-জমি নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ, মারা-মারি এগুলো নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজে এমন ঘটনার আমরা অনেকে সাক্ষী আবার অনেকেই এর ভুক্তভুগী। একবারও ভাবি না কতদিন থাকব আমি এই পৃথিবীতে। জমির জায়গায় জমি পড়ে থাকবে কিন্তু আমি চলে যাবো আমার ভাইয়ের মুখ না দেখে। আমি চলে যাবো এক বুক কষ্ট নিয়ে। কিন্তু করে যাবো আমার ঘরের চতুর্দিকে স্বার্থপরতার, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের আর হিংসার এক আবরণ বা দেয়াল তৈরি করে। এমন পরিবেশে সে দেয়াল ভেঙ্গে দিয়ে আমাকে ঐক্যের কথা প্রচার করতে হবে; পারিবারিক, সামাজিক ও মাণ্ডলিক কাজে তাদের পারস্পরিক অংশগ্রহণ করাতে হবে।

বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নের পাশাপাশি অভিবাসন, অন্যায্যতা, শ্রেণি-বিদ্বেষ, সহিংসতা, নির্যাতন এবং মানুষের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসমতাও বেশ চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন পর্যায়ে চাকুরীর ক্ষেত্রে আছে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সুপারিশ ও স্বজনপ্রীতি; অন্যদের ইন্টারভিউতে ডাকা হয় নাম মাত্র। সমাজের নামধারী অনেক ভদ্র-সভ্য মানুষগণ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সেইসকল ব্যক্তিদের চ্যালেঞ্জ বা সংশোধনের পরিবর্তে সব কিছুতে অন্যায়-আপোস করে চলছে। ফলশ্রুতিতে, খ্রিস্টসমাজের প্রকৃত সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিগণ নানাভাবে বঞ্চিত হচ্ছে, অসম্মানিত হচ্ছে, মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ছে আর দূরত্ব নিচ্ছে মাণ্ডলিক কার্যক্রম থেকে। মণ্ডলীর কাজে তারা অংশগ্রহণ করতে চরম অনিহা প্রকাশ করছে। সুতরাং আমাদের অংশগ্রহণকারী মণ্ডলী সুন্দরভাবে পথ চলতে বাঁধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

দুর্বলদের উপর সবলের নির্যাতিত, ক্ষমতার অপব্যবহার, আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলোতে নিজ স্বার্থে যুবাদের অপব্যবহার, যৌন হয়রানি, অবৈধ সম্পর্ক বা পরকীয়া, ক্ষমতার লোভে অর্থ, মদ, নারী, বাড়ি অবকাশ এর ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়গুলো আমাদের খ্রিস্টসমাজে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। তাছাড়া কিছুসংখ্যক যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীদের বিবেক বিরুদ্ধ কাজসহ আরও নানা সমস্যা। অনেক সময় আমরা এই সমস্যাগুলো এড়িয়ে যাই। কিন্তু মনে রাখতে হবে একজন ব্যক্তির সমস্যা আমাদের সকলেরই সমস্যা। তাই মণ্ডলীকে নবীকৃত করতে চাইলে অবশ্যই মণ্ডলীর এই ছোট বড় পাথরগুলো দূর করতে হবে। পোপ ফ্রান্সিস ঐশ-জনগণকে আরোগ্যদানে মণ্ডলীর প্রচেষ্টায় অবদান রাখার জন্য সরাসরি আমন্ত্রণ জানান। তিনি বলেন, "দীক্ষাস্নাত জনমণ্ডলীর প্রত্যেকের মাণ্ডলিক ও সামাজিক পরিবর্তনসমূহে যুক্ত থাকার উপলব্ধি থাকা উচিৎ; এটা ভীষণভাবে আমাদের দরকার।" এই পরিবর্তন আমাদেরকে ব্যক্তিগত ও দলগত মন পরিবর্তনের জন্যও আমন্ত্রণ জানায়। বিশ্বাস করি আমাদের মাঝে মনুষ্যত্ব স্থান পাবে আর পাথরগুলো দূর হবে।

আমাদের প্রায়ই সুযোগ হয়, প্রতিবন্ধী ভাই-বোন, শরণার্থী, অভিবাসী, পথশিশু, অসহায় নারী, প্রবীণ ও দরিদ্র জনগণের পাশে দাঁড়ানোর। বিপদের দিনে তাদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ। অনেকেই আমরা পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ নিই, সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করি আবার অনেকে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এড়িয়ে চলি। এমনকি অমানবীয় আচরণ করি তাদের দূরে সরিয়ে দেই। নানা কটূ কথাও শোনা যায়, যেমন "তোমাদের জন্য কি আমি টাকার গাছ লাগিয়েছি।" অথচ অনেক পরিবার ও আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রয়োজনের চেয়েও কত বেশি অর্থ ব্যয় বা অপচয় করছে। তাছাড়া টাকা ছাড়াও নানাভাবে মানুষের পাশে দাঁড়ানো যায়। অনেকে নিরুপায় হয়ে আসে শুধু মনের কষ্টের কথাগুলো সহভাগিতা করার জন্য কিন্তু সেই সময়টুকু আমাদের হয়ে উঠে না। অথচ গল্পগুজব করে, টেলিভিশন দেখে, মোবাইল ফোনের মধ্যদিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ডুবে থেকে আমরা কত সময় অপচয় করছি। তাহলে কিভাবে গড়ে উঠবে আমাদের সহভাগিতা, সহযোগিতার খ্রিস্টীয় 'মিলন-সমাজ'? সুতরাং এই পাথরগুলোও এড়িয়ে না গিয়ে আমাদের সরাতে হবে।

এটা শুধুমাত্র অন্যের বিষয়ে খাতা-কলম নিয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের যান্ত্রিক কাজ নয়। সহভাগিতামূলক সভার একান্ত আলোচনায় আমরা অন্যের অবস্থা বিচার-বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করবো, সুচিন্তিতভাবে তাদের প্রয়োজন বিশ্লেষণ করবো। কিন্তু এটাই সত্যি যে বর্তমানে আমাদের সংঘ সমিতিগুলোর যখন নির্বাচনের সময় বিচিত্র চিত্র দেখা যায়, নানামত শোনা যায়। নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে থাকে নানা সন্দেহ, মতবাদ আর ভুল বোঝাবুঝি।

ফলে দেখা যায় গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় এমনকি বাড়িতে বাড়িতে দলীয়করণের দলাদলি। *এফেসীয় ৪:২৮* আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে বলছেন "চুরি করা যার স্বভাব, সে যেন আর চুরি না করে; সে বরং কাজ করুক, নিজের দু'টো হাত দিয়ে সে বরং ভালো কিছুই করুক।" এভাবে না চলতে পারলে এর চরম প্রভাব পড়বে/পড়ছে আমাদের কোমলমতি শিশুদের ও উঠতি বয়সের যুবাদের। আবার কিছু ব্যক্তিবর্গ আছেন যারা দেশে বা প্রবাসে থেকে অনেক কষ্ট পান আর ভালো কিছু করার আশায় নিজেদের সামাজিক কাজে যুক্ত করেন। কিন্তু ফলাফল শূন্য। এখানে আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আরও সচেতন ও উদার মনের হতে হবে। ভালো মনোভাব নিয়ে সমাজের ও মণ্ডলীর কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় আমরা নিজেরাই একদিন খ্রিস্টান বলে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করবো। অনেক সময় দেখা যায় সমাজের একশ্রেণির লোক যারা যুবাদের নানাভাবে প্রলোভিত করে অন্যায় ও পাপের পথ খুলে দেয়। বিভিন্ন নেশা ও অর্থ দিয়ে তাদেরকে নিজের দলে টেনে রাখতে চায়। আবার আরেক দল লোক 'আমিও জিতি, তুমিও জিতো সূত্র গ্রহণ ক'রে এইধরনের কাজগুলো করতে পরোক্ষভাবে সমর্থন করছেন।

আমরা এই ভুলগুলো করার কিছু অন্যতম কারণ হচ্ছে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও শক্তিতে পরিচালিত না হয়ে নিজ ইচ্ছায় ও শক্তিতে পারচালিত হওয়ার প্রলোভন। নিজেকে নিয়ে সবসময় ভাবা। একই সাথে ঈশ্বরের কাছে সার্বিক বিষয় তুলে না ধরে সবসময় নিজের অবস্থা, পরিস্থিতি, চিন্তাভাবনা ও সমসাময়িক প্রয়োজন তুলে ধরার প্রলোভন। মণ্ডলী ও সমাজে বেশিরভাগ সময় বিভিন্ন পর্যায়ের কাঠামোগত বিষয় তুলে ধরা হয়। অর্থাৎ শুধু কাগজে কলমে সেবাকাজ। কিন্তু বাস্তবে এর ফলাফল খুবই সামান্য। আবার কেউ কেউ আছে যারা সবসময় নিজেদের উপস্থাপন করতে চায়। সকল স্থানে তাদের কথা বলতে দিতে হবে এবং সামনের সারিতে রাখতে হবে। তাদের জন্য অনেক সময় নতুন নেতৃত্ব তৈরি হচ্ছে না। তাদেরকেও জানতে হবে একজন ভালো নেতা আরো অনেক নতুন নতুন নেতার জন্ম দেয় এবং নতুনদের জন্য জায়গা ছেড়ে দেন। একই ব্যক্তির কথা সবসময় শুনতে মানুষ বিঘ্ন পায়।

আমরা ব্রতধারী-ব্রতধারিণীগণ ও যাজকগণ অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলে থাকি। মানুষের জন্য অনেক সুন্দর বাণী রাখি। কিন্তু আমাদের মাঝে কতজন আছি যারা সত্যিকারভাবে পবিত্র ও সুন্দর মনে সেভাবে জীবন-যাপন করি। পুণ্য পিতা পোপ যখন বাংলাদেশে এসেছিলেন, তখন তিনি বার বার বলেছেন আমরা যেন পরচর্চা না করি। কিন্তু দেখা যায় আমাদের মধ্যে অনেক হিংসা ও দলাদলি কাজ করে। সুন্দর চিন্তা ও মন নিয়ে একত্রে ভালো কাজ করার মধ্যে একটি স্পষ্ট ছাপ দেখা যায়। এই বঙ্গে যখন মিশনারীগণ এসেছেন তখন তারা অনেক পরিশ্রম করেছেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে আরাম-আয়েশের ও ক্ষমতা ধরে রাখার মনোভাব বেশ লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া প্রান্তিক এলাকায় না গিয়ে নিজেদের পছন্দের জায়গায় পছন্দের ও সম্মানের কাজগুলোতে খুব সাচ্ছন্দ বোধ করি। তাহলে সিনডাল চার্চ হিসেবে কোথায় কিভাবে কাদের কাছে আমরা প্রেরিত হচ্ছি?

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোন বা লেপটপ খুবই প্রয়োজনীয় বিষয়। বিশেষ করে মোবাইল ফোন শিক্ষার্থী তথা যুবাদরে জন্য একদিকে যেমন আশীর্বাদ অন্যদিকে এর অনিয়ন্ত্রিত ও অপব্যবহার নিয়ে আসছে অভিশাপ। মাদকাসক্তের মতো যুবারাও মোবাইল ও ইন্টারনেট আসক্ত হয়ে যাচ্ছে ফলে তাদের স্বপ্নপূরণের পথে অনেক পিছিয়ে পড়ছে। তাই অভিভাবকদের তথা স্কুলের প্রধান ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সচেতন ভাবে শিক্ষার্থীদের শিখাতে হবে মোবাইল বা ইন্টারনেট এর শুভ ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার। অন্যদিকে মদ্যপান বা নেশাগ্রহণ আমাদের খ্রিস্টীয় সমাজের এক বড় ব্যাধি। মদ্যপান ছাড়া আজ কোন সমাজে কিংবা প্রতিষ্ঠানে কোন সামাজিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় কিনা আমার জানা নেই। খ্রিস্টীয় সমাজের অধপতনের দিকে ধাবিত হওয়ার বা উঠে দাঁড়াতে না পাড়ার বড় একটা কারণ হলো এই মদ্যপান যা বড় পাথর বা বোঝার তুল্য। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, নারী-পুরুষ, শিক্ষার্থী, যুবা, বয়স্ক, বৃদ্ধ, ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ সবাই এর জালে আটকা পড়ে আছে। কে বা কারা পরিত্রাতা হয়ে আমাদের এ জাল থেকে মুক্ত করবে বা সমাজ থেকে এই পাথর সরাবে আমার জানা নাই। তবে আমি আশাবাদী এই পাথর একদিন সরবেই।

কত ভালোবাসা ছিলো সেই কয়েকজন নারীর হৃদয়ে যারা যিশুর মৃত দেহে সুগন্ধি মাখতে কবরে এসেছিলো। হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা থাকলেই সকল বাঁধা অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে চলা ও ভালো কাজ করা সম্ভব। আমরা কোন কাজ শুরু করলে কেউ না কেউ সেই পাথর সরিয়ে দেয়; কোন না কোনভাবে আমাদের সামনের পাথর সরে যায়। তবে তার জন্য প্রয়োজন বিশ্বাস ও ভালোবাসা। আমাদের জীবনেও এ ধরনের অনেক পাথর সমতুল্য বাঁধা আসতে পারে। কিন্তু আমরা যদি সকলে হাত গুটিয়ে বসে থাকি তাহলে একটি পাথর আরও অনেক পাথরের জন্ম দিবে; তাতে আমাদের বাঁধা আরও বৃদ্ধি পাবে। আমাদের নিশ্চয় মনে আছে ইস্রায়েল জাতি যখন মিশর দেশ থেকে লোহিত সাগর পার হওয়ার জন্য কাছে আসলো তারা দেখতে পেলো পাহাড় সমান জল। কিন্তু তারা তা দেখে থেমে থাকেননি। তারা মোশীর সহায়তায় লোহিত সাগর পার হলো। অর্থাৎ, আমাদেরকে পথে নামতে হবে। পাথর দেখে ভয় পেলে চলবে না। এই পাথর যিশুর সময়ও ছিলো কিন্তু কেউ যিশুকে থামাতে পারেনি। তাইতো আমরা পেয়েছি সেই গৌরবময় ক্রুশ, যে ক্রুশ আমাদের দিয়েছে মুক্তি।

আমি আর আপনি কী আমাদের অর্থ ও সময় ব্যয় করে বাইবেলে বর্ণিত সেই সামারীয়র মত অসুস্থ বা পতিত হওয়া বিশ্বাসীদের গায়ে তেল লেপন করতে প্রস্তুত? মণ্ডলীর জন্য কাজ করতে, তাতে অংশগ্রহণ করতে ও তাদের পাশে দাঁড়াতে ইচ্ছুক? তারা গরীব, কালো, অশিক্ষিত, ময়লা বলে অপছন্দ করবো বা দূরে ঠেলে দিবো? পক্ষান্তরে, যারা মানুষ ঠকিয়ে অন্যায় পথে অর্থ-সম্পদ গড়েছে ও সম্মান কুড়িয়েছে তাদের গুরুত্ব দিবো? হ্যাঁ প্রভু যিশু বলেছেন পাপকে ঘৃণা করতে পাপীকে নয়। কিন্তু পাপীকে তো পাপের পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে; তাদের সাথে মিশে গেলে আমার আর নিজস্ব বলে কিছুই রইলো না! এই পুনরুত্থান পর্বে আমাদের এই ব্যক্তিগত ও সামাজিক ভুল বা সীমাবদ্ধতাগুলো যিশুর কবরে এক বড় পাথর হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের আলো আমাদের অন্তরে আসাতে বাঁধাগ্রস্থ হচ্ছে। হ্যাঁ এটা সত্য যে যিশু তাঁর সূর্যের আলো ও বৃষ্টিধারা সকলের উপরই নিয়ে আসেন। কিন্তু আমরা যদি তাঁর কাজে বাঁধা হয়ে দাঁড়াই তাহলে তিনি নিশ্চয় খুশি হবেন না। তাই সমাজ থেকে, মণ্ডলী থেকে এই সকল পাথর সরাতে হবে। এর জন্য আমাদের সকলকে একত্রে কাজ করতে হবে। অন্যথায় এই অন্ধকারময় রাজ্যের মন্দআত্মা শহর থেকে গ্রামে ও প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়ে সহজ সরল মানুষকে কুলোষিত করবে।

যোহন ১৭:২১ পদে বলা হয়েছে, "আমি চাই সকলেই যেন এক হয়ে ওঠে! পিতা তুমি যেমন আমার মধ্যে আছে আর আমি রয়েছি তোমারই মধ্যে, তারাও যেন তেমনি আমাদেরই মধ্যে থাকে, তেমনি এক হয়েই থাকে।" তাই আসুন আমরা সবাই পুনরুত্থিত খ্রিস্টের আলোয় আলোকিত হই এবং মিলন, অংশগ্রহণ এবং প্রেরিত হওয়া সুন্দর একটি সিনডাল চার্চ গড়ে তুলি। *এফেসীয় ৪:২৯* "তোমার মুখ যেন তেমন কথাই বলে যা মানুষের জন্য গঠনমূলক হয়, তাদের জন্য যেন উপকার হয়।" আমাদের সময় এসেছে উঠে দাঁড়াবার। আমাদের সকলকে বিশেষভাবে মণ্ডলী ও সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সুন্দর মন নিয়ে গঠনমূলক কাজে অংশ নিতে হবে। আমরা প্রত্যেকে যেন একজন বাইবেল হয়ে উঠি, তাহলে আমরা সকলকে আমাদের সাথে যুক্ত রাখতে পারবো। যেমনি *যোহন ১৫:৪* পদে বলা হয়েছে "আমি যেমন তোমাদের মধ্যে রয়েছি, তেমনি তোমরাও আমাদের মধ্যে থাক। আঙুর-গাছের সঙ্গে যুক্ত না থাকলে শাখা যেমন নিজে থেকে ফল দিতে পারে না, তেমনি আমার সঙ্গে সংযুক্ত না থাকলে তোমরাও ফলশালী হতে পার না। তাই আমরা যারা গাছের ভূমিকায় আছি তারা যেন রসালো ও পুষ্টি যুক্ত হই॥ ❑

লেখক: পরিচালক, পবিত্র ক্রুশ প্রার্থি গৃহ, নারিন্দা

মুজিব নগরে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের শপথ গ্রহণ

রুবী ইমেল্ডা গমেজ

পটভূমিঃ

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে 'দ্বিজাতি তত্ত্বের' ভিত্তিতে ভারত বিভক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান ছিল একটি অদ্ভূত রাষ্ট্র। এক হাজারেরও অধিক মাইল দূরত্বে মধ্যখানে ভারতীয় ভূখণ্ড দ্বারা বিভক্ত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান নামে দু'টি অংশ নিয়ে গঠিত ছিল এ রাষ্ট্র। জনসংখ্যার দিক দিয়ে এ রাষ্ট্রে বাঙালিরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ (শতকরা ৫৬ ভাগ)। দু'অংশের মধ্যে জলবায়ু, সমাজকাঠামো, উৎপাদন ব্যবস্থা, জনগণের ভাষা সংস্কৃতি, ইতিহাস ঐতিহ্য, পোশাক পরিচ্ছদ, খাদ্যাভাস ইত্যাদি কোন কিছুতেই মিল ছিল না। গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি, ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এবং সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের দৌরাত্ম্য ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য।

শুরুতেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক উত্তর ভারত থেকে আগত মোহাজেব ও পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু ভাষা-ভাষী রাজনৈতিক নেতৃত্বের হাতে চলে যায়। ১৯৪৭-১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ সময়ে পাকিস্তানের ৮ জন প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে একমাত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছাড়া আর সবাই ছিলেন অবাঙালি স্বার্থের প্রতিনিধি। ৪ জন রাষ্ট্র প্রধানের সকলেই ছিলেন অবাঙালি ও উর্দুভাষী। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পূর্ব বাংলার গর্ভণরদের অবস্থাও ছিল তদ্রুপ।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রভাষা, নতুন রাষ্ট্রের রাজধানী, দেশরক্ষা বাহিনীর সদর দপ্তর এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় কার্যালয় দেশের পশ্চিম অংশে স্থাপন করে।

পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের জনগণ তাদের ন্যায্য অধিকার ভোগ করবে, এ চুক্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী প্রাপ্য ন্যায্য অধিকার থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বঞ্চিত করে রাখে। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করে আসছিল। প্রশাসনিক বঞ্চণা পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নকে ব্যাপকভাবে ব্যাহত

করে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রতি কেন্দ্রের উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়।

বৈদেশিক সাহায্যের সিংহভাগ ব্যয় করা হত পশ্চিম পাকিস্তানে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা, চিকিৎসা, পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন, কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়ন চরম ভাবে ব্যাহত হয়। মুদ্রা ও অর্থনীতি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকায় অতি সহজেই পূর্ব পাকিস্তানের আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের সকল কেন্দ্রীয় অফিস, দেশরক্ষা সদর দপ্তর ও শিক্ষায়তন, স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান, পাকিস্তানের শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনসমূহ, পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ন্যাশন্যাল ব্যাংক, বীমা, অন্যান্য প্রায় সকল ব্যাংক, আন্তর্জাতিক সংস্থা, সকল সরকারী ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানাদির কেন্দ্রীয় অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে থাকায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সব সময়ই পূর্ব পাকিস্তানীদেরকে বঞ্চিত করে রাখা হয়। এতো শোষণ নিষ্পেষনের পরও পূর্ব পাকিস্তান কখনও আলাদা হবার কিংবা সশস্ত্র বিপ্লবের কথা বলেনি। তাদের দাবি ছিল শুধুমাত্র স্বায়ত্তশাসন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুবিচার।

পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকচক্র কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের প্রতি চরম ঔদাসীন্য, বঞ্চনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ না দেওয়ায় বাঙালিরা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে এবং ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটের সূচনা হয় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রাদেশিক নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের দ্বিতীয় সংবিধান রচনা ও এর প্রতিক্রিয়া, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ছাত্র আন্দোলন, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ঐতিহাসিক ছয় দফা, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের গণঅভ্যুত্থান ও ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচন।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর বহুদিনের প্রতিক্ষিত পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ ৬ দফারভিত্তিতে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে এবং পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে জয়ী হয়ে ৩১৩টি আসনবিশিষ্ট পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক আইন পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮৮টি আসন লাভ করে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে বাঙালিরা প্রথমবারের মত আত্মপ্রতিষ্ঠার ও স্বায়ওশাসনের সুযোগ লাভ করে।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় পশ্চিম পাকিস্তান নেতাদের শঙ্কিত করে তোলে এবং তারা গণরায়কে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে ওঠে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বুঝতে পেরেছিলেন যে, পাকিস্তান সরকার কোনভাবেই পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিবে না। যে কোন সময়ে তারা সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করবে তারই প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাই ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বিকেল ৩ টায় এক বিশাল জনসভায় স্বাধীনতার ডাক দিয়ে ঘোষণা করেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির

উইলিয়াম কেরী ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
William Carey International School

Cambridge Assessment International Education
Cambridge International School

(An Exclusive English Medium School)
Govt. Reg. No. 23/English (EIIN: 903421)

(Play Group to O' Level)

Our Facilities:

- ► Air Conditioned Classrooms.
- ► Secured with CCTV Camera.
- ► Use of modern teaching methodology, Computer, Multimedia, Internet etc.
- ► Arrangement of indoor and outdoor games.
- ► Special Care for slow learners.
- ► Extra Curricular Activities.
- ► Standby Power Supply.
- ► Limited Seats.
- ► School Bus Available.

You are welcome to visit the school Campus along with your kids

Admission going on
(Play Group to O' Level)
Session:
July 2022-June 2023

Main Campus:
Bangladesh Baptist Church, 70-D/1, Indira Road, (West Razabazar)
Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Website: www.wcischool.org
Contact Number: +88 02 222246708, 01989283257

Train up a child in the way he should go, and when be is old he will not depart it.- Proverbs 22:6

উইলিয়াম কেরী ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
William Carey International School

Cambridge Assessment International Education
Cambridge International School

(An Exclusive English Medium School)
Govt. Reg. No. 23/English (EIIN: 903421)

Our Facilities

- Air Conditioned Classrooms.
- Secured With CCTV Camera.
- Use of Modern Teaching Methodology,
- Computer, Multimedia, Internet etc.
- Special Care For Slow Learners.
- Extra Curricular Activities.
- Standby Power Supply.
- Limited Seats.
- School Vehicle Available.

You are welcome to visit the school Campus along with your kids

Admission going on
July 2022-June 2023
Play-Std-VII

Savar Campus

Savar Campus: YMCA International Building
B-2 Jaleswar, Near Radio Colony Bus Stand, Savar, Dhaka
Cell: 01709-127850, 01709-091205

Train up a child in the way he should go, and when be is old he will not depart it.- Proverbs 22:6

ঢাকা ক্রেডিট মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস

১। নির্ধারিত ফরম (Information Update Form for Online Services) পূরণ করে আপনার মোবাইল ও ই-মেইল নম্বর নিবন্ধন করুন।

২। Google Play Store থেকে Dhaka Credit App টি Install করুন।

৩। MFS সেবার জন্য Home Screen এর MFS Option এর Sign Up এ Click করুন।

৪। নিবন্ধিত মোবাইল নম্বরটি লিখে Verify এ Click করুন। মোবাইল নম্বরে একটি OTP যাবে।

৫। OTP টি লিখে Verify এ Click করুন।

৬। I agree to all the Terms and Condition এ টিক (V) দিয়ে Accept এ Click করুন।

৭। Sign Up Option এ E-mail, Password, Confirm Password লিখুন। নীচের Check Box এ টিক (V) দিয়ে Submit এ Click করলেই নিবন্ধন সম্পন্ন হবে।

৮। এরপরে Log In-এ প্রদত্ত E-mail ও Password দিয়ে Log In করুন।

ঢাকা ক্রেডিট এ্যাপ থেকে পাওয়া যাবে ইনস্ট্যান্ট লোন

" বদলে গেছে দিনকাল, ঢাকা ক্রেডিটে সবই এখন ডিজিটাল "

এই ঋণ জরুরি আর্থিক প্রয়োজন মেটাবে।

ঋণের আবেদন করে তাৎক্ষণিক ঋণ পাওয়া যাবে।

একটি ঋণ পরিশোধের পর প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে আরেকটি ঋণ নেয়া যাবে।

প্রয়োজন হবে না কোনো জামিন।

প্রথম ঋণ নেওয়া যাবে ৫,০০০/- টাকা এবং ৯০ দিনের মেয়াদে ঋণ ফেরত দিতে হবে।

বিস্তারিত জানতে
01709815400

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা

২৫তম বিবাহ বার্ষিকী

জেমস্ ও সুইটি গমেজ (আদি)
বিবাহ: ১৮ এপ্রিল ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ

আমাদের বিবাহিত জীবনের ২৫তম বার্ষিকীতে সৃষ্টিকর্তাকে তার সমস্ত কৃপা ও আশীর্বাদের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে আশীর্বাদ যাচ্না করছি।

সকলের প্রতি রইল ইস্টারের প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা।

জেমস্ ও সুইটি গমেজ (আদি)
সন্তানগণ:
এলিজাবেথ মনিকা ও খ্রীষ্টফার গমেজ (আদি)
Bayonne, New Jersey, USA
আদির বাড়ী
ছোটগোল্লা, গোল্লা মিশন।

CARITAS DEVELOPMENT INSTITUTE (CDI) 1983

'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী' এর সকল পাঠক/পাঠিকাবৃন্দকে

পাস্কাপর্ব উপলক্ষে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট বিশ্বাস করে

মানুষের সার্বিক উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও
নারী পুরুষের সমতাভিত্তিক ক্ষমতায়ন একটি সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থার পূর্বশর্ত।

আমরা সম্পূর্ণ আবাসিক ও সর্বাধুনিক ভেন্যুতে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করে থাকি। আমাদের সঙ্গে আছেন দেশি-বিদেশি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একদল অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক, যারা সার্বক্ষণিক কারিতাস ও সমমনা প্রতিষ্ঠান সমূহের সক্ষমতা অর্জনে দীর্ঘ সময় ধরে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে আসছে। আমাদের মেধাবী গবেষকদল অব্যাহতভাবে দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের বেইজ লাইন সার্ভে, প্রকল্প মূল্যায়ন, প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি, এ্যাকশন রিসার্চ, ইমপ্যাক্ট স্টাডিসহ যে কোনো সামাজিক গবেষণাসমূহ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করে আস্থা অর্জন করেছে।

পরিচালক ও সকল কর্মীবৃন্দ
কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট
২ আউটার সার্কুলার রোড, শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭
ফোন: ৯৩৩৯৬২৫, ইমেইল- cdi@caritascdi.org
www.caritascdi.org

মহান খ্রিস্টের গৌরবময় পুনরুত্থান উপলক্ষে
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী-এর পাঠক-পাঠিকাসহ সকলকে

কারিতাস জানাচ্ছে
আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

- কারিতাস অর্থ "দয়ার কাজ" বা "সর্বজনীন ভালবাসা"।
- কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার আলোকে কারিতাস বাংলাদেশ এমন একটি সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্ন লালন করে, যে সমাজ মুক্তি ও ন্যায্যতা, শান্তি ও ক্ষমাশীলতার মূল্যবোধসমূহকে ধারণ করে এবং সবাই মিলে পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্মানের সাথে মিলন সমাজে বসবাস করে।
- কারিতাস বাংলাদেশ মানুষের সহযোগী হতে চায়; বিশেষতঃ সেইসব মানুষের – যারা সমাজে গরীব ও প্রান্তিক জীবনাবস্থায় আছে। সবার প্রতি সম-মর্যাদার দ্বারা কারিতাস এমন একটি সমন্বিত উন্নয়ন অর্জন করতে প্রয়াসী যার লক্ষ্য হলো: মানব-মর্যাদা নিয়ে মানুষ সত্যিকার মানুষের মতো জীবন-যাপন করবে এবং অপরকে দায়িত্বশীলতার সাথে সেবা করবে।
- জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কারিতাস সকল মানুষের সাথে কাজ করে।

কারিতাস বাংলাদেশ
২ আউটার সার্কুলার রোড
শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭

বিজ্ঞ/২০৩/২০২২

বিশেষ কৃতিত্ব

রোজমেরী তন্বী গমেজ

অতি আনন্দ ও গর্বের সাথে জানাচ্ছি যে, **রোজমেরী তন্বী গমেজ** সেন্ট ইউফ্রেজীস্ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় এন্ড কলেজ থেকে ২০২১ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে গোল্ডেন জিপিএ-৫ (বৃত্তিপ্রাপ্ত) অর্জন করেছে। উল্লেখ্য যে, সে পিএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ ও জেএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ (বৃত্তিপ্রাপ্ত) পেয়ে সাফল্য অর্জন করেছে। পরম করুণাময় ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। রোজমেরী হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর ইমামনগর গ্রামের সরদার বাড়ির ইগ্নেসিয়াস তপন ও মারীয়া পল্লবী গমেজের বড় মেয়ে। বর্তমানে হাসনাবাদ গ্রামে বদন মিস্ত্রি বাড়িতে বসবাসরত।

রোজমেরী বাংলাদেশের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং স্বনামধন্য হলিক্রস কলেজে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে অধ্যয়নরত। আমাদের মেয়ে যেন একজন ভাল ও সৎ মানুষ হিসাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে এইভাবে সফলতা অর্জন করতে পারে। ঈশ্বরের আশীর্বাদ তার উপর বর্ষিত হোক। আপনাদের সকলের নিকট তার জন্য প্রার্থনা ও আশীর্বাদ একান্ত কাম্য।

শুভকামনায়

ছোট বোন: গ্রেস প্রজ্ঞা গমেজ ও

পরিবারবর্গ

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ

আর্চবিশপ মাইকেল ভবন, ১১৬/১, মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।

কার্যকরী পরিষদ (২০২২-২০২৫)

ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য-সদস্যাবৃন্দ

আগষ্টিন পিউরীফিকেশন
চেয়ারম্যান

অপূর্ব যাকোব রোজারিও
ভাইস- চেয়ারম্যান

ইমানুয়েল বাপ্পী মন্ডল
সেক্রেটারি

বাদল বি. সিমসাং
পরিচালক, অর্থ ও প্রশাসন

ইউজিন কোড়াইয়া
ট্রেজারার

কল্পনা মারিয়া কস্তা
পরিচালক

উজ্জ্বল ফ্রান্সিস রিবেরু
পরিচালক

সুজয় পিউরীফিকেশন
পরিচালক

জেমস ডি' রোজারিও
পরিচালক

প্রদীপ আগষ্টিন গমেজ
পরিচালক

আগষ্টিন প্রতাপ গমেজ
পরিচালক

ডেভিড প্রবীন রোজারিও
পরিচালক

ঋণদান কমিটি

তরুণ ভিক্টর গমেজ
চেয়ারম্যান

লিংকার্ন রোজারিও
সেক্রেটারি

শুভ রঞ্জন চিসিম
সদস্য

সনি খ্রীষ্টফার পেরেরা
সদস্য

চিউক পি. রোজারিও
সদস্য

আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ কমিটি

রতন হিউবার্ট পিউরীফিকেশন
চেয়ারম্যান

জন গমেজ
সেক্রেটারি

মায়া মনিকা গাঙ্গুলী
সদস্য

জাস্টিনা বিশ্বাস
সদস্য

ডন ক্লারেন্স হাওলাদার
সদস্য

শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রয়াত মাইকেল পেরেরা
জন্ম : ৯ এপ্রিল, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২২ এপ্রিল, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : চড়াখোলা (ফকিরবাড়ি)
তুমিলিয়া ধর্মপল্লী, গাজীপুর।

প্রয়াত আশালতা পালমা
জন্ম : ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২০ জানুয়ারি, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : চড়াখোলা (ফকিরবাড়ি)
তুমিলিয়া ধর্মপল্লী, গাজীপুর।

শাশ্বত মুক্তি লাভের আশায় বাবা-মা তোমরা এই নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করেছ। আমরা বিশ্বাস করি পরম পিতার কোলে মহাশান্তিতে আছ। ব্যথিত হৃদয় আজো তোমাদের খুঁজে ফেরে, তোমাদের উপস্থিতি আজও আমরা উপলব্ধি করি। অনেক ভালবাসার জালে আমাদের জড়িয়ে গেলে। তাই তোমাদের স্মৃতি আজও বহন করে চলছি। তোমাদের সেই সরলতা, নির্মল হাসি, স্বল্পভাষি, কঠোর শ্রম, পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীলতা আমাদের প্রতিটা মুহূর্তে তোমাদের কথা মনে করিয়ে দেয়। নয়জন সন্তানকে অতি কষ্টে মানুষ করেছিলে তোমাদের ভালবাসা দিয়ে। তাই তোমাদের জীবনের মধ্যদিয়ে আমরা ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ। তোমাদের সন্তানেরা, মেয়ে জামাই, নাতী-নাতনীরা একসাথে বাড়িতে আসলে, একসাথে খাওয়া-দাওয়া করলে সবচেয়ে খুশি হতে তোমরা। তোমাদের সেই ইচ্ছা আমরা পালন করতে চেষ্টা করে চলেছি। স্বর্গ থেকে তোমরা আমাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ কর আমরা যেন সর্বদা তোমাদের আদর্শে সবার সাথে মিলেমিশে আনন্দে ও ভালবাসায় জীবন-যাপন করতে পারি। ঈশ্বর তোমাদেরকে তাঁরই কোলে অনন্তকালের জন্য স্থান দিন এই আমাদের আকুল প্রার্থনা।

বাবা-মা'র মৃত্যুকালে যারা প্রার্থনা করেছেন, বিশেষ করে ফাদারগণ বাবা-মা'র আত্মার কল্যাণে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে,

ছেলেরা, মেয়েরা, ছেলে বউয়েরা, মেয়ে জামাইরা

নাতী ও নাতী বউ : মারভিন- রোজী, জ্যাকসন, জয় দীপ, হৃদয়, রত্ন, স্বারক, অর্ক, অগ্নি

নাতনী ও নাত জামাই : সুমি-প্রদীপ, মৌসুমি-কল্যাণ, জ্যাকলিন, মৌরী-দীপু, সিঁথি, জেসি, স্বর্ণা, হৃদি, প্রাপ্তি, গ্লোরিয়া ও হৃদিতা।

বিজ্ঞ/১০৮/২০২২

প্রেমাদের স্মরি

সুপ্রিয়ান রোজারিও

সিলভেস্টার রোজারিও

জ্যাঙ্গেল রোজারিও

ডানিয়েল কুলেন্তনু

টাইনি রোজারিও

রেখা রোজারিও

উষা রাণী পালমা

"সত্যনিষ্ঠা বিনম্রতার আদর্শ করে দান
আত্মত্যাগের পরম ব্রতে হল তারা মহীয়ান
ভালবাসার প্রতীক হয়ে রইল অনুক্ষণ।"

ঈশ্বরের অসীম দয়ায় ও ভালবাসায় তোমরা এ পার্থিব জগৎ থেকে স্বর্গের অনন্ত সুখ লাভ করেছ। তোমরা আজও আছ আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায়। স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ কর যেন আমরা আদর্শ জীবন-যাপন করতে পারি এবং তোমাদের সাথে মিলিত হতে পারি।

শোকার্ত চিত্তে

তোমাদেরই সংসার পরিজন

করান, নাগরী ধর্মপল্লী।

বিজ্ঞ/১০২/২০২২

সংগ্রাম; এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা।" তিনি আরো বলেন, "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।" তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, "ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল, আমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।" তিনি বাঙালি জাতিকে শত্রুর মোকাবিলা করার নির্দেশ দেন।

এদিকে পাকিস্তান সরকার সকল প্রকার প্রস্তুতিপর্ব শেষ করে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ রাত সাড়ে এগার টায় ঢাকায় গণহত্যা শুরু করে। রাত দেড়টায় পাক বাহিনী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর ধানমন্ডির বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে এবং পরে তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। গ্রেফতারের পূর্বে ২৫ মার্চ দিবাগত রাত অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিক ভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এই ঘোষণা টেলিগ্রাম, টেলিপ্রিন্টার ও তৎকালীন ইপিআর এর ওয়ারলসের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও এই ঘোষণা প্রচারিত হয়।

বাংলাদেশ সরকারের প্রথম মন্ত্রীসভাঃ

২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হওয়ার পর পাক হানাদার বাহিনীর ভয়ে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত অধিকাংশ সদস্য ভারতে আশ্রয় নেন। তাঁদের উদ্যোগে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ ১০ এপ্রিল আগরতলায় বাংলাদেশ সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ১১ এপ্রিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে তাজউদ্দীন আহমদ এ নতুন মন্ত্রীসভার কথা ঘোষণা করেন। এ সরকারের সর্বসম্মতিক্রমে শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করা হয়। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে এ সরকারের উপ-রাষ্ট্রপতি করা হয়। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁর ওপর রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। বিপ্লবী সরকারের অন্যান্য দপ্তর বন্টন করা হয় এইভাবে:

প্রধানমন্ত্রী- তাজউদ্দিন আহমদ; পররাষ্ট্র দপ্তর - খন্দকার মোশতাক আহমদ; স্বরাষ্ট্র দপ্তর - এএইচএম কামরুজজামান; অর্থ দপ্তর - ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দান ও স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থনের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পত্র প্রেরণ করা হয়।

অস্থায়ী সরকারের শপথ গ্রহণঃ

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলার আম বাগানে (পরবর্তীকালে মুজিবনগর নামে খ্যাত) নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিবৃন্দ, দেশী-বিদেশী সাংবাদিক, বিপুল সংখ্যক স্থানীয় জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতিতে ঐ অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে ও আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যভার গ্রহণ করে। এ অনুষ্ঠানে জাতীয় পরিষদ সদস্য অধ্যাপক এম ইউসুফ আলী স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। বাঙালির জাতীয় ইতিহাসে এ ছিল একটি ঐতিহাসিক মুর্হূত। মুজিবনগর সরকারের স্বাধীনতা সনদ ২৬ মার্চ থেকে কার্যকরী বলে পরিগণিত হয় এবং এ মুজিবনগর সরকারের অধীনেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। মুজিবনগরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপাতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামরুজ্জামানকে মন্ত্রী করে গঠিত বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহন করে। শুরু হয় দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের মঞ্চ তৈরীঃ

নটরডেম কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ভবেরপাড়া গ্রামনিবাসী প্রত্যক্ষদর্শী ষ্টিফেন পিন্টু বিশ্বাস এক নিভৃত সাক্ষাৎকারে বলেন, ৭ মার্চ ঢাকার রেইস কোর্স ময়দানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের পর দেশব্যাপী গণআন্দোলন শুরু হলে আমাদের কলেজ বন্ধ ঘোষণা করে। আমি তখন আমাদের বাড়ি মেহেরপুরের ভবেরপাড়া গ্রামে চলে আসি এবং মেহেরপুর সংগ্রাম কমিটিতে যোগদান করে মুক্তিযুদ্ধের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করি। ১৬ এপ্রিল সন্ধ্যায় খবর পাই আমাদের এখানে একটি সমাবেশের আয়োজন করা হবে। ১৭ এপ্রিল সমাবেশের জন্য আমাকে মঞ্চ তৈরীর দায়িত্ব দেয়া হয়। আরো কয়েকজন যুবকদের নিয়ে আমি আশপাশ থেকে মঞ্চ তৈরীর জিনিসপত্র যোগাড় করতে শুরু করি। কাছাকাছি বাড়ি থেকে ৪টি চৌকি ভবেরপাড়া মিশনের তৎকালিন পাল-পুরোহিত ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ (প্রয়াত) পরবর্তীতে বিশপ ফ্রান্সিসের অনুমতি নিয়ে মিশনের স্কুল থেকে ৩/৪টি চেয়ার ও ১টি টেবিল সংগ্রহ করি। পার্শ্ববর্তী কনভেন্ট থেকে সিস্টার ক্যাথেরিনের সহায়তায় তাদের পূর্ব প্রস্তুতকৃত ও ব্যবহৃত একটি ওয়েলকাম ব্যানার সংগ্রহ করি। ১৬ এপ্রিল রাতেই আমরা ৪ ভাই, স্থানীয় কিছু যুবক ও যাত্রা দলের সদস্যদের সহায়তায় ব্যানারটি গাছের ডালে টাঙ্গিয়ে দেই এবং একটি সাদামাটা মঞ্চ তৈরী করি। এ সমস্ত কাজ আমরা খুবই সংগোপনে ও সর্তকতার সাথে করি যাতে কোন জানাজানি না হয়। রাতে আমরা আম বাগানে থেকে মঞ্চ পাহাড়া দেই যেন কেহ তা নষ্ট করতে না পারে। আমাকে জাতীয় সংগীত "আমার সোনার বাংলা" গানটি পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়। মিশন স্কুল থেকে হারমোনিয়াম এনে সকালে আম গাছের নীচে বসে আমরা জাতীয় সংগীত অনুশীলন করি। সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে আগেই একটি জাতীয় পতাকা তৈরী করা হয়েছিল। সেই জাতীয় পতাকাটি অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্যে আনা হয়। ১৭ এপ্রিল সকালে ভারত থেকে বিশাল এক গাড়ির বহর আসতে শুরু করে। এত গাড়ি আসতে দেখে স্থানীয় জনগণ আম বাগানে জড় হতে শুরু করে। মাননীয় মন্ত্রীগণ আম বাগানে এসে পৌঁছলে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ করার পাশাপাশি পবিত্র বাইবেল পাঠ করার জন্য আমাকে বলা হয়। কাছাকাছি খ্রিস্টান বাড়িতে কোন বাইবেল খুঁজে না পাওয়াতে এবং মিশনবাড়িতে যাওয়ার সময় না থাকাতে আমি তরিৎ সিদ্ধান্তে প্রভুর প্রার্থনাটি বাইবেল পাঠের অংশ হিসেবে ক্রুশ চিহ্ন করে আবৃত্তি করি। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী মন্ত্রীসভার সদস্যগণকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে সবাইকে ভারত থেকে আনা মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

এ সময় এক বর্গমাইল এলাকাজুড়ে ইন্ডিয়ান ফোর্স দিয়ে কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনি তৈরী করা হয়। এভাবে অতি সংগোপনে ও সর্তকতার সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের প্রথম অস্থায়ী মন্ত্রী পরিষদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান এই ঐতিহাসিক আম্র কাননে অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ থেকে পরবর্তী নয় মাস এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এ সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের স্বাধীনতার স্বপক্ষে চরম ত্যাগ ও তিতিক্ষার এক গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাস।

তথ্যসূত্রঃ

১. বাংলার ইতিহাস (আদিকাল থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত), দিকদর্শন প্রকাশনা, সম্পাদনা আর সি. পাল। প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০০৪।

২. ভারতীয় উপ মহাদেশের ইতিহাস (১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত), কোরআন মহল প্রকাশনা, প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০০১।

৩. অর্জন - স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও জাতির জনকের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা, বাংলাদেশ কাথলিক চার্চ, ১১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ।

৪. মি. ষ্টিফেন পিন্টু বিশ্বাস, প্রাক্তন ছাত্র, নটরডেম কলেজ॥ ❑

লেখক: সহকারী অধ্যাপক (অবঃ), নটরডেম কলেজ

জীবন সায়াহ্নের ভাবনা

জোনেস এ বটলেরু

জন্ম, শৈশব, যৌবন, পৌঢ়ত্ব ও মৃত্যু হলো মানুষের জীবনচক্র। ঠাকুর দাদার কাছ থেকে সংসারের দায়িত্ব বাবার কাঁধে, তারপরে ছেলের কাঁধে। এমনি করে দায়িত্বের চক্র ঘুরতে থাকে। প্রতিটি মানুষকে জীবনের প্রতিটি স্তরের সাধ গ্রহণ করতে হয় এবং পর-পারে চলে যেতে হয়। ব্যতিক্রম শুধু তাদের বেলায়, যাদের অপমৃত্যু কিংবা অকাল মৃত্যু হয়। পৌঢ়ত্বে পৌঁছায়ই একজন মানুষ নানা চিন্তা ভাবনায় জর্জরিত হয়। আর সেই চিন্তা ভাবনাগুলো নিয়ে আজকের এই লেখা।

জন্ম-মৃত্যু দুটি পৃথক ঘটনা। তার মাঝখানে যে বৃহৎ সময়, তা-ই জীবন। জীবন ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-উৎসব, হাসি-কান্না, উত্থান-পত্তন ও ভাংগা-গড়ার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। আজ আমরা যারা জীবনের অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছি, তাদের মনে মৃত্যু ও পরজগতের কথা মনে আসে। জীবনে আমার কি কি ভাল-মন্দ করেছি, লোভ লালসা, কাম-ক্রোধ আমাদের কতটা প্রভাবিত করেছে, তাই মনে আসে, মনে পড়ে। ধর্ম আমাদের কতটা সততার পথে, ন্যায়ের পথে রাখতে পেরেছে তাও মনে আসে। এসব ভেবে ভেবে আমরা বিচলিত হই। সুখ পাই না, আনন্দ পাইনা, মর্মাহত হই। শেষ বেলায় এসে জীবনে এসব পরিস্থিতি উদ্ভব হয়। আমরা ভাবি, জীবনে কী করলাম, আরও ভালো কিছু করতে পারতাম আরও উন্নতি হতো। কি কি ভুল করেছি, অন্যায় করেছি তা বার বার মনে পড়ে। পড়ন্ত বেলায় এসে অনেকে আবার এও ভাবে যে, জীবনে কম করলাম কিসের । আমার সাধ্যের বেশীই তো করেছি। কোথায় থেকে এসেছিলাম, এখন কোথায় আছি। আগের তুলনায় এখন অনেক ভালো ভাবেই জীবন চলছে। তা হলে আর এতো-চিন্তা, অনুশোচনা, ভাবনা কেন? আসলে রোগ, শোক, ভয়, হতাশা আরো কত কিছুই যে এই পড়ন্ত বেলায় এসে জীবন সঙ্গী হয় যা বলে শেষ করা যায় না। যারা এ গুলোর মাধ্যমে চলতে পারে, তারই ভালো আছে। আর যারা হায়হুতাশ করে, হতাশায় ভুগে,তাদের কপাল মন্দ।

এই পৃথিবীতে কারও অস্তিত্ব থাকবেনা। থেকে যাবে শুধু কর্মফল,তাও চিরস্থায়ী নয়। জীবিত অবস্থায় আমরা আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ডুবে থাকি, কত স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন-বাস্তবায়নের জন্য আমরা অনেকে অন্যায়ের পথ বেছে নেই। আমরা ভুলে গেলেও, এ কথা সত্য যে সকল সহায়-সম্পত্তি ও আত্মীয়-স্বজন রেখে আমাদের পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। তাই অবসর সময় মৃত্যু-ভাবনা সকলের মনকে বিচলিত করে। জীবন পরিক্রমায় আমরা বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হই। সাফল্য-ব্যর্থতা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না আনন্দ-বেদনা, পাওয়া-না-পাওয়ার যন্ত্রণা সবার জীবন চক্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই ভাবনা আমাদের কাঁধে চড়ে বসে অবসর জীবনে, আর আমাদের মৃত্যু-ভাবনায় ভাবিত করে। পিতা-মাতা পৃথিবীর সবচেয়ে নিস্বার্থ ব্যক্তিত্ব। তারা বিনিময়ে কি পাবে, না পাবে তা না ভেবে নিজেদের উজার করে সন্তানদের জন্য তাদের দায়িত্ব কর্তব্য পালন করে। অথচ অনেক পিত-মাতা সন্তানদের কাছ থেকে যথা উচিৎ ব্যবহার, সম্মান ও মর্যাদা পায়না। কেউ কেউ নিজের গড়া পরিবারে পরবাসী হয়ে জীবন কাটায়। আবার কারও স্থান হয় বৃদ্ধাশ্রমে।

পড়ন্ত বয়সে এসে আমরা সকলের জীবনের চাওয়া-পাওয়ার হিসাব মিলাতে চেষ্টা করি। এই সময় আমরা সুস্থ থাকার, স্বল্প পরিসরে চলাফেরা, সন্তানের মঙ্গল কামনা, আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় আবেশে জীবন-যাপন করতে চেষ্টা করি। সর্বোপরি মৃত্যু চিন্তা পড়ন্ত বয়সের বড় চিন্তা। জীবনে অনেক ভূল করি, সেজন্য বার্ধক্যে অনুশোচনাও করি। মনে হয়, হয়তো এটা না করলেও পারতাম।

জীবন একটা সেতুর মতো, সেটা পার হয়ে আসতে হয়, এবং সেটা শেষ হয়ে গেলে, জীবনও শেষ হয়ে যায়। ৬০/৬৫ বছর অতিক্রম করার পর মৃত্যুর মতো কঠিন সত্যটা মানুষের মনটাকে বিচলিত করে। কারণ তার চেয়ে কম-বয়সী কিংবা সম-বয়সী অনেকেই ইতিমধ্যে পর-পারে পাড়ি জমিয়েছে। রাতে বিশেষ করে গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গলে আমরা মৃত্যু চিন্তায় বিচলিত হই। ফেলা আসা স্মৃতি-বিজড়িত দিন গুলোর কথা মনে পড়ে। মৃত্যু ও জীবন সম্বন্ধে মনিষীরা লিখেছেন

"মৃত্যুর চেয়ে কঠিন হচ্ছে জীবন। কেননা দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ কেবল জীবনে ভোগ করতে হয়। মৃত্যু তার থেকে মুক্তি দেয়"

- সক্রেটিস

"মৃত্যু-দরজা সব সময় খোলা থাকে, বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা নেই"।

পারিকল্পিতভাবে আমরা কেউ মৃত্যু বরণ করি না। এ প্রস্থানের সময় ও দিনক্ষণ কেউ জানে না। প্রস্থানের এ সময় আত্মীয়-স্বজন, সন্তান সন্তানাদী কে কোথায় থাকবে তাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। চিরন্তন সত্যের মুখামুখি আমাদের একদিন হতেই হবে। পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতেই হবে। গভীর ভাবে চিন্তা করলে একজন সচেতন মানুষ পাগল হয়ে যাবার কথা। চারিদিকে এত কষ্টার্জিত সম্পদ, এত ক্ষমতা, আত্মীয়-স্বজন এসবই ফেলে চলে যেতে হবে। মৃত্যু-চিন্তা বা পৃথিবী ছেড়ে চিরতরে চলে যাবার চিন্তায় মানুষ পাগল হলেও পৃথিবীর কিছু যায় আসে না। চলছে পৃথিবী, চলবে তার আপন গতিতে। অনাদিকাল হতে চলছে, ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে। কারোর আকুতি বা আর্তনাতে এ গতির কোন ব্যর্ত্যয় ঘটবে না। যদিও অষ্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানী, ডেভিড গড়াল তার ব্যতিক্রম। তিনি স্বেচ্ছায় মৃত্যু গ্রহণ করেছিলেন।

বাংলাদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। সেজন্য বাংলাদেশের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে ৭৩ বৎসরে দাঁড়িয়েছে। গড় আয়ু যাই হোক না কেন, বিভিন্ন কারণে আমরা অল্প বয়সে বুড়ো হয়ে যাই। তার প্রধান কারণ- চিন্তা, পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবারের অভাব, প্রতিকূল পরিবেশে বসবাস, ভেজাল খাদ্য গ্রহণ ইত্যাদি। বৃদ্ধ বয়সে দেহ-মন উভয়ই বিপর্যস্ত হতে থাকে। তাই বয়স্করা বোঝা হয়ে যায় নিজের পরিবারের কাছে। কোন অসুখের কথা পারত পক্ষে প্রকাশ করে না। পরিবারের সকলে তাকে নিয়ে চিন্তা করুক, অর্থ ব্যায় হউক, বাড়িতে ঝামেলা সৃষ্টি হউক, তা অধিকাংশ বয়স্ক ব্যক্তিই চান না। বৃদ্ধ কালকে একটি অবাঞ্চিত ও সমস্যা-প্রচ্ছন্ন অধ্যায় হিসেবে দেখা হয়। বয়স্ক মানুষের প্রতি পরিবারের সদস্যদের অবহেলা ও উদাসীনতার মনোভাব, তাদের মধ্যে আরও মানসিক সমস্যা সৃষ্টি করে। প্রায়ই দেখা যায় যে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা অবহেলিত ব্যক্তি হিসেবে ঘরের এক কোণে নির্জন স্থানে বসবাস করে। এ বয়সে এ সকল বয়স্ক লোকদের ভালো খাবারে চেয়ে বেশি দরকার ভালো সঙ্গ। কিন্তু সঙ্গ দেওয়ার মতো লোক খোঁজে পাওয়া যায় না।

চাকরি হতে অবসর গ্রহণের পর স্বাভাবিক ভাবে অধিকাংশ বয়স্কদের আয়ের উৎস থাকে না। আমাদের দেশে অনেক পিতা মাতা চাকরি হতে তাদের এককালীন প্রাপ্ত অর্থ মেয়েদের বিয়েতে ব্যয় করে থাকে অথবা একটি বাড়ি বা একটি এপার্টমেন্ট ক্রয় করে পরিবারের মাথা গোজার ব্যাবস্থা করেন। তাই বয়স্ক কালে পরনির্ভরশীলতা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। অবসরের পর অনেকেই সামাজিক ও পারিবারিক বিভিন্ন বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। অফুরন্ত সময় থাকলেও, বয়স্কদের ব্যস্ততার শেষ থাকেনা। আত্মীয় স্বজনদের

সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা, খোঁজ-খবর নেওয়া নিত্যদিনের কাজে পরিণত হয়। শরীর সুস্থ রাখার জন্য হাঁটা-চলা, নিয়মিত ওষুধ সেবন করা, নাতি নাতনীদের স্কুলে আনা-নেওয়া, বিল পরিশোধ করা ইত্যাদি কাজে বয়স্করা ব্যস্ত থাকে। বিশেষ করে, অবসর জীবনে পাওয়া-না-পাওয়ার হিসাব মিলানোর প্রচেষ্টা থাকে সকলের। বন্ধু-বান্ধব ও সম-বয়সী কোন লোকদের সাথে নিজের চাওয়া পাওয়া তুলনা মনের অজান্তে চলে আগে। কেউ হয়তো নিঃসন্তান, কারোর শুধু কন্যা সন্তান, করোর শুধু পুত্র সন্তান, কারোর আবার পুত্র ও কন্যা সন্তান উভয়ই। সন্তানরা সঠিকভাবে লেখাপড়া করেনি, তাই প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি বলে অনেকের মনোকষ্ট। এমনি করে মানুষের শেষ জীবনে কম বেশী দুশ্চিন্তা নিয়ে কাটান এবং হতাশায় ভোগেন। অনেক ক্ষেত্রে কিছুই করার থাকে না, তাই ভাগ্যকে দোষারোপ করেন। কোন এক সময় শারীরিক সামর্থ্য ফুরিয়ে যায়। চলাফেরা করতে অসুবিধা হয়। অনেকটা নিশ্চল হয়ে ঘরে পড়ে থাকে। তখন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্যই তার অপেক্ষা। একাধিক পুত্র সন্তান থাকলে অনেক ক্ষেত্রে মা-বাবা কার সাথে থাকবে তা নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে পুত্রবধূর আন্তরিকতার উপর তাদের থাকার স্থান নির্ভর করে, ছেলের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। প্রায়ই দেখা যায়, মায়েরা মেয়ের কাছে থাকতে অধিক স্বচ্ছন্দ্য-বোধ করে।

পড়ন্ত বয়সে খেলার সাথী, বাল্যবন্ধু কিংবা সমবয়সী কোন ব্যক্তির সাথে সুখ-দুঃখের কথা বলে নিজেকে হালকা করে। তাদের সাথে সময় কাটিয়ে আনন্দভোগ করে। পরের মেয়ে পুত্রবধূর কটু কথায় বা খারাপ আচরণে যতটুকু পিতা-মাতা কষ্ট পান, তার চেয়ে বেশি কষ্ট পান, যদি নিজ সন্তান তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। বৃদ্ধাশ্রমে ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, উকিল ব্যারিস্টার ও ধনী ব্যক্তির মা-বাবারা থাকতে পারে। কিন্তু কোন অশিক্ষিত ও দরিদ্র পরিবারের মা-বাবাকে দেখা যায় না। এটাই আদর্শহীন শিক্ষার ফল।

একটি গানের মধ্যে বৃদ্ধ বয়সের করুণ অভিব্যক্তি ও আর্তনাদ ফুটে উঠেছে ঃ----- "আমার এ কেশ পাকিবে, দন্তও নড়িবে
সম্বল হইবে মোর লাঠি।
তখন পুত্র-পরিজন সকলেই বলিবে
এ জঞ্জাল মরিলে বাঁচি।"

বিশ্ব বিজয়ী আলেকজান্ডার অগাধ সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। জীবনের অন্তিম সময়ে তিনি তার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করেছেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বলেছিলেন "আমার শব-যাত্রায় আমার দু-হাত যেন কফিনের বাইরে রাখা হয়, যাতে মানুষ দেখতে পায় যে, মহাবীর আলেকজান্ডার বিশ্বজয় করেও খালি হাতে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছে"।

শেষ বয়সে যখন মানুষ একা একা বসে থাকে, তখন তার মনে হয় আমি বিখ্যাত কোন লেখক, কবি, বিজ্ঞানী, গায়ক কিংবা কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব নই যে, মারা যাওয়ার পর সকলে আমাকে স্বরণ করবে। এমন কিছু করেও যাচ্ছি না যে, মানুষ ক্ষণিকের জন্য আমাকে মনে করবে। তা হলে আমার জীবনের স্বার্থকতা কতুটুক? পরিবার ও নিজেকে নিয়ে আত্মকেন্দ্রিকভাবে জীবন-যাপন করেছি। তা কি ঠিক হয়েছে, জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এমন প্রশ্ন উঁকি দেয়। পড়ন্ত বয়সে যেমনটি করে জীবনের কথা ভাবছি, যৌবন থেকে শুরু করে, ৬০ এর কোঠায় পা দেওয়ার আগ পর্যন্ত তেমনি করে কখনও ভাবিনি। তাইতো মি: হার্ড ম্যাক বলেছেন-

" সময় বিনামূল্য, কিন্তু এটি মূল্যবান
আপনি এটার মালিক না, কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন
আপনি এটা রাখতে পারবেন না, কিন্তু ব্যয় করতে পারবেন
একবার এটি হারিয়ে ফেললে, আপনি এটা ফিরে পাবেন না"।

আর কয় দিনই বা আছি, তা ভেবে মন বিচলিত হয়। কারণ যারা নিত্যদিনের সাথী, সুখ-দুঃখের অংশীদার, তাদের সাথে সব চুকিয়ে বিদায় নিতে হবে। তাদের মাঝে আমার অস্তিত্ব থাকবে না। তাদের কাছে আমরা কিছু স্মৃতি হয় তো থেকে যাবে কিছু দিনের জন্য। আর দেওয়ালে টাঙানো ছবি কয়েক বৎসর থাকবে। কালক্রমে দেওয়ালের ঐ স্থানে অন্য কোন ছবি স্থান পাবে। খাবার টেবিলের চেয়ারে অন্য কেউ বসবে। এ্যালবামের ছবিগুলোর রং ফিকে হতে থাকবে। পরবর্তীতে ছবিগুলো অপ্রয়োজন ভেবে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হবে। এটাই বাস্তবতা।

স্বপ্নের বাড়ী-ঘর, আসবাবপত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি যেমন আছে, তেমন রেখে না-ফেরার দেশে চলে যেতে হবে। যে খাটে এতদিন ঘুমিয়েছি, মৃত্যুর পর সে খাটে এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে রাখবে না। খাটের পাশে বা বারান্দায় এক কোণে নিথর দেহটা কাপড়ে ঢেকে রাখবে। সবই আমার অথচ নেই কোন অধিকার। হায়-রে সংসার, কি নিষ্ঠুর বাস্তবতা। সন্তানরা ধর্মীয় প্রথা অনুযায়ী পারলৌকিক কার্যাদি সম্পন্ন করবে। পরবর্তীতে সন্তানরা মৃত্যুবার্ষিকী পালন করতে থাকবে। তারপর হয়তো কোন এক সময় মৃত্যুর দিনটাকেও সন্তানরা ভুলে যাবে।

"সত্যিই আমরা সকলে অবোধ
মৃত্যুর পথযাত্রী, মিথ্যে ভালবাসি"॥ ❑

লেখক: প্রিন্সিপাল ও সিইও, বটলেরু এণ্ড এসোসিয়েটস্

ঢাকা খ্রিষ্টান ছাত্র কল্যাণ সংঘ

কার্যকরী পরিষদ ২০২২-২০২৩

ঢাকা খ্রিষ্টান ছাত্র কল্যাণ সংঘের নতুন কার্যকরী পরিষদের পক্ষ থেকে সকলকে পাস্কা পর্ব এবং বাংলা নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

বিজ্ঞা/১৬/২২

ট্রুথ বনাম ফ্যাক্ট

সিস্টার রাখী গনছালভেস আরএনডিএম

"সত্যের স্বপক্ষে যেন সাক্ষি দিতে পারি, এর জন্যই আমি জন্মেছি,এর জন্যই এই জগতে এসেছি।"*(যোহন ১৯:৩৭)* যিশুর এই উক্তির বিপরীতে পিলাত বলেছিলেন- "সত্য! সত্য আবার কী?"*(যোহন ১৯:৩৮)* প্রকৃত অর্থেই সত্যের মর্মার্থ উপলব্ধি করার ক্ষমতা পিলাতের ছিল না, থাকবার কথা নয়। পিলাতের প্রশ্ন- "তাহলে তুমি রাজা?" এবং যিশুর প্রতিউত্তর "আপনি নিজেই তো বলছেন, আমি রাজা!" পিলাতের নিকট ছিল অবান্তর, পরিহাসমূলক। যিশু রাজা অথচ নেই তার রাজকীয় বেশ, নির্দিষ্ট রাজ্যসীমা, ধন-সম্পদ, সেনাবল, ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রকৃত, একজন রাজার রাজকীয় বৈশিষ্ট্য থাকা চাই এবং সেটাই স্বাভাবিক (দ্যাট ইজ দ্য ফ্যাক্ট)। কিন্তু, যিশু তো সত্যিই রাজা, রাজার রাজা, ঈশ্বর থেকে জাত স্বয়ং ঈশ্বর, গোটা জগতের অধিপতি।

আভিধানিক অর্থে 'ট্রুথ' এবং 'ফ্যাক্ট' শব্দ দুটি প্রায়ই কাছাকাছি কিংবা একই অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু মর্মার্থ উপলব্ধিতে এই শব্দযুগলের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। বই-পুস্তক থেকে, জাগতিক অভিজ্ঞতা থেকে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি সেটি হল ফ্যাক্ট, যা প্রকাশ্য দিবালোকে বর্তমান, যুক্তি-বুদ্ধিতে দৃশ্যমান। আর সত্য হল তাই যা আমাদের মন বলে দেয়, যা অধিকাংশ সময়ই খালি চোখে দেখা যায় না, যা স্বচ্ছ বিবেকের ইশারায় উপলব্ধি করা যায় মাত্র। ফ্যাক্ট যদি হয় বাস্তবতা, অভিজ্ঞতা এবং অর্জিত জ্ঞান ট্রুথ তবে পরম বাস্তবতা, পরম অভিজ্ঞতা এবং পরম জ্ঞান।

মহাত্মা গান্ধীর আত্মজীবনী ট্রুথ এবং ফ্যাক্ট সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করে। মহাত্মা গান্ধীকে সত্য-অন্বেষণকারী বা সত্যের পূজারী উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। ছোটকাল থেকেই তিনি খুব সত্যবাদী ছিলেন। ছোটবেলায় যে দু'একবার তিনি তার পিতার নিকট মিথ্যা বলেছিলেন তার জন্য গভীর অনুতাপ পোষণ করেন। সমগ্র জীবনের বিভিন্ন ঘটনায় তিনি সত্য-সন্ধান করেন। কোনটি জাগতিক/অর্জিত জ্ঞান (ফ্যাক্ট) আর কোনটি সত্য (ট্রুথ) তা খোঁজা, বোঝা এবং উপলব্ধি করার জন্য তিনি অনেক সাধনা করেছেন, অর্ন্তদ্বন্দে ভুগেছেন। কোনটি তার করা উচিত, কোনটি থেকে তার বিরত থাকা উচিত তা বুঝতে আত্মদর্শনে নিমজ্জিত হয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করেন। তার জীবনের কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরার মাধ্যমে ফ্যাক্ট এবং ট্রুথকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছি।

ঊনবিংশ শতকে ভারতের রাজকোটে সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী বণিক গোত্রে জন্ম নেয়া এই মহান ব্যক্তিটি ছিলেন বাল্যবিবাহের শিকার। তার যখন ষোল বছর বয়স তখন তার পিতা ছিলেন শয্যাশায়ী, ব্যধিগ্রস্ত। পিতাকে অনেক ভক্তি করতেন তিনি। পিতার পরিচর্যার ভার নিয়েছিলেন তিনি, সময়মত ঔষুধ দিতেন, ঘা পরিষ্কার করে দিতেন, প্রতিরাতে পিতার পা মালিশ করে দিতেন অনেক সময় ধরে, যতক্ষণ না পর্যন্ত তার পিতা ঘুমিয়ে পরতেন কিংবা তাকে ঘরে যাওয়ার অনুমতি দিতেন। তবে পিতার শুশ্রুষা করার সময় তার মন পড়ে থাকত তার নিজের ঘরে, কখন তিনি তার স্ত্রীর শয্যাসঙ্গী হবেন, তার স্ত্রী ছিলেন তখন অন্তঃসত্ত্বা। এমনি এক রাতে পিতাকে সেবা-যত্ন করে তিনি নিজ ঘরে যান। সেই রাতে তার পিতার শরীর মোটেই ভাল ছিল না। তিনিও লক্ষ্য করেছিলেন যে তার পিতার স্বাস্থ্য ক্রমাগত খারাপের দিকে যাচ্ছে। আর সেই রাতেই তার পিতা মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি উপস্থিত ছিলেন না। পিতার মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত থাকতে না পেরে তিনি গভীরভাবে মনক্ষুন্ন হন। তার পিতার পাশে ছিলেন পিতার ছোট ভাই যিনি ভাইপোকে নিজ ঘরে বিশ্রাম নিতে পাঠিয়ে দেন। তরুণ গান্ধীজী গভীরভাবে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হন। কেন তিনি কাকার কথায় নিজ ঘরে চলে গিয়েছিলেন, কেন সারারাত ধরে মুমূর্ষ পিতার সেবা করেননি। বড় হয়ে তিনি কঠিন সত্য উপলব্ধি করেন। এটাই সত্য যে পিতার মৃত্যুকালে তিনি ছিলেন দৈহিক কামনায় জর্জরিত একজন পুরুষ, পিতৃ-ভক্ত দায়িত্বশীল সন্তান নয়। এতোদিন ধরে অসুস্থ পিতার যে সেবাযত্ন তিনি করেছেন সেটি ছিল তার উপর অর্পিত দায়িত্ব (ফ্যাক্ট), ট্রুথ নয় ।

গান্ধীজী ছিলেন বৈষ্ণব, তাই নিরামিষভোজী। ইংল্যান্ডে ওকালতি পড়তে যাওয়ার আগে তার মা তাকে দিয়ে শপথ করিয়েছিলেন যে তিনি যেন 'মদ-নারী-মাংস' এই তিনটি জিনিস স্পর্শ না করেন। ইংল্যান্ডের মাটিতে নিরামিষভোজী এই ব্যক্তিটিকে নিজের খাদ্য যোগাড় করতে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে, অন্যের বিরক্তির পাত্র হতে হয়েছে। অনেক সময়ই অর্ধাহারে জীবন-যাপন করতে হয়েছে, টানা ১০-১২ মাইল হাঁটতে হয়েছে সস্তার ভেজিটেরিয়ান রেস্টুরেন্ট খুঁজে পাওয়ার জন্য। প্রকৃত অর্থে নিরামিষ বলতে কী ধরনের খাদ্য বুঝায় তা জানার উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন বই থেকে জ্ঞান আহরণ করেন। 'সল্টস প্লি ফর ভেজিটেরিয়ানিজম' নামক বইটি পড়ে তিনি অভিভূত হন এবং শুধুমাত্র মায়ের কাছে শপথ গ্রহণের নিমিত্ত নয় বরং বরং নিজের ইচ্ছায় নিরামিষভোজী হওয়ার অদম্য ইচ্ছা পোষণ করেন। তবে ইংল্যান্ডের কতগুলো ভেজিটেরিয়ান রেস্টুরেন্টে তিনি ভিন্ন ব্যাখ্যাও পান। ইংল্যান্ডে তিনি মাংস জাতীয় খাবারের তিন রকমের সংজ্ঞা পান। প্রথম– মাংস হল কেবলমাত্র পাখি এবং পশুর দেহ, এক্ষেত্রে মাছ ও ডিমকে মাংস বুঝায় না। দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি বলে- মাংস হল সকল জীবিত প্রাণীর দেহ,এক্ষেত্রে মাছও যুক্ত তবে ডিম নয়। তৃতীয়ত, জীবিত প্রাণীর উৎপাদন সকলই হল মাংস। মাংস সম্পর্কে এইসকল জ্ঞান আহরণের পর তিনি একসময় ডিম, দুধ এবং মাখন খাওয়া শুরু করেন। তবে তা দু'সপ্তাহের বেশী স্থায়ী হয়নি। কারণ তিনি প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করেন। তিনি ভাল করে জানতেন তার মায়ের নিজস্ব সংজ্ঞায় ডিম হল মাংস/আমিষ। এক্ষেত্রে তৃতীয় সংজ্ঞাটি তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, প্রথম ও দ্বিতীয়টি নয়। কোনটি ফ্যাক্ট আর কোনটি ট্রুথ তিনি ভালভাবেই বুঝতে পারলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির অনুপ্রেরণায় গান্ধীজী খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন বিভিন্ন প্রার্থনা সভায় যোগ দিয়ে, বাইবেল এবং অন্যান্য বই পড়ে। প্লিমাউথ ব্রেদরেন নামক সংঘের একজন ভাই গান্ধীজীকে খ্রিস্টধর্মে অনুপ্রাণিত হওয়ার জন্য বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করেন। তবে প্রকৃত প্রস্তাবে প্লিমাউথ-ভ্রাতার যুক্তিগুলো খ্রিস্টধর্মের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরে না। প্লিমাউথ-ভ্রাতা শুধুমাত্র যিশুখ্রিস্টের কষ্টভোগকেই খ্রিস্টানদের একমাত্র মুক্তিপণ/পরিত্রাণ বলে দাবি করেন। ব্যক্তি খ্রিস্টানদের নিজ ক্রুশ নিজে বহন করে যিশুর অনুসরণ করা এবং পাপহীন জীবন-যাপন করার নির্দেশ সম্পূর্ণরূপেই অবজ্ঞা করেন। প্লিমাউথ-ভ্রাতা বলেন, "এই পৃথিবীতে পাপহীন জীবন-যাপন সম্ভবপর নয়, কিন্তু মুক্তি আমাদের অবশ্যই পেতে

(২৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ফ্রিল্যান্সিং

সৈকত লরেন্স রোজারিও

ইমন ছেলেটা ইউনিভার্সিটি জীবনের ২য় বর্ষে কেবল প্রবেশ করলো। মন দিয়ে ক্লাস করে যাচ্ছে সে, একই সাথে গ্রামের বাড়িতে টাকাও পাঠিয়ে যাচ্ছে। এই টাকা ইনকামের জন্য সে কোনো অফিসে কাজ করছে না। বরং ইউনিভার্সিটি হোস্টেলে থেকেই পড়াশুনার পাশাপাশি একটি ল্যাপটপ ব্যবহারের মাধ্যমেই আয় করছে সে। করছে টা কি ইমন আসলে? যে পেশাটির সাথে ইমন জড়িত তা হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং (Freelancing).

ফ্রিল্যান্সিং কি?

যেই কাজের বিশেষ অভিজ্ঞতা আপনার আছে, তার সাথে জড়িত কাজ ঘরে বসেই অন্যদের জন্যে করা এবং তার বিনিময়ে টাকা নেয়াই ফ্রি-ল্যান্সিং।

ইন্টারনেটের ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে, স্বনির্ভর থেকে টাকা উপার্জন করার একটি মাধ্যম হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং। স্বাধীনভাবে কাজ করা যায় বলে একে মুক্তপেশাও বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ এই পেশায় নির্দিষ্ট সময় মেনে কাজ করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এই প্রক্রিয়াতে ইন্টারনেটের বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে কাজ খুঁজে নিজের দক্ষতার মাধ্যমে ইচ্ছেমত কাজ করা যায়। ইন্টারনেটের বিভিন্ন ফ্রিল্যান্সিং সাইট, সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এ ফ্রিল্যান্সাররা নিজ দক্ষতা অনুযায়ী নানান ধরণের কাজ, প্রজেক্ট খুঁজে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করে ক্লায়েন্টকে হস্তান্তরের মাধ্যমে টাকা আয় করে থাকেন। তবে অবশ্যই যেই প্রজেক্টে কাজ করা হবে, তার জন্যে কত টাকা দাবি করা হচ্ছে তা ক্লায়েন্টের সাথে আগে থেকেই ঠিক করে নিতে হবে। ফ্রিল্যান্সিং এ নিজেই ঠিক করা যায় যে কাজটা কি ফুলটাইম নাকি পার্টটাইম করা হবে।

এতক্ষণের কথাগুলো মনে অনেকগুলো প্রশ্নের উদ্রেক করেছে নিশ্চয়? যেমন: কি ধরনের কাজ, কিভাবে কাজ পাবো, কি শিখতে হবে ইত্যাদি। নিচের লেখাটুকু আশা করি আপনাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো ধারণ করবে।

কি ধরনের কাজ ফ্রিল্যান্সিং এ করা যায়?

- Graphic Design
- Translating
- Website Designing
- Article Writing
- Video Editing
- Programing
- Data Entry

এছাড়াও আরো অনেক কাজ রয়েছে যেগুলির দ্বারা নিজেকে তৈরী করে ফ্রিল্যান্সিং এর জগতে বিচরণ করা সম্ভব।

ফ্রিল্যান্সিং কিভাবে শুরু করব?

ধরে নিলাম, আমরা ওপরের কোনো একটি বিষয়ে নিজেকে পারদর্শী করে নিয়েছি। এখন স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে যে, কিভাবে ফ্রিল্যান্সিং শুরু করতে পারি?

ফ্রিল্যান্সিং এর জন্যে সবচেয়ে প্রথম যে বিষয়টা দরকার, তা হলো ইন্টারনেটের সঠিক ব্যবহার। কারণ, নিজের জন্য কাজ খোঁজা থেকে আরম্ভ করে কাজটি প্রস্তুত করে ক্লায়েন্ট কে জমা দেয়া সবটাই ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন ফ্রিল্যান্সিং ওয়েবসাইটগুলিতে গিয়ে আপনার করতে হবে। কাজ পাওয়ার লক্ষ্যে নিজের দক্ষতার প্রচার বা মার্কেটিং ইন্টারনেটের মাধ্যমেই বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে এ গিয়ে করতে হবে। যার ফলশ্রুতিতে অন্যেরা জানতে পারবে কোন কাজ আপনি তাদের জন্যে করতে পারবেন। এতে ভবিষ্যতে আপনার দক্ষতার সাথে জড়িত বিভিন্ন প্রজেক্ট বা কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে।

নিচের ধাপগুলো আপনাদের সাহায্য করতে পারে ফ্রিল্যান্সিং এর জড়িত হওয়ার জন্যে:

১। নিজের লক্ষ্য সঠিকভাবে নির্বাচন করুন

প্রথমেই ঠিক করে নিন যে, আপনি এই মাধ্যমে কতটুকু কাজ করতে চান? কত সময় দৈনিক আপনি এই ক্ষেত্রে দিতে পারবেন? আপনি কি ফ্রিল্যান্সিং থেকে পার্টটাইম ইনকাম করবেন নাকি ফুলটাইম ক্যারিয়ার হিসেবেই ফ্রিল্যান্সিং করবেন ইত্যাদি।

২। কোন বিষয়ে কাজ করবেন?

এরপরই যে বিষয়টা নিয়ে ভাবতে হবে তা হচ্ছে, আপনি কোন Topic এ কাজ করবেন। যেমন: Content Writing, Programing, Graphics Designing, Video Editing, Data Entry আরো নানা ধরনের কাজ আপনি একজন Freelancer হিসেবে করতে পারেন। তবে যে Topic এই কাজ করতে ভাবুন না কেন, প্রথমেই আপনাকে ভাবতে হবে নিচের বিষয়গুলোঃ

- নির্বাচিত Topic এ আপনার দক্ষতা
- মার্কেটে আপনার Topic এর কাজ এর চাহিদা
- নির্বাচিত বিষয়ে কাজ করার যথেষ্ট ধৈর্য্যশক্তি আছে কিনা।

৩। কোন Website এ Freelancing এর কাজ পাওয়া যায়?

যেহেতু Freelancing বিষয়টা এখন অনেকাংশেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর, তাই এই কাজগুলো ক্লায়েন্ট এর কাছ থেকে পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ওয়েবসাইটই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই সাইটগুলোতে বিভিন্ন ক্লায়েন্ট বিভিন্ন ধরণের কাজ করানোর জন্য Freelancer দের খোজ করে থাকেন এবং Freelancer রাও নতুন নতুন কাজ খোজার জন্য এই সাইটগুলো ব্যবহার করে থাকেন। বেশ কিছু জনপ্রিয় Freelancing Site/ Platform হচ্ছেঃ Fiverr, Upwork, Freelancer ইত্যাদি।

৪। Freelancing Site এ গিয়ে কি করব?

এই ওয়েবসাইটগুলিতে গিয়ে প্রথমেই নিজের একটি Profile বা Account তৈরী করতে হবে। একাউন্ট তৈরীর পর নিজের কাজের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, আপনার নিজের কিছু তথ্য সেখানে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এটাও লিখুন যে, ক্লায়েন্টরা কেন আপনাকে কাজ দিবেন। আপনার অদ্বিতীয়তা উল্লেখ করে কিছু কথা আপনার প্রোফাইলে লিখুন। আপনার প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে ক্লায়েন্টরা আপনাকে কাজ দিতে উদ্বুদ্ধ হবেন।

মনে রাখবেন, Freelancing একধরনের প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসা। এখানে আপনার দক্ষতা দিয়ে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে কাজ নিয়ে আসতে হবে। আপনার অনেক প্রতিযোগিরাও এই কাজ নিয়ে আসার জন্য প্রস্তুত থাকবে। কত সময়ে আপনি কাজটি হস্তান্তর করবেন, তার বিনিময়ে কত টাকা পারিশ্রমিক নিবেন এবং সর্বোপরি আপনার প্রোফাইল কতটা উন্নত এই তিনটা বিষয় আপনাকে আপনার প্রতিযোগিদের কাছ থেকে আলাদা করবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনাকে কাজ পাওয়ার জন্য হয়তো অল্প সময়ে, অল্প পারিশ্রমিকে কাজ করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কাজ নিয়ে আসতে হবে। নইলে হয়তো ক্লায়েন্ট কাজটি অন্য কোনো ফ্রিল্যান্সার কে দিয়ে দিতে পারেন।

পরিশেষে বলি, Freelancing ব্যবসায় টাকা আয় করার কোনো সীমা নেই। আপনার কাছে যত বেশী কাজ আসবে, যত বেশী কাজ আপনি করে দিতে পারবেন ততটাই বেশী আপনার ইনকাম হবে। নিজের ধৈর্য্যশক্তি এবং কাজের দক্ষতাই পারে আপনাকে সুন্দর স্বচ্ছল একটি জীবন দিতে। তাই বেকারত্বের বোঝা না টেনে শুরুর সেই ইমনের মতো পড়াশোনার পাশাপাশিই নিজেকে প্রস্তুত করি পরবর্তী জীবনের স্বচ্ছল সময়ের জন্য॥ ❑

লেখক: প্রভাষক, নটরডেম কলেজ, ঢাকা

সাদাকালো জীবন - ৬

মালা রিবেরু (পামার)

হঠাৎ করে অহনার ফোন পেয়ে মনটা এক আজানা আতঙ্কে ভরে উঠলো । আমার অত্যন্ত প্রিয় ছাত্রী অহনা। অহনার জীবনের ঘটে যাওয়া ভালোমন্দ প্রতিটি ঘাটনায় সহভাগিতা করে এবং অনেক সময় আমার সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়। তা বেশ কয়েকদিন ধরে একটা ব্যাপারে সে খুবই সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলো ।

ব্যাপারটা খুবই পুরোনা এবং এর রেশটা অনেক আগে থেকে শুরু, যার পরিসমাপ্তি হওয়া প্রায় কাছে চলে এসেছে। অহনা খুব বড়লোকের বড়মেয়ে আর তার ছোট দুটো ভাইবোন আছে, আমার ছাত্রী থাকাকালীন সময়ে অহনাকে আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি খুবই বিশাল মনের মানুষ, খুবই সহজ সরল মনের সাধারণ একটা মেয়ে। অহনা আমাকে ওর জীবন সম্পর্কে, ওর পড়াশুনা পাশাপাশি সবকিছু শেয়ার করলো ।

আহনা সম্পর্কে আগেই বলেছি, যে খুবই সহজ সরল এবং খুবই সহজে মানুষের সাথে মিশে যেতে পারে। আর বয়স তখন রঙীন স্বপ্ন দেখার, তাই প্রেমে পড়াটা খুবই স্বাভাবিক। প্রেম তো এমন যে বাবা-মাকে না জানিয়ে পালিয়ে বিয়ে করে সংসার শুরু করা। জীবনটা ভুল দিয়ে শুরু করলেও একটা ব্যাপারে অহনা খুবই সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো যে পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছিলো। বাবা-মা থেকে আলাদা, নতুন সংসারে খাপ খাইয়ে চলা, এর মাঝে নতুন অতিথির আগমন সবকিছু মানিয়ে নিয়ে এইচএসসি পাশ করে।

এই চার বৎসরে অনেক চড়াইউৎরাই পার করতে হয়েছে, বাবা-মার সর্ম্পকটাও মেনে নিয়েছিলো, যার প্রেক্ষিতে সম্পন্ন করা হয়েছে।

এইচএসসি পাশ করার পরে অহনা সিদ্ধান্ত নেয়, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার, তাই নার্সিং পেশায় প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে ভর্তি হয় এবং তিনবৎসর সংসারের ১বৎসরের সন্তানকে রেখে কোর্স সফলতার সাথে শেষ করে ।

তিনবৎসর শিক্ষানবীশ থাকাকালীন সময়ে স্বামীর সাথে অধিকাংশ সময় না দেখা, দূরে থাকা আস্তে আস্তে দুইজনের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে এবং এই দূরত্ব একসময় অবিশ্বাস প্রতিদিনের ঝগড়ায় পরিণত হয়।

শেষপর্যন্ত ঝগড়াটা এমন পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিলো যে, অহনার ছোটবোনও সে নোংরা কুরুচিপূর্ণ বাক্য থেকে বাদ যায়নি ।

অহনা প্রায়ই আমাকে ফোন করে কান্নাকাটি করে আর বলতো ম্যাম আমি আর পারছিনা, আমাকে আমার স্বামী মানসিকভাবে একটুও শান্তিতে থাকতে দিচ্ছেনা, আমি ওর সেল নাম্বার ব্লক করে দিয়েছি, এখন আমার বান্ধবীদের কল করে আমার নামে খুব বাজে কথা বলে। আমি আর সহ্য করতে পারছিনা, এখন আমি কি করবো আমাকে একটা উপায় বলে দেন। আমি আর সহ্য করতে পারছিনা। আপনি তো জানেন আমি যৌবনকালে ভালোমন্দ কোন চিন্তাভাবে না করে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যার জন্য এখন তার ফলভোগ করতে হচ্ছে ।

অহনাকে বললাম, চেষ্টা করো খাপ খাইয়ে নিতে, জীবনটা মাত্র শুরু, সামনে অনেক সুন্দর ভবিষ্যৎ পরে আছে, সুতরাং তুমি যেটা ভালো মনে করো বাবা-মার সাথে বসে সিদ্ধান্ত নাও ।

তারপর অনেকদিন কেটে গেলো, আজ আবার অহনার ফোন এবং সেই অপ্রত্যাশিত খবর, ম্যাডাম আর সহ্য করতে পারলামনা, সর্ম্পকটি শেষ পর্যন্ত শেষ করে ফেললাম ।

অল্প বয়সের আবেগ, ভবিষ্যতে কথা চিন্তা না করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অহনার মতো অনেকের জীবন ধ্বংসের দিকে চলমান, সুতরাং বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন, সারাজীবনের সঙ্গী নির্বাচন তা বুঝে শুনে নিতে হবে, তা না হলে একটি ভুলের জন্য সারাজীবন এর ফল ভোগ করতে হবে॥ ❑

লেখক: নার্সিং অফিসার, ঢাকা

মৃতুঞ্জয়ী খ্রিস্ট!

বিকাশ জে মারাণ্ডী ওএমআই

জীবন আমার মরুভূমি
হয়েছি পথভ্রষ্ট
এই জীবনে এসো তুমি
মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিস্ট।

ধুলোলাঞ্ছিত অহংকারে
অন্ধ ছিলাম আমি
এসো আমার ভগ্ন ঘরে
ওহে জীবনস্বামী।

নতুন করে স্বপ্ন দেখি
তব মৃত্যুঞ্জয়ে
প্রার্থনাতে তোমায় ডাকি
এসো জীবন হয়ে।

মৃত্যুজয়ে আনন্দে মাতি
তব পুনরুত্থানে
তোমার স্মরণে দিবা-রাতি
থাকি জীবন ধ্যানে।

তোমায় নিয়ে করি আনন্দ
উল্লাসে বাঁধি প্রাণ
আমার লেখা কাব্য-ছন্দ
সব তোমারই দান।

তোমার করি পূজা-স্তুতি
পাপের পরিত্রাণে
তব চরণে রাখি আরতি
মৃত্যুঞ্জয়ীর গানে।।

স্বাস্থ্যকথা

আইবিএস
পেটের অসুখ আইবিএস কী, কেন ও প্রতিকার

ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও

আইবিএস বা ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম পেটের একটি পরিচিত ও বিরক্তিকর সমস্যা। আমাদের আশপাশে অনেকেই এই সমস্যায় ভুগে থাকেন। এর কারণে আক্রান্ত ব্যক্তিরা সাধারণত দীর্ঘদিন কষ্ট পান, কোনো সুফল না পেয়ে একজনের পর একজন চিকিৎসক পরিবর্তন করতে থাকেন এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায়। আসলে রোগটির গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ভালোভাবে জানা থাকলে একে মোকাবিলা করা সহজ হয়। নয়তো অধৈর্য হওয়াটা স্বাভাবিক।

উন্নত বিশ্বের প্রায় ১০-১৫% লোক আইবিএস রোগের লক্ষণ দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে করা হয়। এটি দক্ষিণ আমেরিকায় বেশি এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাধারণত কম। এটি পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের জন্য দ্বিগুণ এবং সাধারণত ৪৫ বছর বয়সের আগে ঘটে। অবস্থা বয়সের সাথে সাথে কম সাধারণ হয়ে ওঠে বলে মনে হয়। আইবিএস রোগ আয়ুকে প্রভাবিত করে না বা অন্যান্য গুরুতর রোগের দিকে পরিচালিত করে না। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে অবস্থাটি প্রথম বর্ণনা করা হয়; ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ বর্তমান ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রে ১৫%, মেক্সিকোতে ৩৫% -৪৫%, ব্রাজিলে ৪৩%, পাকিস্তানে ১৪%, যুক্তরাজ্যে ১০% লোক এ রোগে আক্রান্ত। যুক্তরাষ্ট্রে এ রোগের চিকিৎসায় বার্ষিক ১.৭- ১০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় হয় ।

আইবিএস আসলে কী

- এটা আমাদের পরিপাকতন্ত্রের একটি ফাংশনাল বা কার্যগত সমস্যা।
- এখানে পরিপাকতন্ত্রের কোনো গঠনগত পরিবর্তন বা সমস্যা হয় না।
- এই সমস্যা সাধারণত যুবা বয়সেই শুরু হয়ে থাকে।
- নারীরাই বেশি ভুগে থাকেন।
- যারা সব সময় উদ্বিগ্ন বা মানসিক চাপে থাকেন, তারা এতে বেশি ভোগেন।
- এখন পর্যন্ত আইবিএসের সঠিক কারণ ভালোভাবে জানা যায়নি। তবে কিছু থিওরি রয়েছে। পরিপাকনালির পেশির অস্বাভাবিক সংকোচন, প্রসারণ, স্নায়ুর সংকেতজনিত সমস্যা, উদ্বেগ ও মানসিক চাপ, পরিপাকতন্ত্রের সহজাত ও উপকারী ব্যাকটেরিয়ার পরিবর্তন ইত্যাদি কারণ শনাক্ত করা হয়েছে এর পেছনে। তবে অনেক খুঁজেও পরিপাকতন্ত্রে কোনো বড় সমস্যা পাওয়া যায় না বলে কারণ অনুসন্ধানে কোনো লাভ নেই।

কীভাবে বুঝবেন আপনার আইবিএস আছে

এই রোগের কারণে মূলত দুই ধরনের সমস্যা হয়।

- একটি হলো পেটে ব্যথা অনুভব করা, অন্যটি হলো মল ত্যাগের অভ্যাসের পরিবর্তন। পেটের ব্যথা সাধারণত মলত্যাগের পর চলে যায় বা কমে যায়। এতে ওজন হ্রাস, জ্বর, রক্তশূন্যতা বা মলের সঙ্গে রক্তপাত ইত্যাদি দেখা যায় না। তবে সমস্যাটি খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে জড়িত।
- কিছু খাবার খেলে এই সমস্যা বেড়ে যায়। এটা একেকজনের ক্ষেত্রে একেক রকম, কিন্তু দুধ ও দুধজাতীয় খাবার এবং শাকসবজি ও সালাদের মতো খাবারে সাধারণত বেশি বাড়ে।
- তবে ভালো বিষয় হলো যে এটা মারাত্মক কোনো রোগ নয়। এ থেকে বড় কোনো জটিলতা হওয়ার আশঙ্কা নেই।

ভিটামিন ডি

এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি বেশি দেখা যায়। ভিটামিন ডি অন্ত্রের মাইক্রোবায়োম, প্রদাহজনক প্রক্রিয়া এবং ইমিউন প্রতিক্রিয়া, সেইসাথে মনোসামাজিক কারণগুলি জড়িত।

বংশগতি

অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে পাওয়া যায় যাদের উপদাহী অন্ত্র সংলক্ষণ আছে, বিশেষ করে কোষ্ঠকাঠিন্য-প্রধান ধরণে (IBS-C) এ রোগের বংশজনিত সমস্যা দেখা যায়। [ফলস্বরূপ ত্রুটিটি কোলন এবং পেসমেকার কোষের মসৃণ পেশীতে Nav1.5 চ্যানেলকে প্রভাবিত করে অন্ত্রের কার্যকারিতায় ব্যাঘাত ঘটায়।

কীভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়

পরিপাকতন্ত্র বিশেষজ্ঞরা আইবিএস নির্ণয় করতে কিছু নির্দিষ্ট লক্ষণ বা রোম ক্রাইটেরিয়া ব্যবহার করে থাকেন।

- এই রোগ দুই রকম হতে পারে, যেমন আইবিএস ডি, যেখানে পেটে ব্যথার সঙ্গে পাতলা বা নরম পায়খানা হয় এবং
- আইবিএস সি, যেখানে পেটে ব্যথার সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে।
- কারও কারও দুটিই থাকতে পারে। রোগের লক্ষণ ও ইতিহাস শুনে রোগ শনাক্ত করা হয়, তবে এর সঙ্গে অনেক সময় কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নিশ্চিত করতে হয় যে অন্য কোনো পরিপাকজনিত রোগ বা জটিলতা নেই।
- বেশির ভাগ পরীক্ষারই রিপোর্ট স্বাভাবিক পাওয়া যায়।

পরিত্রাণের উপায় কী

দুঃখজনক হলেও এটা সত্যি যে এই সমস্যার পুরোপুরি কোনো সমাধান নেই। তবে একে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

- রোগীর লক্ষণ অনুযায়ী খাদ্যাভ্যাসে কিছু পরিবর্তন আনা দরকার। দুধ, দুগ্ধজাত খাবার, শাক ইত্যাদি যেসব খাবারে সমস্যা বাড়ে, সেসব খাবার এড়িয়ে চলা উচিত।
- রোজকার খাদ্যপঞ্জি মেনে চলার অভ্যাস থাকলে রোগী সহজেই বুঝতে পারবেন কবে কোন খাবারে তার সমস্যা হয়েছিল।
- এ ছাড়া মানসিক চাপ কমাতে হবে।
- প্রয়োজন হলে উপসর্গ বুঝে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কিছু ওষুধ দিতে পারেন।
- তবে আইবিএসের নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই আপনার নিজের হাতে।
- স্বাস্থ্যকর ও শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন যাপন করলে ভালো থাকবেন।

আইবিএস নিয়ে ভালো থাকার উপায়

- যেসব খাবারে পেটের সমস্যা বাড়ে, সেসব এড়িয়ে চলুন। দুধ, দুগ্ধজাত খাবার, শাক, অতিরিক্ত তেলেভাজা বা ডিপ ফ্রাই খাবার, অতিরিক্ত মসলাযুক্ত খাবার, বেকারি, কৃত্রিম চিনি, ক্যাফেইন ইত্যাদি এড়িয়ে চলা ভালো।
- নিয়মিত ব্যায়াম বা হাঁটাহাঁটির চেষ্টা করুন। এতে পেটের গ্যাস বা ফাঁপা ভাব কমবে।
- একসঙ্গে অনেক না খেয়ে সারা দিনে অল্প অল্প করে ভাগ করে খান।
- খাবারের টাইমটেবিল বজায় রাখুন।
- মানসিক চাপ বা স্ট্রেস কমাতে ব্যায়াম, যোগব্যায়াম, মেডিটেশন করতে পারেন।
- এর মধ্যে খাদ্যতালিকাগত পরিবর্তন, ওষুধ, প্রোবায়োটিক এবং কাউন্সেলিং অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
- খাদ্যতালিকাগত ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে দ্রবণীয় আঁশ গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি।
- ডায়রিয়া হলে ওরস্যালাইন ব্যবহার করা যেতে পারে, অন্যদিকে কোষ্ঠকাঠিন্যে সাহায্য করার জন্য ইসবগুলের ভুষি ব্যবহার করা যেতে পারে।
- এন্টিডিপ্রেসেন্টগুলো সামগ্রিক উপসর্গ উন্নত করতে পারে এবং ব্যথা কমাতে পারে।
- রোগীকে রোগ সম্পর্কে শিক্ষাদান এবং ডাক্তার-রোগীর একটি ভালো সম্পর্ক এই রোগের যত্নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
- দরকার হলে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ: প্রথম আলো ২৪ ডিসেম্বর ২০২০/ ইন্টারনেট॥ ❑

লেখক: ডাক্তার, কনসালটেন্ট - ফ্যামিলি মেডিসিন ও ডায়াবেট লজিস্ট

একটি মনোরম সন্ধ্যার মৃত্যু

খোকন কোড়ায়া

ফেব্রুয়ারির সন্ধ্যাটা বেশ সুন্দর। তেমন গরমও নেই, আবার তীব্র শীতও নেই, মিষ্টি একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। রাস্তায় বেশিরভাগ মানুষের গায়েই ফুলস্লিভ জামা। অবশ্য দু'একজন অতি সাবধানী মানুষ সোয়েটার পরে আছে এবং নিজেদের স্বাস্থ্যবান প্রমাণ করতে কিছু মানুষ পরে আছে হাফ হাতা শার্ট, টি শার্ট। আজ রাস্তাঘাটও কেমন ফাঁকা ফাঁকা। সব মিলিয়ে সন্ধ্যাটাকে মনোরম সন্ধ্যা বলা যেতেই পারে। জয়ন্ত হাঁটতে হাঁটতে তার কর্মস্থল মতিঝিল থেকে ফার্মগেট চলে এসেছে। অবশ্য প্রতিদিনই আসে। রাজ্যের জ্যাম ঠেলে বাসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আসার চেয়ে হেঁটে আসাটাই যুক্তিযুক্ত মনে হয় জয়ন্ত'র। তাতে পয়সা বাঁচে, সময়ও বাঁচে আবার শরীর চর্চাও হয়।

পঞ্চাশ বছর বয়সে একটি ভুল বিনিয়োগ করে ফেলেছে জয়ন্ত ডি'কস্তা। প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে নিজের লেখা একটি গল্প সংকলন প্রকাশ করেছে এবারের বই মেলায়। অবশ্য ভুল বিনিয়োগ ধারণাটি তার নিজের না, পরিবার ও বন্ধুদের। ফার্মগেট এসে একটি সমবায় সমিতির অফিসে ঢুকে যায় জয়ন্ত। সমিতির সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করে তাকে একটি বই উপহার দেয় এবং কিছু বই কেনার জন্য তার কাছে লিখিত আবেদন জানায়। আজকের সন্ধ্যাটি আসলেই অন্যরকম। ভদ্রলোক কিছু বই কিনতে রাজি হয়ে যান এবং জয়ন্তকে চা বিস্কুট খাওয়ান।

ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে সমিতির অফিস থেকে রাস্তায় নামে জয়ন্ত। ঠিক তখনই কোকিলের ডাকের মত সুললিত কণ্ঠ শুনতে পায়, জয়ন্তদা! পিছন ফিরে এক নজর তাকিয়েই চিনে ফেলে ও, মন্দিরা। এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সেও যে কোন পুরুষ মানুষকে ঘায়েল করার মত চোখ ধাঁধাঁনো রূপ যৌবন। ঘায়েল জয়ন্তও হয়েছিলো, তবে সেটা পঁচিশ বছর আগে। একটি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে মন্দিরার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো ওর। যাকে বলে প্রথম দেখায় প্রেম। টিএসসি, সংসদ ভবন, লেকের পাড়, রমনা পার্ক এবং বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে চললো ডেটিং। সম্পর্কটা কপোল, কপালে চুমু অবধি পৌঁছেছিলো, তখনই চালে ভুল করে ফেললো জয়ন্ত। ওর বন্ধু মনিপুরিপাড়ার চারতলা বাড়ির মালিকের ছেলে অপূর্ব'র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো মন্দিরার। ব্যস, নদীর গতিপথ বদলে গেলো। সেই সময় বিয়ের বাজারে বাড়িওয়ালার ছেলেদের অবস্থান অনেক উপরে। তাই দু'পক্ষের অভিভাবকদের সম্মতিতে বছর না ঘুরতেই বিয়ে হয়ে গেলো ওদের। মেনে নিতে খুব কষ্ট হয়েছিলো জয়ন্ত'র। অপূর্বকে মেরে ফেলবে এরকম ভাবনা মনে এলেও শেষ পর্যন্ত কিছুই করা হয়নি। শেষে জয়ন্ত ধরেই নিয়েছিলো জীবনের সব পরাজয় ওরই প্রাপ্য। মজার ব্যাপার হচ্ছে ওদের বিয়েতেও গিয়েছিলো জয়ন্ত এবং শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ উপন্যাসটি ওদের উপহার দিয়েছিলো। তবে এই বিশেষ উপহার পেয়ে অপূর্ব'র কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো তা জানতে পারেনি। এরপর বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে মন্দিরার সঙ্গে কয়েকবার দেখা হয়েছে ওর, কিন্তু মন্দিরা খুব একটা কাছে ঘেষেনি। আজ এতদিন পর মন্দিরার মায়াবী কণ্ঠে নিজের নাম শুনে সত্যি খুব অবাক হয় জয়ন্ত।

কেমন আছ জয়ন্তদা?

ভালো, তুমি?

- আমি খুব ভালো আছি।
- তাতো দেখতেই পাচ্ছি।
- কি বললে?
- না কিছু না, কোথায় যাচ্ছ?
- সমিতির অফিসে যাচ্ছিলাম। তুমি?
- আমি ওখান থেকেই এলাম।
- তুমিতো এখন বিখ্যাত মানুষ জয়ন্তদা। লেখক হিসেবে তোমাকে সবাই চেনে। শুনলাম তোমার একটি বইও নাকি বেরিয়েছে এবার।
- হ্যাঁ, এবারের বইমেলায় "গল্পকারের গল্প" নামে আমার একটি গল্পগ্রন্থ বেরিয়েছে।
- অপূর্ব কি বলে জানো? বলে, জয়ন্তকে বিয়ে করলেই ভালো করতে, বিখ্যাত মানুষের বউ হতে পারতে। আচ্ছা আমরা কি রাস্তায় দাঁড়িয়েই কথা বলবো? চল সামনে একটা ফাস্ট ফুডের দোকান আছে, ওখানে বসে কফি খাই আর কথা বলি।

ইচ্ছে না থাকলেও যেতে হয় জয়ন্ত'র। কফি খেতে খেতে প্রাসঙ্গিক দু'একটি কথা বলতে বলতে মন্দিরা হঠাৎ বলে, তোমার কাছে একটি জিনিস চাইবো, বল দেবে জয়ন্তদা! এবার একটু ভড়কে যায় জয়ন্ত, এত বছর পর তার কাছে কি চাইতে পারে মন্দিরা! চোখের দিকে তাকায় কিন্তু মন্দিরার চোখ ও পড়তে পারে না। শেষে নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলে, সাধ্যের মধ্যে হলে দেবো। মন্দিরার মুখটি আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। জয়ন্ত'র চশমার দিকে তাকিয়ে ও বলে - তোমার বই চাই আমি, বল দেবে? এবার হাসে জয়ন্ত, অবশ্যই দেবো।

- কবে দেবে? আমি কি তোমার বাসায় যাবো?
- এখনি দিচ্ছি, আমার ব্যাগেই আছে।
- ঠিক আছে, স্বাক্ষর দিতে হবে।

মন্দিরা ওর ব্যাগে কি যেন খুঁজতে থাকে। জয়ন্ত ঝোলা ব্যাগ থেকে ওর সদ্য প্রকাশিত "গল্পকারের গল্প" বইটি বের করে ভেতরের পাতায় লিখে, প্রিয়ভাজন অপূর্ব ও মন্দিরাকে অনেক শুভেচ্ছা। তারপর নিচের দিকে তারিখসহ নিজের নাম স্বাক্ষর করে দেয়। এরপর বইটি মন্দিরার দিকে এগিয়ে দিতে গেলে মন্দিরা অবাক হয়ে বলে, এটা কি?

- কেন, আমার বই, তুমি না চাইলে?
- তোমার গল্পের বই কে চেয়েছে? এ বই দিয়ে আমি কি করবো? আমি চেয়েছি তোমার সমিতির বই। লোন নেবো, আমার সিউরিটি দরকার। এই যে ফর্ম, এখানে সই করে দাও।

প্রথম যেদিন অপূর্ব'র হাত ধরে মন্দিরাকে হাঁটতে দেখেছিলো, সেদিনের কষ্টটা আবার অনুভব করে জয়ন্ত॥ ❑

লেখক: গল্পকার, ঢাকা

প্রকাশনার গৌরবময় ৮২ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

মায়ের চির বিদায়ের ১ম বছর

প্রয়াত ক্লারা রোজারিও (কেলি)

তিরিয়া ভক্তবাড়ী, নাগরী

জন্ম: ৭ জানুয়ারি, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৬ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

প্রিয় মা,

একটি বছর হলো তুমি আমাদের মাঝে নেই। তোমার শূন্যতার কথা ভাবতেই এ মন কেঁদে ওঠে বার বার। গত বছর ১৬ এপ্রিল ২০০১, আমাদের অনাথ করে তুমি চলে গেছো পিতার রাজ্যে অনন্ত শান্তিধামে। তোমার চির প্রস্থান এখনো মানতে পারিনা।

তাই তোমাকে খুঁজি কাজের মাঝে, খুঁজি সহজ-সরল কথার ভিড়ে। তোমার আদরমাখা সদালাপ আর মধুর ডাক এখনো শুনি হৃদয়ের গভীরে। তোমার কবরের ফুল সদা প্রস্ফুতিত তোমার মিষ্টি হাসির মতো। তোমার নিরলস ত্যাগ, নিষ্ঠা এবং ভালোবাসার প্রাচুর্যে গড়েছো আমাদের। তোমার আদর্শের মূল্যবোধে বড় হয়ে আজ আমরা সত্যিই গৌরবান্বিত। তোমার শিক্ষায় তাই সমাজে আমরা আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারি।

মাগো, আমাদের সবাইকে তুমি আশীর্বাদ করো এবং পরম পিতার কাছ হতে বিশেষ কৃপা এনে দাও, আমরা যেন তোমার জীবনাদর্শ অনুসরণ করে সুন্দর জীবন গড়তে পারি। তোমাকে অনেক ভালোবাসি মা, তোমাকে আমরা প্রতিনিয়তই মনে করি। মা, ঈশ্বর তোমাকে অনন্ত শান্তি দান করুন। পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার কাছে এই প্রার্থনা করি যেন একদিন পিতার রাজ্যে আমরা সবাই আবার তোমার সাথে পুনর্মিলিত হতে পারি। তুমি আছো, থাকবে আমাদের হৃদয়ের গহীনে মমতাময়ী মা হয়ে জন্ম জন্মান্তরে।

পরিবারের পক্ষে—
স্বামী: প্রয়াত জ্যোতি ভক্ত (স্বর্গবাসী)
ছেলে: দীপক, প্রয়াত দিলিপ (স্বর্গবাসী), রানা, রিপন
ছেলে-বৌ: সুজাতা, পরাগ, কনিকা
মেয়ে: ডলি, পারভীন
জামাতা: প্রয়াত খ্রীষ্টফার রড্রিক্স, (স্বর্গবাসী) বাদল রোজারিও
নাতী-নাতীন: জেনি, জেসমিন, জাস্টিন, মৌরিন, অনির্বাণ, অরিন, ঐশ ইথেন, অলিভার, দিয়া

প্রভুযিশুর পুণ্যময় পুনরুত্থান তথা পাস্কা পর্ব উপলক্ষে দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা-এর পক্ষ থেকে সকলের প্রতি রইল পুনরুত্থিত খ্রিস্টের আনন্দময় শুভেচ্ছা।

যে সমস্ত সেবা সমূহ থাকবে:

১. জরুরী বিভাগ
২. আউটডোর রোগী বিভাগ
৩. ICU/CCU/HDU/
৪. ডায়াগনস্টিক সেন্টার
* প্যাথলজি বিভাগ
* মাইক্রোবায়োলজি
৫. রেডিওলজি বিভাগ
৬. অস্ত্রোপচার পরিসেবা
৭. চিকিৎসা সেবা
* পুরুষ ওয়ার্ড
* মহিলা বিভাগ
* একক কেবিন
* ডাবল কেবিন
* ভিআইপি কেবিন
* প্রি ওটি
* পোস্ট OT
৮. স্ত্রীরোগ ও প্রসূতিবিদ্যা ইত্যাদি
৯. ফিজিওথেরাপি
১০. অনকোলজি
১১. শিশুরোগ
* নেফ্রোলজি
১২. ডায়ালাইসিস
১৩. গ্যাস্ট্রোলজি
১৪. বায়োমেডিকেল
১৫. নবজাতক
* এনআইসিইউ
* নবজাতক ওয়ার্ড

হাসপাতালের ঠিকানা: মঠবাড়ী, পোঃ উলুখোলা, ইউনিয়ন: নাগরী, থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা

৮ম মৃত্যুবার্ষিকী

" তোমার সমাধি ফুলে ফুলে ঢাকা
কে বলে আজ, তুমি নেই
তুমি আছ, মন বলে তাই "

প্রয়াত সিলভেস্টার গমেজ

জন্ম : ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৭ এপ্রিল, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
গোপাল মাস্বর বাড়ি
নতুন তুইতাল, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

প্রিয় পাপা/দাদা/নানু

আজ ২৭ এপ্রিল তোমার ৮ম মৃত্যুবার্ষিকী। প্রতি বছর এই দিনটিতে আমাদের মন অত্যন্ত দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। আবার ভালো লাগে কারণ আমরা বিশ্বাস করি তুমি পরম আনন্দে স্বর্গধামেই আছ। তোমার চলে যাওয়ার দিনটি ছিল রবিবার। আমরা খ্রিস্টযাগে ও প্রার্থনায় তোমাকে সর্বদা স্মরণ করি। পরম পিতার সান্নিধ্যে তুমি ভালো থেকো।

"হঠাৎ করেই বড় হয়ে গেছি
বাবা, তুমি কেমন আছো?
আর বলা হয়ে ওঠে না
বাবা, তুমি খেয়েছো?
এই প্রশ্ন আর করা হয়ে ওঠে না
বাবা, তোমার শরীর ঠিক আছে?
আর জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠে না।"

স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো, আমরা যেন সুন্দর জীবন-যাপন করতে এবং ভালো থাকতে পারি।

শোকার্ত

স্ত্রী : মনিকা গমেজ
বড় মেয়ে-জামাই : লিলি-প্রজেশ, ব্রেন
ছোট মেয়ে-জামাই : বেবী-অল, কৃপা, তীর্থ ও অর্ঘ্য
বড় ছেলে-বউ : ডা: জেমস-দীনা, উপাসনা, ফ্রাঙ্কলিন
ছোট ছেলে-বউ : রিচার্ড-সন্ধ্যা, ধ্রুব, মুক্তি

কাফরুল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর বর্তমান কার্যকরী পরিষদ
কার্যকাল : ২০২১ খ্রিস্টাব্দ - ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

রিচার্ড ভিনসেন্ট গমেজ
সভাপতি

পিটার তরুণ গমেজ
সহ-সভাপতি

রোনাল্ড সনি গমেজ
সম্পাদক

রিচার্ড পিন্টু রোজারিও
ম্যানেজার

জেন ভেরোনিকা গমেজ
কোষাধ্যক্ষ

বাপ্তি ষ্ট্যানলী গমেজ
পরিচালক

ইগ্নেসিয়াস ব্রাইট কস্তা
পরিচালক

অর্ণ্য মাইকেল রোজারিও
পরিচালক

মিঠু হালদার
পরিচালক

ক্রেডিট কমিটি

মৃন্ময়ী গ্রেস রোজারিও
চেয়ারম্যান, ক্রেডিট কমিটি

জেভলিন রিচার্ড গমেজ
সদস্য, ক্রেডিট কমিটি

ফ্রান্সিসকা ইভা গমেজ
সদস্য, ক্রেডিট কমিটি

সুপারভাইজরী কমিটি

হেলেন গমেজ
চেয়ারম্যান, সুপারভাইজরী কমিটি

জন স্টিফেন গমেজ
সদস্য, সুপারভাইজরী কমিটি

মজেস রঞ্জন গমেজ
সদস্য, সুপারভাইজরী কমিটি

পবিত্র খ্রিস্টযাগ

ডেভিড স্বপন রোজারিও

ছেলেবেলায় আমাদের জীবনটা ছিলো, নির্ভাবনাময়, খাও-দাও, ফূর্তি করে বেড়াও। পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে পাড়াময় ঘুরে বেড়ানো, বন্ধুদের নিয়ে চুটিয়ে আড্ডা, ফুটবল, হাডুডু, দাঁড়িয়াবান্দা, মার্বেল, লাট্টু ও ডাংগুলি ইত্যাদি খেলায় মেতে থাকতাম। আবার বর্ষাকালে, বড় খালের জোয়ারের ঘোলা জলে ডুব-সাঁতার খেলে, চোখ লাল করে বাড়ি ফিরতাম। সে সময়ে গ্রামে ক্রিকেট ও বাস্কেটবল খেলার প্রচলন ছিলো না বিধায় আমরা সে খেলা থেকে বঞ্চিত হয়েছি; কেবলমাত্র স্কুলের মধ্যেই ও দু'টো খেলার সুযোগ ছিলো।

বোনেরা স্কুল থেকে ফিরে মাকে রান্নাবান্নাসহ বিভিন্ন সাংসারিক কাজে সাহায্য করতো। তবে অবসর সময়ে লুডু, এক্কা-দোক্কা ইত্যাদি খেলা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তো।

বর্ষাকালে বা অন্যান্য সময়, অবসর মুহূর্তে বয়স্কদের কারো বাড়ির বারান্দায় বসে "তাস" খেলতে দেখা যেতো। বুড়া ও বুড়িদের তেমন কিছু করার ছিল না বারান্দায় বসে হুক্কা খাওয়া ও শীতে আইল্যায় আগুন পোহানো ছাড়া। তবে কেউ কেউ পানের বাঁটায় পান ছেঁচে, চিবুতে চিবুতে নাতি-নাতনীদের, রাজা-রাণী ও রাক্ষস-খোক্কসের গল্প শোনাতেন।

বর্ষা মৌসুমে শীতলক্ষ্যা নদীর ঘোলা পানি যখন আমাদের বাড়ির পাশের ছোট খাল-বড় খাল দিয়ে প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হয়ে বিলে গিয়ে প্রবেশ করতো, তখন বন্ধুরা মিলে সেই ঘোলাপানিতে ট্যাংরা, শিং, পুঁটি, বাইন ইত্যাদি মাছ বড়শি দিয়ে মারার যে কি আনন্দ হত তা বলে বুঝানো যাবে না। আবার যখন পানি পঁচে নদীতে ফেরার সময় ভেসে ওঠা বোয়াল, পুঁটি, নলা, শোল ইত্যাদি মাছ কোঁচ-টেঁটা-বর্শা দিয়ে গেঁথে তোলার আনন্দ আজও হৃদয় দিয়ে অনুভব করি। গ্রামের প্রতিটি বাড়ি মানুষে পরিপূর্ণ ছিল। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ঘুমন্ত গ্রাম জেগে উঠতো; মানুষ ও পশুপাখির হাঁকডাকে মুখরিত হয়ে উঠতো। আবার সূর্যাস্তের সাথে সাথে সমগ্র গ্রাম নিঝুম হয়ে পড়তো। বৈদ্যুতিক আলো ছিল না; হ্যারিকেন ও কুপিবাতির আলোতে রান্না-খাওয়া-দাওয়া ও পড়াশুনা চলতো। সন্ধ্যাঘন্টার পরপরই রোজারিমালা প্রার্থনার প্রস্তুতি চলতো। আর সেই শব্দ সারা পাড়াময় গুনগুনিয়ে উঠতো। এহেন আনন্দঘন পরিবেশের মাঝে আমাদের বাল্যজীবন কেটেছে।

আমাদের রাঙামাটিয়া মিশনের পুরাতন গির্জায় সে সময়ে কোন বসার ব্যবস্থা ছিল না। সিমেন্টের মেঝের উপর বসে, দাঁড়িয়ে, হাঁটু গেড়ে মিসা শুনতাম। কেবলমাত্র সিস্টারগণ বেতের মোড়ায় বসতেন। একধারে পুরুষ, অপরপাশে মহিলারা। হাঁটু দিয়ে থাকাটা খুবই কষ্টকর হলেও বসার উপায় ছিল না। সিস্টাররা কেউ দেখে ফেললে তিরস্কার শুনতে হতো। যখন হাইস্কুলে যাওয়া শুরু করলাম, টেডিপ্যান্ট পড়ার প্রচলন শুরু হয়ে গেছে। আমাদের সবাই 'টেডিবয়' বলতো। Teddy Boy-এর মানে হচ্ছে যে, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের উঠতি

বয়সী তরুণ যারা রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের কালের পোষাকের মতো জামাকাপড় পড়তো। অন্যের দেখাদেখি টেডিপ্যান্ট বানানোর হিড়িক পড়ে গেলো। আঁটসাঁট পোশাক-বিশেষ করে কোমড় থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত সাঁটা। হাঁটু দেয়া তো দূরের কথা, ওই প্যান্ট পড়ে বসাই যেতো না। দরজার বাইরে বন্ধুরা মিলে বেহায়ার মতো দাঁড়িয়ে মিসা শুনতাম। মাতব্বররা ভালো চোখে দেখতেন না, মাঝে মধ্যেই তীব্র বাক্যবাণে জর্জরিত করে তুলতেন। তারা টিটকারী দিয়ে বলতো, "কলিকাল" এসে গেছে। পরে যখন 'Bell Bottom' বাজারে এলো আমরা আবার লুফে নিলাম। (বেল বটম হচ্ছে- যে প্যান্টের নীচের অংশ খুব ঢোলা বা প্রশস্ত।) মানুষ আমাদের ঠাট্টা করে বলতো, "দেখ, দেখ, 'ঝাড়ুদার' যাচ্ছে।" অর্থাৎ চওড়া প্যান্টের হাওয়ায় রাস্তাঘাট পরিষ্কার করতে করতে যাচ্ছে। পরে অবশ্য কিছুদিনের মধ্যে আমরা আবার পুরানো স্টাইলে ফিরে এলাম।

প্রতিদিন ভোরের মিসার ঘন্টা পড়তো আধাঘন্টা পর পর। আমরা সবাই জানি, প্রথম ঘন্টা প্রস্তুতির জন্য, দ্বিতীয় ঘন্টা বাড়ি থেকে রওনা হওয়ার জন্য এবং তৃতীয় ঘন্টা মিসা শুরুর জন্য। খ্রিস্টভক্তদের সুবিধার্থে শীতে ও গ্রীষ্মকালে মিসার সময় কিছুটা অদল-বদল করে সাজানো হতো। সকাল সাতটায়, তাড়াহুড়া করে ঘুম থেকে উঠে, হাতমুখ ধুয়ে, সামান্য নাস্তা করেই স্কুলে ছুটতাম। বাড়ির মুরুব্বিদের অনেকের নিয়মিতভাবে মিসায় যাওয়ার একটা অভ্যাস ছিলো। পাড়ার অন্যান্য লোকদের সাথে ভোরের মিসায় তারা ছুটতেন।

আজকের মতো অবশ্য, রাস্তা-ঘাটের এতো উন্নতি হয়নি। গ্রামের প্রাচীন মানুষেরা, মিসায় যোগ দেওয়া একটি পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে মনে করতেন। মিসায় না যাওয়া পাপের সমতুল্য মনে করা হতো। শত বাধা-বিঘ্ন-ঝড়-তুফান-বৃষ্টি কোন প্রতিবন্ধকতাই এদের সহজে বিরত রাখতে পারতো না। বর্ষাকালে, নৌকা-কোন্দার সাহায্যে এবং বর্ষা শেষে যখন গালার পনি কেবল শুকাতে শুরু করতো, সেই কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথ বেয়ে হাঁটু সমান জল-কাদা উপেক্ষ করে মিসায় যোগদান করতেন। এক্ষেত্রে গির্জার আশেপাশের বাড়ির লোকদের সুযোগ ছিল একটু বেশী। যারা 'সেবক' হতো তাদের ঠিকমত মিসায় যেতে হতো। তা না হলে সিস্টারদের তিরস্কার কপালে জুটতো।

বলা-বাহুল্য, আমি অনেককে দেখেছি, তৃতীয় ঘন্টা পরার পরও মিসায় যোগদানের উদ্দেশ্যে মহা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে যাচ্ছেন। একটু চেষ্টা করলেই আমরা কিন্তু এ অভ্যাসটা ত্যাগ করতে পারি। আর মিসা চলাকালীন সময় গির্জাঘরে প্রবেশ করলে শুধু খ্রিস্টভক্তদের ধ্যান ভগ্ন হয় না, যে পুরোহিত বেদিতে দাঁড়িয়ে, মিসা উৎসর্গ করছেন তারও মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটে।

যদি আমরা মিসা শুরুর আগে আসি তখন আমরা মানসিক প্রস্তুতির সুযোগ পাই এবং প্রভু যিশুর কাছে আমাদের সকল দুঃখ-বেদনা, আবেদন-নিবেদন, নানা সমস্যা ও পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারি। প্রভু আমাদের সকল পাপ ও অযোগ্যতা ক্ষমার নিমিত্তে পবিত্র আত্মা পাঠিয়ে আমাদের পাপমোচন করে, আত্মশুদ্ধি করে, মিসায় অংশগ্রহণের নিমিত্তে যোগ্য করে তোলেন। ধর্ম ক্লাসে সিস্টারদের কাছে শুনেছিলাম যে, আমাদের কাঁধে দু'জন স্বর্গদূত থাকে। বাঁ দিকের দূত সর্বদা আমাদের কু-পরামর্শ দিয়ে, পাপের পথে নিয়ে যায়, আর ডান দিকের রক্ষকদূত আমাদের সর্বদা সৎ পরামর্শ দেয়। মিসায় যখন পুরোহিত সেবক-ডিকন পরিবেষ্টিত হয়ে শোভাযাত্রা সহকারে মিসা উৎসর্গের বেদির দিকে অগ্রসর হন, তখন উপস্থিত সকল খ্রিস্টভক্তদের পক্ষে তাদের নিজ নিজ রক্ষকদূতের নানা আবেদন নিবেদন

একটি থালার মধ্যে সাজিয়ে প্রভুর উদ্দেশে শোভাযাত্রার পিছনে পিছনে সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে যায়। যারা সে সময় মিসা শুরুর পর, গির্জায় প্রবেশ করে তাদের রক্ষকদূত লজ্জায় ব্যথিত চিত্তে অবনত মস্তকে খালি থালা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

মিসায় আমরা অনেকে দু'হাত আড়াআড়ি করে বা পকেটে দু'হাত পুরে দাঁড়াই। এতে প্রভু যিশুর প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা দেখানো হয় না। আমাদের উচিৎ নম্রচিত্তে দু'হাত জোড় করে দাঁড়ানো। আমরা ছোটবেলায় সিমেন্টে হাঁটু দিতাম কতো কষ্ট করে। আজ সেখানে আরামদায়ক কুশনের ব্যবস্থা হয়েছে হাঁটু দেওয়ার জন্য; তারপর যেখানে হাঁটু দেওয়া দরকার বা দাঁড়ানো দরকার, আমরা করি না। অনেক মানুষ টুপি মাথায় মিসায় অংশগ্রহণ করে যা মোটেই উচিৎ নয়। এতে প্রভুযিশুকে তাঁর যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হয় না।

মিসার পূর্বে নৈবেদ্য উৎসর্গের ব্যাপারে প্রভু যিশু বলেন, "মন্দিরে বেদীর কাছে নৈবেদ্য উৎসর্গ করার সময় যদি তোমার মনে পড়ে যে, তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভাইয়ের কোন অভিযোগ আছে, তবে বেদীর কাছে সেই নৈবেদ্য রেখে চলে যাও, আর প্রথমে ভাইয়ের সঙ্গে মিল করে নাও, পরে এসে তোমার নৈবেদ্য ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ কর। যদি কারোর সঙ্গে তোমার শত্রুতা থাকে, তবে দেরী না করে শিগগির তার সঙ্গে সব কিছু মীমাংসা করে নাও।"*(মথি ৫: ২৩-২৫)*

বিশ্বাস সহকারে প্রার্থনার ফলের বিষয়ে প্রভু যিশু বলেন- "আমার কথা শোন। তোমরা প্রার্থনায় যা কিছু চাও, বিশ্বাস করো তা পেয়েছো আর তোমরা তা পাবে। প্রার্থনার সময় কারো বিরুদ্ধে মনে রাগ রেখে প্রার্থনা করো না। প্রথমে তাদের ক্ষমা করো, তাহলে তোমার স্বর্গনিবাসী পিতা ঈশ্বরও তোমার পাপের ক্ষমা করবেন।" *(মার্ক ১১: ২৪-২৬ পদ)।*

খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণের পূর্বে যাজক মহোদয় যখন বলেন "এসো, আমরা পরস্পরকে খ্রিস্টের শান্তি প্রদান করি।" কিন্তু আমরা কি সঠিকভাবে পালন করি? বিভিন্ন হিংসার বশবর্তী হয়ে আমরা অন্তর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলি না "আপনার শান্তি হোক।" ঠায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকি। মিসার শেষে ফাদার বেদী ছেড়ে গেলেও স্বর্গদূতেরা শেষ গান শেষ না হওয়া পর্যন্ত হাঁটু দিয়ে থাকেন। কিন্তু আমরা গান অসমাপ্ত রেখেই বের হয়ে যাই। এতে কিছুটা হলেও মিসায় যোগদান অপূর্ণ থেকে যায়।

প্রাইমারী স্কুলে ধর্মক্লাসেই সিস্টারদের কাছে শিখেছিলাম- "খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করার সময় মাথা নত করে জোড় হাত করে লাইনে দাঁড়াবে। যখন ফাদার বলবেন- 'জীবনময় খাদ্য' তখন হাঁটু দিয়ে 'আমেন' বলে শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে জিহ্বায় গ্রহণ করবে।" তিনি বারবার সাবধান করে দিয়ে বলতেন- "মনে রেখো, ফাদার বেদীতে দাঁড়িয়ে 'রুটি ও দ্রাক্ষারস' ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করেন; তা স্রেফ রুটি ও দ্রাক্ষারস থাকে না। তা সত্যিকারভাবেই 'যিশুর দেহ ও রক্তে' পরিণত হয়। আর তুমি তা গ্রহণ করতে যাচ্ছো; কল্পনা করতে পারো? কতটুকু তোমাকে নিবেদিত হতে হবে, প্রভু যিশুর জীবনময় খাদ্য গ্রহণের জন্য!"

প্রভু যিশু তার প্রিয় শিষ্যদের বললেন, "আমি সত্যিই বলছি, মোজেস তাদের স্বর্গ থেকে স্বর্গ খাদ্য দেননি; কিন্তু আমার পিতাই স্বর্গ থেকে তোমাদের প্রকৃত খাদ্য দেন। সেই প্রকৃত খাদ্য হচ্ছে, এক ব্যক্তি যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন ও তিনিই এই জগতে জীবন দেন।"

শিষ্যেরা বললেন, "গুরুদেব, চিরকাল সেই খাদ্যই আমাদের দেন।"

প্রভু যিশু বললেন, "আমিই জীবনময় খাদ্য। যে আমার কাছে আসে, সে আর কখনো ক্ষুধিত হবে না। যারা আমাকে বিশ্বাস করে তারা কখনো তৃষিত হবে না।" *(যোহন ৬: ৩৪-৩৫ পদ)*

প্রভু যিশু পুনরায় বলেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা যদি মানবপুত্রের মাংস, আহার ও তাঁর রক্ত পান না করো, তবে তোমাদের মধ্যে শাশ্বত জীবন নেই।

কিন্তু যে আমার আহার ও আমার রক্ত পান করে, সে শাশ্বত জীবনের অধিকারী হয়েছে, আর আমিই শেষ দিকে তাকে পুনরুত্থিত করবো। কারণ আমার মাংস প্রকৃত খাদ্য আর আমার রক্তই প্রকৃত পানীয়। যে কেউ আমার মাংস আহার ও আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে আছে এবং আমি তার অন্তরে আছি *(যোহন ৬: ৫৩-৫৬ পদ)।"*

পবিত্র কমিউনিয়ন উৎসর্গ ও গ্রহণের উপর স্থানীয় ফাদার মিসায় একদিন অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তার বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "যিশুর 'দেহ ও রক্ত' উৎসর্গ কেবলমাত্র একটি আক্ষরিক অনুষ্ঠান নয় বা নিয়ম রক্ষা নয়; বরং সম্পূর্ণ আন্তরিক। এর গুরুত্ব অপরিসীম।" ফাদার যখন রুটি ও দ্রাক্ষারস বেদীতে উৎসর্গ করেন তখন স্বয়ং মা মারিয়া সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তা পর্যবেক্ষণ করেন। সেই মুহূর্তে স্বর্গ উন্মুক্ত হয়ে কপোতের ন্যায় আশীর্বাদ ঝরে পড়ে। তাই সমস্ত হৃদয়-মন উজাড় করে, ভক্তিভরে অবনত মস্তকে তা গ্রহণ করতে হবে। কারণ সে সময়ে প্রভু যিশুর উপলক্ষে ভোজ রুটি ও দ্রাক্ষারস প্রকৃতভাবেই তাঁর দেহ ও রক্তে পরিণত হয়। উপদেশ যখন শুনছিলাম তখন দেহ ও মনে এক অদ্ভূত শিহরণ অনুভব করছিলাম। তিনি আরো বলেন,"প্রভু যিশুখ্রিস্ট পবিত্র খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে খ্রিস্টপ্রসাদ হিসেবে স্বর্গ থেকে এ পৃথিবীতে নেমে আসেন এবং পুরোহিতের হাত দিয়ে আমরা আধ্যাত্মিকভাবে সে খাদ্য গ্রহণ করি। বিভিন্ন কারণে আমরা খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণে অনিয়মিত হয়ে পড়ি; এমনকি যথাযথ শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শনে ব্যর্থ হই। পটাপট পুরোহিতের হাত থেকে নিয়ে মুখে পুড়ে চলে যাই। খ্রিস্টপ্রসাদ নিয়মিত গ্রহণের মাধ্যমে আমাদের জীবন প্রেমময় ও আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে। "ইহা দেয়া হয়েছে এজন্য যেন সমগ্র পৃথিবীর খ্রিস্টভক্ত ভাইবোনেরা খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণের মাধ্যমে হৃদয়ে এক অলৌকিক শক্তি, অনন্ত প্রেম ও স্বর্গের শ্বাশত আনন্দ ও শান্তি লাভ করতে পারি।"

অনেক সময় "Eucharist Minister" এর হাত থেকে খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করি না, ভাবি ফাদারের কাছ থেকেই তা নেয়া শ্রেয়। তারা পানপাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। পরে অবশ্য আমি আমার ভুল বুঝতে পেরে মনোভাব পাল্টিয়ে ভাবি, আমিতো যিশুর দেহ ও রক্ত পান করছি; কার হাত থেকে নিলাম সেটা বড় কথা নয়। কারণ তিনি যখন প্রভু যিশুর দেহ ও রক্ত আমাদের মাঝে বিতরণ করেন তখন পবিত্র আত্মা সেই হাতে এসে ভর করেন। এসব বিষয়ে যখন একান্তে গভীরভাবে ভাবতে বসি তখন সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে আবার সবকিছু সুন্দরভাবে পালন করার প্রতিজ্ঞা করি। যেমন- নিয়মিতভাবে মিসায় যাওয়া, মিসা শুরু হওয়ার আগে যাওয়া, যেখানে যেমন হাঁটু ও হাত জোড় করা- অবনত মস্তকে ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ ও মিসার শেষ গান অবধি গির্জায় অবস্থান করা ইত্যাদি। বলাবাহুল্য, কোভিড-১৯ সারাবিশ্বের মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। এ মহামারির কবলে পড়ে সাধারণ মানুষসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের টপাটপ মৃত্যু, হৃদয়ে মারাত্মক আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষ স্মরণ করছে, নোহের জলপ্লাবন ও সদম-গোমরার ভয়াবহ ধ্বংসের কথা। ফলে প্রতিটি মানুষকে আধ্যাত্মিকভাবে এক কেন্দ্রবিন্দুতে এনে দাঁড় করিয়েছে। ঈশ্বর ভক্তি-বিশ্বাস-শ্রদ্ধা-ভালবাসায় বলীয়ান করে তুলেছে। সবাইকে যার যার ধর্মবিশ্বাসে প্রার্থনামুখী করে তুলেছে। তাইতো, এই মহামারির মাঝে অগণিত মৃত্যুর মিছিল, হাহাকার ও মানুষের ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখে তাদের বিশ্বাসকে আরো সুদৃঢ় করেছে। আজ পরম বিশ্বাস ও ভরসার স্থল হলো- প্রভু যিশুর ক্রুশ ও তাঁর পদতল। সবার মনে একই আকুল প্রার্থনা-

"ক্রুশের কাছে রাখ হে, যিশু নিত্য আমায়,
বহুমূল্যে স্বাস্থ্যকর স্রোত বহে তথায়।
ক্রুশেতে ক্রুশেতে শ্লাঘার বিষয় আমার,
তারি গুণে নির্ভয়ে যাব নদীর ওপার।"

এটা নিশ্চিত, কোনরকম আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি ছাড়া খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করলে তা আক্ষরিক অর্থে গতানুগতিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়ে যায়। কিন্তু প্রস্তুতি থাকলে তা হবে আনন্দময়-আন্তরিক অনুষ্ঠান॥ ❑

লেখক: সমবায়ী ও সমাজ সংগঠক, আমেরিকা

আমি আজ অনুতপ্ত

দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ

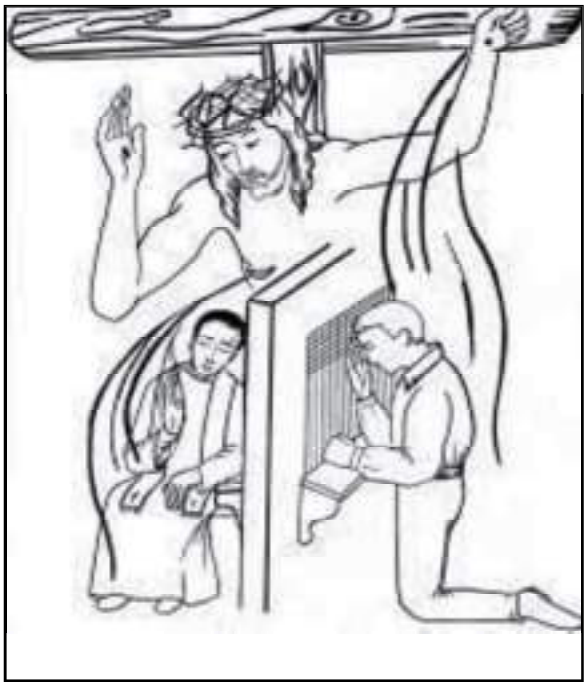

"প্রান্ত অঞ্জলীর দু'হাত ধরে একদম শিশুর মতো কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো, অঞ্জলী, রাত পোহালেই আগামীকাল যিশুর পুনরুত্থান পার্বণ অর্থাৎ পাস্কা পার্বণ, তুমি আমাকে ক্ষমা করবে না? আমি তো তোমার সাথে অনেক অন্যায় ও খারাপ ব্যবহার করে তোমাকে দূরে সরে রেখেছিলাম, আমি আজ অনুতপ্ত, তুমি ক্ষমা করো, চলো আমাদের বাড়ীতে, আগামীকাল আমরা একসাথে ইস্টার সানডে পালন করবো।"

গ্রামের নাম যোসেফপাড়া। ছোট একটা বিলের পাশে বাংলার সীমাহীন সবুজ প্রকৃতির মধ্যে গড়ে উঠল ছোট গ্রাম। গ্রামের মানুষগুলোও প্রকৃতির মতো অতি সহজ সরল জীবন যাপনে অভ্যস্থ সেই গ্রামে প্রান্ত ও অঞ্জলীর বাড়ী। প্রান্ত ও অঞ্জলী মাত্র তিন বছরের ছোট বড়। শিশু শ্রেণি হতে একসাথে স্কুলে যাওয়া-আসা; খেলাধূলা, বেড়ানো তাদের নিত্য রুটিন। হাইস্কুলে ও পাশাপাশি স্কুলে অধ্যয়ন। অতএব এভাবে চলতে চলতে একে অপরকে প্রথমে ভালোলাগা হতে ভালবাসায় পরিণত হয়। মাষ্টারস্ পাশ করে প্রান্ত একটা বাইয়িং হাউজে চীফ একাউটেন্ট-এর কাজ পেয়ে যায় আর তখন অঞ্জলী অনার্সে অধ্যয়নরত। অতঃপর প্রান্ত অঞ্জলীর গলায় মালা ও কপালে সিঁদুর পড়ায়ে গির্জায় পবিত্র বিবাহ সাক্রামেন্ত গ্রহণের মাধ্যমে অঞ্জলীকে চিরকালের জন্য স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে অনেক ঘটা করে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে। বিয়ের পর ওরা হানিমুনে যায় বান্দরবানে আঁকাবাকা পাহাড়ের রিসোর্টে। পূর্বকথানুসারে বিয়ের পর অঞ্জলীকে গ্রামের বাড়ীতে রেখে প্রান্ত শহরে চলে আসে কাজে যোগ দিতে। সে প্রতি সপ্তাহে দুই দিনের ছুটিতে বাড়ী যায়। এভাবে নতুন সংসার জীবন চলতে থাকে। সাজানো গুছানো সংসার জীবন এক বছর পূর্তি খুব ঘটা করে পালন হলো। তারপর প্রান্ত মা-বাবার সাথে বসে সিদ্ধান্ত নিল সে অঞ্জলীকে শহরে নিয়ে থাকবে। এতে মা-বাবাও খুশী হলেন। ঢাকা শহরে ফার্মগেইটে দুই টুনাটুনির নতুন সংসার। প্রান্তর চাকুরী বেশ ভাল হওয়ায় খুব সহজে সংসার গোছানো হলো। এরপর মাসে একবার তারা গ্রামের বাড়ীতে মা-বাবাকে দেখতে যায় ও ছুটির দিন আনন্দে কাটায়।

কিন্তু ছয়মাস পার হতেই প্রান্ত কেমন যেন পরিবর্তন হয়ে গেল। সে মাঝে মধ্যে বিশেষ করে প্রতি সপ্তাহের ছুটির দিনের পূর্বে মদ পান করে প্রচণ্ড নেশা অবস্থায় বাসায় ফিরছে এবং হাতে সিগারেট। অথচ এর পূর্বে সে সাদা ডাল ভাত ছাড়া কিছু মুখে দিতে অভ্যস্থ ছিল না। এটা দেখে অঞ্জলী ভীষণ কষ্ট পায় এবং সে তার ভালোবাসার মানুষকে হাতে পায়ে ধরে অনুরোধ করে সে যেন মদ ত্যাগ করে। কে কার কথা শোনে। কারণ প্রান্তর টাকার অভাব নেই। টাকার নেশায় সে তার কথা রাখে না। দিনের পর দিন অর্থাৎ প্রায় প্রতিদিন সে মদ পান করে গভীর রাতে বাসায় ফিরে। এতে কিছু বললে সে অঞ্জলীকে খারাপ ভাষায় বকা হতে গায়ে হাত তুলতেও বাধসাধে নি। দিনের পর দিন অঞ্জলীর বোবা কান্নার শব্দ প্রান্ত না শোনায় এক বিকেলে একটি চিরকুট লিখে প্রান্তকে তারপর চলে যায়।

আমার প্রান্ত,

তোমাকে আমি নিজের চেয়ে বেশী ভালোবাসি। কিন্তু সে ভালোবাসার মূল্য দিলে না। আমি শুধু তোমার জীবন পরিবর্তনের জন্য আমার বাবার বাড়ী চলে যাচ্ছি। তোমাকে রেখে খুব কষ্ট হচ্ছে। তুমি যে দিন মদপান ত্যাগ করে সুস্থ অবস্থায় আমাকে নিতে আসবে সেদিন আমি তোমার কাছে ফিরবো। তুমি ভালো থেকো।

ইতি

তোমার ভালোবাসা

অঞ্জলী

গভীর রাতে প্রান্ত নেশা অবস্থায় বাসায় ফিরে চিরকুট পায়। সে ভাবে হয়তো ক্ষণিকের রাগ করে অঞ্জলী বাপের বাড়ী গেছে নিশ্চয় ৫/৭ দিন পর ফিরে আসবে। এভাবে সপ্তাহ, মাস করে ৬ মাস পার হলেও অঞ্জলী আর ফিরে আসে না। প্রান্তর জীবনে শুরু হয় নিত্য দিনের কষ্ট। বাড়ী হতে মা-বাবার চাপ, সে সাথে নিজের বিবেক যেন বারবার তাকে দংশন করছে। প্রায়শ্চিত্তকালের এক শুক্রবার সকালে প্রান্ত গির্জায় ক্রুশের পথ করতে যায়। ক্রুশের পথের পর স্থানীয় ফাদারের সাথে সে তার জীবনের সব ঘটনা সহভাগিতা করে ও তার সকল অপরাধের জন্য ফাদারের কাছে পাপস্বীকার করে। ফাদার প্রান্তকে বলল, আর দেরী নয় তুমি তোমার অঞ্জলীর কাছে যাও এবং ক্ষমা নিয়ে তাকে তোমার ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে এসো এবং পাস্কাপার্বণ একসাথে করো।

আজ পুণ্য শনিবার। সন্ধ্যেবেলা গির্জা শেষ করে প্রান্ত চলে যায় অঞ্জলীদের বাড়ীতে। তখন অঞ্জলী তার মার সাথে রান্নার কাজে ব্যস্ত। প্রান্ত শাশুড়ী মাকে প্রণাম জানিয়ে শুধু বলল অঞ্জলী তুমি একটু তোমার ঘরে এসো। তোমার সাথে কথা বলবো। অঞ্জলীর মা তাকে যেতে বললো। শোফায় পাশাপাশি বসে আছ প্রান্ত ও অঞ্জলী। প্রান্ত অঞ্জলীর দু'হাত ধরে একদম শিশুর মতো কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো, অঞ্জলী, রাত পোহালেই আগামীকাল যিশুর পুনরুত্থান পার্বণ অর্থাৎ পাস্কা পার্বণ, তুমি আমাকে ক্ষমা করবে না? আমি তো তোমার সাথে অনেক অন্যায় ও খারাপ ব্যবহার করে তোমাকে দূরে সরে রেখেছিলাম, আমি আজ অনুতপ্ত তুমি ক্ষমা করো চলো আমাদের বাড়ীতে, আগামীকাল আমরা একসাথে ইষ্টার সানডে পালন করবো।

অঞ্জলী চোখের জল মুছে ব্যাগ গুছিয়ে মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রান্তর সাথে রওনা হলো। অঞ্জলীকে কাছে পেয়ে প্রান্তর বাড়ীতে আনন্দের বন্যা আজ ইস্টার সানডে। অঞ্জলী খুব ভোরে সব কাজ সেরে শ্বশুর-শাশুড়ীকে নতুন কাপড় পরিয়ে এবং প্রান্ত ও নিজে প্রস্তুত হয়ে গির্জার পথে একটা অটোতে চড়ে বসলেন পুনরুত্থান পার্বণের খ্রিস্টযাগে অংশ নিতে॥ ❑

লেখক: কবি ও অভিনেতা, ঢাকা

এক টুকরো জমি

প্রদীপ মার্সেল রোজারিও

নতুন ভূমি কর্মকর্তা কাজে যোগদানের পর জেলা ভূমি অফিসের চেহারা পাল্টে গেছে। ঘুষ-দুর্নীতি বন্ধ। দালাল শ্রেণির লোকজনের আনা-গোনা বন্ধ। কোন রকম হয়রাণী ছাড়াই মানুষ কাঙ্ক্ষিত সেবা পাচ্ছে। ইচ্ছা থাকলে দীর্ঘদিন যাবৎ নেতিবাচক ভাবমূর্তি নিয়ে পরিচালিত হওয়া একটি প্রতিষ্ঠানের খোল-নলচেও যে পাল্টে দেয়া যায় তা নতুন ভূমি কর্মকতা তাপস সেন তাঁর কাজের মাধ্যমে দেখিয়ে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত।

জেলার মানুষের মুখে মুখে এখন তাপস সেনের নাম। তাপস সেনের প্রশংসায় সকলে পঞ্চমুখ। জেলার গণমাধ্যমগুলো তাপস সেনের কাজের ধরণ এবং জেলা ভূমি অফিস নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করছে প্রতিনিয়ত। দীর্ঘদিনের জঞ্জাল সরিয়ে সততা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহীতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে মানুষের কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদান করা মোটেও সহজ কাজ নয়। এ এক কঠিন লড়াই। প্রবল স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটার মতো। কিন্তু তাপস সেন পারছে। কিভাবে পারছে?

জীবন-চলার পথে কোন ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণে অনুপ্রাণিত হওয়ার পিছনে কোন না কোন ঘটনা নিয়ামক হিসাবে কাজ করে। তা দুঃখেরও হতে পারে আবার সুখেরও হতে পারে। তাপস সেনের জীবনেও এমন অনেক ঘটনা আছে। এ ঘটনাগুলোর মাঝে ছোট বেলায় ঘটে যাওয়া একটি অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা তাপস সেনের হৃদয়ে একটু বেশীই দাগ কেটেছিলো। ছোট-বেলায় ঘটে যাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত দুঃখের ঘটনাটি তাপস সেনকে সাহায্য করেছে আজকের তাপস সেন হতে।

তাপস সেনের বয়স তখন এগারো। পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। ক্লাশের প্রথম স্থানটি বরাবরই তার দখলে। বাবা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। এক বাজার থেকে সবজি কিনে অন্য বাজারে বিক্রি করেন। আয় যৎসামান্য। দিন-আনি-দিন-খাই অবস্থায় সংসার চলে। যদিও এটাকে চলা বলে না। একদিন সন্ধ্যায় হাট থেকে এসে বাবা অসুস্থতা বোধ করেন। সদা-ব্যস্ত এবং করিৎ-কর্মা মানুষটির স্থান হয় বিছানা। ডাক্তার বলেছেন, চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা প্রয়োজন। সংসারের একমাত্র উপার্জন করা ব্যক্তিটির অসুস্থ্যতার কারণে মা'র দিশেহারা অবস্থা। তাপস সেন স্কুল থেকে ফিরে মন খারাপ করে ইতি-উতি ঘুরাঘুরি করে। আশে-পাশের বাড়ির তাপস সেনের বয়সী ছেলে-মেয়েরা খেলা-ধুলা করে, বিভিন্ন রকম আনন্দ করে, হৈ-হুল্লোর করে। তাপস সেনকে ডাকে না। এমনকি গ্রামের কোন বিয়ে অথবা অন্য কোন অনুষ্ঠানে তাপস সেনদের দাওয়াত দেয় হয় না কারণ তাপস সেনদের পরিবারের আর্থিক অবস্থার সূচক দাওয়াত পাওয়ার যে মাপ-কাঠি নির্ধারণ করা আছে তা ছুঁতে পারেনি।

তাপস সেনের মেঝো জ্যাঠা শিক্ষকতা করেন। এলাকায় খুবই প্রভাবশালী। প্রভাব-প্রতিপত্তি কাজে লাগিয়ে অঢেল অর্থ-বিত্তের মালিক হয়েছেন। মা মেঝো জ্যাঠার নিকট যান সাহায্যের জন্য। মা'র নিকট সব শুনে মেঝো জ্যাঠা বলেন-আমি শুনেছি দীপক অসুস্থ্য। ব্যস্ততার কারণে দেখতে যেতে পারিনি। ও'র চিকিৎসায় অনেক টাকা প্রয়োজন তা আমি ডাক্তারের সাথে আলাপ করে জেনেছি। আমি কাগজ প্রস্তুত করে রেখেছি। তুমি দীপকের স্বাক্ষর নিয়ে এসো, আমি টাকা দিবো। এ টাকা দিয়ে দীপকের চিকিৎসাসহ তোমাদের সংসারের খরচও চলবে বেশ কিছুদিন। তবে তোমাদের উত্তর দিকের বিলের জমিটা আপাততঃ আমি চাষাবাদ করবো। দীপক সুস্থ হয়ে টাকা পরিশোধ করলে আমি জমি ফেরৎ দিবো। ছোট ভাই অসুস্থ এটা না করলেও পারতাম, তাই না? কিন্তু দেখতেই পাচ্ছো, যা দিনকাল পড়েছে। কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। মেঝো জ্যাঠা ঘর থেকে একটি কাগজ এনে মা'র হাতে দেয়। মা কিছু বলতে গেলে জ্যাঠা মা'কে থামিয়ে দিয়ে বলেন-এখন কথা বলার সময় নয়। দীপকের সুস্থ হয়ে ওঠাই বড় কথা। তাড়াতাড়ি যাও কাগজে স্বাক্ষর নিয়ে এসো। আমার স্কুলে আজ শহর থেকে বড় অফিসার আসবে। আমার অনেক দায়িত্ব। আমাকে তাড়াতাড়ি স্কুলে যেতে হবে।

দীর্ঘ ছয় মাস অসুস্থ্যতার সাথে লড়াই করে তাপস সেনের বাবা সুস্থ হয়ে ওঠেন। সুস্থ হওয়ার পর মেঝো জ্যাঠার নিকট জমি বন্ধক রেখে টাকা নিয়ে চিকিৎসার করানোর কথা বাবা মা'র নিকট থেকে শোনেন। সংসার চালানোর চিন্তার পাশাপাশি বাবার মাথায় বাড়তি চিন্তা যোগ হয় । যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বন্ধকের টাকা পরিশোধ করতে হবে। এই এক টুকরো জমিই তো তার সম্বল। একদিন সকালে বাবা নাস্তা খেয়ে জমিটি দেখতে উত্তরের বিলে যান। জমিটিতে মেঝো জ্যাঠা সবজির চাষ করেছে। দু'জন দিন-মজুর জমিতে কাজ করছে।

বাবা দিন-মজুরদের উদ্দেশে বলেন, আশা করছি শীঘ্রই আমি বন্ধকের টাকা পরিশোধ করে মেঝো দাদার নিকট থেকে জমিটি ছাড়াতে পারবো। সবজি ওঠার পর এ জমিতে আমি ধান লাগাবো। জমি প্রস্তুত এবং ধান লাগানোর কাজ কিন্তু তোমরাই করবে।

বাবার কথা শুনে দিন-মজুররা অবাক হয়। একজন দিন-মজুর বাবাকে জিজ্ঞেস করে, আপনি এ জমি আপনার মেঝো দাদার নিকট বিক্রি করেননি? তা না হলে বলছেন কেন, সবজি ওঠার পর আপনি এ জমিতে ধান চাষ করবেন?

না, বিক্রি করিনি। জমিটি বন্ধক রেখে চিকিৎসার জন্য ভাইজানের নিকট থেকে টাকা নিয়েছিলাম। এ মাসের মধ্যেই আমি টাকা পরিশোধ করবো। টাকা পরিশোধ করলেই তো জমিটি পুনরায় আমার হয়ে যাবে। জানোই তো এই এক টুকরো জমিই আমার সম্বল। একটানা কথা বলে বাবা থামেন।

না কাকা, আপনি বোধ হয় ভুল বলছেন। আমরা শুনেছি, এ জমি আর আপনার নেই। আপনি অসুস্থ থাকার সময় আপনার মেঝো দাদা আপনার নিকট থেকে জমিটি সাফ-কাওলা করে নিয়েছেন। আপনি সরল-সহজ মানুষ, ভালোভাবে খোঁজ নিয়ে দেখেন, কাকা।

বাবা বাড়ি ফিরে সরাসরি মেঝো জ্যাঠার নিকট যান। মেঝো জ্যাঠা বাড়িতেই ছিলেন। বাবা মেঝো জ্যাঠাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি নাকি আমার জমিটা সাফ-কাওলা করে নিয়েছো? দাদা, তুমি অন্যদের সাথে সারা-জীবন প্রতারণা করেছো। অনেক মানুষের মনে দুঃখ দিয়েছো। অনেক মানুষকে নিঃস্ব করেছো। শেষ পর্যন্ত ছোট ভাইটিকেও ছাড়লে না? ছোট ভাইটির অসুস্থতার সুযোগে তার সাথেও প্রতারণা করলে?

মেঝো জ্যাঠা অবাক হওয়ার ভান করে বলেন, সাফ-কাওলা করে নিয়েছি মানে? তুই না দিলে আমি কিভাবে সাফ-কাওলা করে নিবো? তুই-ই-তো কাগজ-পত্রে স্বাক্ষর করে দিলি। তোর অসুস্থতার সময় আমার টাকা-পয়সার টানাটানি সত্ত্বেও আমি তোকে টাকা দিয়ে সাহায্য করেছি। আমার কারণেই তুই তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠতে পারলি। আমি ছাড়া এ গ্রামে আর কে আছে নগদ টাকা দিয়ে জমি ক্রয় করতে পারে? সামান্য কৃতজ্ঞতাবোধও নেই তোর মধ্যে? বাবা বুঝতে পারেন এ লোভী এবং পাষাণ-হৃদয় লোকটির সাথে তর্ক করে কোন লাভ হবে না।

একমাত্র সম্বল জমিটি হারিয়ে সাগর-সমান দুঃখ হৃদয়ে ধারণ করে বাবা বাড়ি ফিরে আসেন। ধীর পায়ে হেঁটে বাড়ির দক্ষিণ দিকের আম গাছের নীচে দাঁড়িয়ে উদাস দৃষ্টিতে দিগন্ত বিস্তৃত ধান-ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ছোট্ট তাপস সেন বাবার নিকট যায়। বাবা তাপস সেনকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। বাবার চোখ থেকে কষ্ট মিশ্রিত উষ্ণ অশ্রু তাপস সেনের উদ্যোম-শরীরে পড়তে থাকে ফোঁটায় ফোঁটায়॥ ❑

লেখক: গল্পকার ও লেখক, ঢাকা

অফুরান যে মায়ের ভালবাসা

শিউলী রোজলিন পালমা

আমি চোখের চিকিৎসার জন্য ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালে গেলে আমাদের গ্রামের মায়া পেরেরা দিদির সাথে দেখা হয়। দিদি দীর্ঘদিন যাবত এ হাসপাতালে সেবিকা হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন আমার ননদের শাশুড়ি কেমন আছেন? আমি বললাম, ভাল। তিনি বললেন উনার চোখের অপারেশনের সময় আমি যতটা সম্ভব সহযোগিতা করেছি কারণ উনি আমাকে সব সময় বিশেষভাবে ভালবাসেন।

এই যে বিশেষভাবে ভালবাসা দিয়ে গেছেন যে মা তার নাম বিবিয়ানা তেরেজা কস্তা। তিনি ছিলেন তুমিলিয়া মিশনের দক্ষিণ ভাদার্তী গ্রামের মেয়ে এবং পূর্ব ভাদার্তী গ্রামের স্বনামধন্য শিক্ষক মতি পেরেরার (মতি মাস্টার) স্ত্রী। আমার ঠাকুরমার দিক থেকে তিনি আমার পিসিমা ছিলেন, আবার আমার বাবা মা তার বড় ছেলের ধর্ম পিতামাতা ছিলেন বলে সেদিক থেকেও আত্মীয় ছিলেন। পরবর্তীতে উনার চতুর্থ ছেলে প্রদীপ পেরেরার সাথে আমার ননদ শিউলী ক্লারার বিয়ে হলে তিনি আমার মাঐ হন এবং আমি পুরানো পিসিমা সম্বোধন ছেড়ে নতুন মাঐ সম্বোধনে ডাকা শুরু করি। প্রায় ২৯ বছর পূর্বে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রদীপ-শিউলীর বিয়ের পর থেকে আমি মাঐকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাই। প্রথম থেকেই অনুভব করি মাঐ-এর আন্তরিকতা। আত্মীয়তার কারণে ঘন ঘন যাওয়া আসা ও দেখা সাক্ষাৎ হত। দেখা হলেই খুশী হতেন, অনেক আন্তরিকতা নিয়ে কথা বলতেন এবং সবার খোঁজ খবর নিতেন। আমার ভাই-বোন, ভাগিনা-ভাগিনি, ভাইস্তা, পিসি, মাসি, মামা মামি, পিসাতো, মেসোতো, মামাতো ভাইবোন কে কোথায় আছে, কেমন আছে সবই জানতে চাইতেন। তিনি নানাভাবেই সবাইকে চিনতেন, সবার কথা মনে রাখতেন এবং খোঁজ নিতেন। তার আলাপচারিতায় হৃদয়ে এমনই একটা অনুভূতির সৃষ্টি হত, মনে হত তিনি আমাকে অন্য সবার চেয়ে বেশী ভালবাসেন।

১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে মাঐকে যখন কাছ থেকে দেখা শুরু করি তখন তার বয়স ৬৮ বছর (১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে মাঐ-এর জন্ম) তখন তিনি তার পারিবারিক জীবনের সকল দায়িত্ব সম্পন্ন করে অনেকটা নির্ভার জীবনে আছেন। আমাদের তালঐ আমার ননদের বিয়ের বেশ আগেই মারা যান। তালঐ মাঐ-এর সাত সন্তান, পাঁচ ছেলে ও দুই মেয়ে। বড় ছেলে সুশীল পেরেরা, মেজ ছেলে প্রভাত পেরেরা ও চতুর্থ ছেলে প্রদীপ পেরেরার তিনি বিয়ে দিয়েছেন, বাকী চারজনকে দিয়েছেন ঈশ্বরের নামে। যাদেরকে ঈশ্বরের নামে দিয়েছেন তারা হলেন সিস্টার মেরী অনিতা এসএমআরএ, সিস্টার মেরী শিখা এসএমআরএ রেভা ফাদার পরিমল পেরেরা সিএসসি এবং ব্রাদার লিও পেরেরা সিএসসি। কতটা উদারতা, ঈশ্বর নির্ভরতা ও যিশুখ্রিস্টের প্রতি ভালবাসা থাকলে বেশিরভাগ সন্তানকে ঈশ্বরের নামে দেয়া যায় সেটা আমার পক্ষে উপলব্ধি করা একদমই অসম্ভব কারণ আমার তিন সন্তানের একজনকেও আমি ঈশ্বরের নামে দেইনি।

যখন তিনি অনেকটা নির্ভার জীবনে আছেন

লেখিকার ছোট মেয়ের গায়ে হলুদে আশীর্বাদরত বিবিয়ানা তেরেজা কস্তা

তখন প্রদীপ-শিউলীর বড় ছেলে শোভনের জন্ম হয়। ছেলে ছেলেবৌ কর্মজীবী হওয়ায় আদরের নাতির সুরক্ষার কথা চিন্তা করে তিনি তার প্রিয় গ্রাম ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন। ফলে তার সাথে আমার দেখা সাক্ষাৎ আরো বেড়ে যায়। দেখলাম এত বয়সেও কিভাবে তিনি নতুন পরিবেশের সাথে দ্রুতই মানিয়ে নিলেন। বন্ধুত্ব করে ফেললেন একই বিল্ডিং-এর এবং আশেপাশের বিল্ডিং-এর অন্যান্য পরিবারগুলোর সাথে। ছেলে ছেলেবৌ -এর অনুপস্থিতিতে তাদের ঘর নিরাপদ রাখা ও নাতির যত্নে নিবিষ্ট হয়ে গেলেন। নাতিকে খুশী রাখতে বৃদ্ধ বয়সে তিনি আবার শিশু হয়ে গেলেন। একদিন বললেন, "জান নাতির সাথে এখন বল খেলি, তবে সমস্যা হয় যখন বল খাটের তলায় ঢুকে যায়, আমি কি পারি হাপুর দিয়ে খাটের তলা থেকে বল আনতে?"

মাঐ বেশি লেখাপড়া করেননি, তাদের সময়ে সেটা সম্ভবও ছিলনা, সবারই অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যেত। কিন্তু তার স্বামী শিক্ষক হবার কারণে কিনা জানিনা মাঐ অনেক জ্ঞানী ছিলেন। অনেক জ্ঞান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলতেন। তার ভালবাসা ও সুন্দর কথার কারণে সবাই তার প্রতি আকৃষ্ট ছিল। আমি দেখেছি মাঐ-এর সাথে তার ভাই-বোন, ননদ-দেবর, ভাগিনা-ভাগিনি, ভাইস্তা-ভাইস্তি, পিসাতো, মামাতো, মেসোতো ভাইবোন, তাদের সন্তানদের, পাড়া প্রতিবেশি, পেরেরা পরিবারের শরিক যারা রাজশাহী অথবা সাভার চলে গেছেন, তার বিয়াই বিয়াইন, ছেলেবৌদের ভাইবোন, ভাগিনা-ভাগিনি, ভাইস্তা-ভাইস্তি সবার ছিল নিবিড় যোগাযোগ। সবাই তাকে দেখতে আসত। এমনকি যারা বিদেশে থাকে, তারাও দেশে আসলে শতব্যস্ততা থাকা স্বত্বেও তার সাথে দেখা না করে যেত না। কি একটা আকর্ষণ যেন ছিল তার মধ্যে। একদিন আমার এক দাদা (ননদের স্বামী) যিনি ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি বলছিলেন, "মাঐ-এর কাছে গেলে এত ভাল লাগে মনে হয় মার কাছে এসেছি।"

তার চার সন্তান ব্রতীয় জীবনে থাকার কারণে সব ফাদার সিস্টারদের তিনি নিজের সন্তানের মতই ভালবাসতেন। সব ফাদার সিস্টারগণও তাকে অনেক শ্রদ্ধা করতেন। সবচে মজার ব্যাপার হচ্ছে তার বিরাট সার্কেলের সব তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীরাও তাকে খুবই পছন্দ করত। আমরা অনেক সময় দেখি তরুণ-তরুণীরা বৃদ্ধ মানুষকে এড়িয়ে চলে। তার ক্ষেত্রে এটা একদমই ব্যতিক্রম, তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী যারা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিবিএ, এমবিএ, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বড় বড় সংস্থায় কর্মরত সবাই তার কাছে যেত, তার সাথে কথা বলত, আশীর্বাদ নিত। আসলে তিনি এতটাই আধুনিক মনের মানুষ ছিলেন যে তরুণ-তরুণীরা তার সাথে কথা বলে মজা পেত। সবাই যে শুধু তাকে দেখতে আসতো তা নয়, সবাই তাকে নিজেদের বাসায়/বাড়িতে নিতেও চাইতো। দেখতাম ছেলেবৌ-এর ছুটির সময় তিনি ভাগিনা-ভাগিনি, ভাইস্তা-ভাইস্তি ও অন্যান আত্মীয় স্বজনের বাসায় বেড়াতে যেতেন।

তার সংসার জীবনে অল্প আয়ে কত মিতব্যয়িতার সাথে, কত কঠোর পরিশ্রমের মধ্যদিয়ে সন্তানদের মানুষ করেছেন সেসব

গল্প সব সময় বলতেন। তার শিক্ষক স্বামীর কড়াশাসন, কঠোর নিয়মকানুনের কথাও বলতেন। একদিন বলেছিলেন, কোন কারণে যদি তিনি মন খারাপ করে কাজকর্ম করতেন তবে তার স্বামী তাকে বলত,"দেখ সুশীলের মা, মুখ কালো করে কাজ করবা না, সব সময় হাসিমুখে কাজ করবা।" এ কথাটার মর্মার্থ অনেক গভীর, আমি হৃদয় দিয়ে সেটা উপলব্ধি করেছি এবং আমার জীবনে আমি এটা প্রতিনিয়ত অনুশীলন করি। আমার স্বামী, আমার সন্তান, আমার নাতি নাতনি এরাই তো আমার সবচেয়ে আপন, এদের জন্য কাজ করতে গিয়ে যদি বিরক্ত হই তবে আর কোথা ওইতো আনন্দ খুঁজে পাওয়া যাবে না। হাজার ঝামেলার মধ্যেও যদি খুশী থাকি তবে পরিবারের মানুষগুলো কতই না খুশী হবে, আস্থা পাবে, শান্তি পাবে। একদিন দেখি মাঐ একটি ট্যাবলেট গুড়া করে পানিতে গুলিয়ে খাচ্ছেন। আমি বললাম,'কি ব্যাপার মাঐ এভাবে খাচ্ছেন যে?" তিনি বললেন, "এতবড় ট্যাবলেট তো গিলতে পারি না তাই এভাবে খাচ্ছি।" তারপর বললেন "আমার ছেলে এত পয়সা দিয়ে ওষুধগুলা আনছে এগুলা নষ্ট করুম ক্যান।" এমনই মিতব্যয়ী মনোভাবের মানুষ ছিলেন তিনি।

যদিও আগে লিখেছি শিক্ষক স্বামীর কারণে হয়তোবা তিনি জ্ঞানবান ছিলেন, এটা ঠিক নয়। তিনি নিজেই জ্ঞানার্জন করেছেন পড়ে পড়ে। তিনি ছিলেন পড়ুয়া মানুষ। দৈনিক পত্রিকা ও সাপ্তাহিক প্রতিবেশী তিনি নিয়মিত পড়তেন। সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে আমার বা আমার স্বামীর (ড. আলো ডি' রোজারিও) লেখা ছাপা হলে তিনি পড়তেন এবং আমরা তাকে দেখতে গেলে বলতেন,"তোমাদের লেখা পড়েছি।" তিনি আরো লিখতে উৎসাহিত করতেন। এছাড়াও তিনি নাতি নাতনিদের গল্পের বইগুলোও পড়তেন। পড়ার প্রতি তার আগ্রহ দেখে আমার স্বামী মাঝে মাঝেই তার জন্য নানা বই, ম্যাগাজিন নিয়ে যেতেন যেন তিনি পড়তে পারেন।

তিনি যখন চলাফেরা করতে পারতেন তখন তিনি আমার বাসায় এসেছেন কিন্তু কখনো রাত্রিযাপন করেননি। কিন্তু যখন চলাফেরা করতে পারতেন না তখন দুইবার আমার বাসায় রাত্রিযাপন করেছেন। দুটোই ধর্মীয় কারণে। চলাফেরা করতে না পারার কারণে একসময় তিনি গির্জায় যাওয়া বন্ধ করে দেন। তবে ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে, তখন উনার বয়স প্রায় ৮৯ বছর, আমি জানতে পারলাম, মাঐ-এর খুব ইচ্ছা জীবনের শেষবারের মত ইস্টারের সবগুলো অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া। আমাদের বাসায় যেহেতু লিফট আছে এবং আমাদের গাড়ি আছে তাই গির্জায় আনা নেয়া করতে কোন অসুবিধা হবে না বলে আমি অতি আনন্দিত হয়ে পুণ্য সপ্তাহের বুধবার দিন মাঐকে আমাদের বাসায় নিয়ে আসলাম। তিনি আমাদের সাথে পুণ্য বৃহস্পতিবার, পুণ্য শুক্রবার, পুণ্য শনিবার ও ইস্টার সানডের সকল অনুষ্ঠানে ও খ্রিস্টযাগে যোগ দিলেন। পূণ্য শুক্রবার সকালে আমি তার জন্য নাস্তা প্রস্তুত করে ডাকছি তিনি শুধু আসছি আসছি করে আসেন না, শুধু দেরী করছেন। একসময় আমি বললাম, "মাঐ প্রায় ১০টা বেজে যাচ্ছে আপনি খাচ্ছেন না, আপনার ক্ষুধা লাগেনি।" তিনি বললেন, "আমি তো তোমাদের মত পুরো সময় উপবাস করতে পারব না তবু চেষ্টা করি যতক্ষণ না খেয়ে থাকতে পারি।" বুঝলাম আমাদের ধর্মীয় বিধি বিধানের প্রতি কতইনা শ্রদ্ধাশীল তিনি।

দ্বিতীয়বার এসেছিলেন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে এসেছিলেন পূণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস। পুণ্যপিতার আগমন উপলক্ষে বাংলাদেশ মণ্ডলীতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, চলছিল প্রার্থনা ও নানা প্রস্তুতি। এ আলোড়ন মাঐকেও স্পর্শ করেছিল। তিনি পুণ্যপিতার সাক্ষাৎ পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তখন আমার শ্বাশুড়ি মা (তখন বয়স ৮০) এবং মাঐ (তখন বয়স ৯২) যেন কাকরাইলে গিয়ে পোপ মহোদয়কে দেখতে পারেন সে ব্যবস্থা করা হলো। নির্ধারিত দিনে আমি তাদেরকে নিয়ে কাকরাইল গেলাম। কাকরাইলে মাঠে উপবিষ্ট খ্রিস্টভক্তদের মাঝখান দিয়ে যখন পোপ মহোদয় মঞ্চের দিকে যাচ্ছিলেন তখন খুব কাছ থেকে আমার শ্বাশুড়ি মা ও মাঐ পোপ মহোদয়কে দেখতে পেলেন কিন্তু মাঐ বয়সের ভারে এতটাই ন্যুজ ছিলেন যে পোপ মহোদয় যখন মঞ্চে বক্তব্য রাখছিলেন বা রোহিঙ্গা ভাইবোনদের সাথে কথা বলছিলেন তখন তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন। রাস্তার জ্যাম, অনুষ্ঠানস্থলে হাজারো মানুষের ভিড়, প্রবেশপথের কঠোর নিয়ম, এসব অসুবিধার কথা জানা স্বত্ত্বেও তিনি আমাদের ধর্মগুরুকে একনজর দেখতে ও শ্রদ্ধা জানাতে সব কষ্ট সইতে সম্মত ছিলেন।

এই ধার্মিকা, গুণবতী সংসারী, হাসিখুশী ও সাবলীল আচার আচরণের মা যিনি আন্তরিকভাবে সবার কথা শুনতেন, সবাইকে পরামর্শ দিতেন ও অন্যের কষ্টে সান্ত্বনা যোগাতেন, সেই মাকেই পুত্র হারানোর বেদনায় ভারাক্রান্ত হতে দেখেছি। ২০১১ খ্রিস্টাব্দে তার বড় ছেলে সুশীল পেরেরার মৃত্যুর পর "আমার বাবা আর নেই" বলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে দেখেছি। পরবর্তীতে তিনি ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে বড় পুত্রবধূ অনিমা পেরেরা এবং ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় পুত্র রেভা ফাদার পরিমল পেরেরা সিএসসি কে হারান। আদরের সন্তান হারানোর শোক তাকে দ্রুতই শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল করে ফেলে। জীবনের শেষ চার/পাঁচ বছর তিনি গ্রামের বাড়ি পূর্বভাদার্তী ছিলেন। সেখানে সার্বক্ষণিক তার যত্ন নেয়ার জন্য তার মেজ ছেলে প্রভাত পেরেরা (যিনি দীর্ঘ সময় প্রবাসে কর্মজীবন কাটিয়ে অবসরে আছেন), মেজ বৌ লিলি পেরেরা, নাত বৌ মুন্নী ও শ্রাবন্তী ছিল। ঢাকা থেকেও তার ছেলে, ছেলে বৌ প্রদীপ- শিউলী ও নাতি নাতনিরা সাপ্তাহিক ও অন্যান্য ছুটিতে তাকে দেখতে যেতেন। এসএমআরএ সিষ্টারগণও তাকে অনেক সেবা দিয়েছেন। তার পরম সৌভাগ্য যে তিনি মৃত্যুশয্যায় অনেক সেবা পেয়েছেন।

পূর্বভাদার্তী থাকাকালীন চার/পাঁচ বছরে আমি বেশ কয়েকবার মাঐকে দেখতে গিয়েছি। শেষ গিয়েছি ২৪ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে। আমার ছেলে সাম্যর বিয়ের দিন নির্ধারিত ছিল ৩০ ডিসেম্বর ২০২১। মাঐ সাম্যর বিয়েতে থাকতে পারবেন না বলে ২৪ ডিসেম্বর আমি সাম্যকে নিয়ে মাঐ-এর সাথে দেখা করতে যাই। তখন তিনি একেবারেই শয্যাশায়ী, মানুষকে চিনেন, চিনেন না, এই সবকিছু মনে করতে পারেন আবার সবকিছু ভুলে যান এমন অবস্থা। কিন্তু আমাদেরকে দেখে তিনি চিনলেন, সাম্যর বিয়ের কথা শুনে অনেক খুশী হলেন, বললেন," ভাইরে বউকে অনেক আদর করবি।" সাম্যকে জড়িয়ে ধরে বললেন," এইভাবে বৌকে জড়িয়ে ধরে রাখবি।" তারপর দুইহাত উঁচু করে পিতা ঈশ্বরের কাছে, পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের কাছে সাম্যর জন্য প্রার্থনা করলেন। সাম্য ও আমার কপালে ক্রুশচিহ্ন করে আশীর্বাদ করলেন, চুমু খেলেন। এর ঠিক দুইমাস পর ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে তিনি স্বর্গস্থ হলেন।

পরদিন ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে তুমিলিয়া কবরস্থানে তাকে কবরস্থ করা হয়। শ্রদ্ধেয় বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ সিএসসি তার আন্ত্যেষ্টক্রিয়ার অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন। এছাড়া আরো নয়জন ফাদার, অনেক ব্রাদার, সিস্টার ও বহু আত্মীয় স্বজন এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সবাই তার আদর ভালবাসার কথাই বলছিলেন। তার এক মেসোতো ভাইয়ের বউ বলছিল,"দিদি এমন মানুষ ছিলেন যিনি সবাইকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন। কেউ বলতে পারবে না আমাকে তিনি কম ভালবাসতেন।"

সর্বশেষ যে ঘটনাটি লিখে শেষ করব সেটা হল- মাঐ একদিন তার ছেলের বৌ শিউলীর হাতে আমার জন্য একটি শাড়ি পাঠালেন। শাড়িটি নতুন নয়, তিনি আগে পড়েছেন। শাড়িটি তিনি আমাকে পড়তে বলেছেন এবং এও বলেছেন যে," ওর তো মা নেই, মা থাকলে ওকে শাড়ি দিত।" এখানে বলতে চাই আমার চার বছর বয়সে আমার মা মারা যান। মাঐ-এর স্নেহ, আদর ও ভালবাসায় ভরা শাড়িটি পেয়ে আমার দুচোখ জলে ভরে যায়। স্বর্গীয় মাঐ-এর প্রতি রইল আমার অফুরান ভালবাসা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি॥ ❑

লেখক: সভাপতি, উদ্যোগী মহিলা সমিতি

ও

সাগর কোড়াইয়া

দেশে ফিরেছি এক সপ্তাহ হলো। একাই এসেছি। ছেলে-মেয়ে দুটো আসতে চায় না। অস্ট্রেলিয়াতেই ওদের জন্ম। বাংলা ভালো বলতে পারে না। তবে বাংলা বুঝতে পারে ঠিকই। বাংলায় জিজ্ঞাসা করলে ইংরেজিতে উত্তর দেয়। অগ্যতা কি আর করা; সন্তানের মাকেও রেখে আসতে হলো।

লম্বা ছুটি পেয়েছি। দেশে এক মাস থাকার ইচ্ছা আছে। বড় ভাইয়ের মেয়ের বিয়েটা এই ফাঁকেই হবে। এক সপ্তাহ ঘুরে-ফিরে বেশ ভালোই কেটেছে! সহজে কি আর কেউ ছাড়তে চায়। এ বাড়ি সে বাড়ি দাওয়াত খেয়েই সপ্তাহ কেটে গেল। বয়স্ক আত্মীয়ারা দেখা হলেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। তাদের ধারণা এত বছর পর দেখা!

অনেকে কান্নাজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে- তাকে চিনতে পারছি কিনা!

মাত্র বিশ বছরে না চেনার কোন কারণ নেই। সবাইকেই চিনতে পারছি। অনেকের বয়সটা বেড়েছে এই আর কি! তবে যারা ছোট ছিলো তাদের চিনতে কষ্ট হচ্ছে বেশ। চেহারার অনেক পরিবর্তন। জিজ্ঞাসা করে চিনে নিতে হচ্ছে।

ওর কথা একদম ভুলে গিয়েছিলাম।

একদিন বাজার থেকে ফিরছি। রাস্তায় দেখা। ভেবেছিলাম- পাশ কাটিয়ে চলে যাব। এত বছর পর হয়তো চিনতে পারবে না। রাস্তার পাশ পরিবর্তন করেও কাজ হলো না একদম। ঠিকই চিনতে পেরেছে। সাথে একটি সাত আট বছরের ছেলে। উপায়ন্তর না দেখে দাঁড়ালাম।

ওর চেহারার কোন পরিবর্তন হয়নি। আগে যেমন ছিলো এখনো তেমনি আছে।

যে হাসি দেখে ভালবাসার নিষিদ্ধ ফলটা খেয়েছিলাম সেই চেনা হাসি ছড়িয়ে বললো, কেমন আছ?

ভালো নেই একদম- বলতেই ও ঘুম ঘুম চোখ মেলে তাকালো। বুঝতে পারলাম প্রশ্নের তীর ছুঁড়েছে।

কি আর করা। ভাল না থাকার উপ্যাখ্যান ব্যক্ত করতে হবে জেনে বললাম, করোনার এই পরিস্থিতিতে কিভাবে ভাল থাকি- বলতে পার!

ভাল যে তুমি নেই সেটা তো তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি।

কিভাবে বুঝলে?

সেটা বুঝতে কি গবেষণার প্রয়োজন আছে!

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বললাম, তুমি ঠিক আগের মতোই আছ। একটুও বদলাওনি।

বদলেছে অনেক কিছুই। তুমি খেয়াল করনি।

কি বলবো বুঝতে পারছি না। আমি বরাবর এমনই। ওকে ভালবাসার কথা যেদিন বলতে চেয়েছিলাম সেদিনও তাই হয়েছিলো। আজ থেকে আঠার বছর আগের কথা। সেদিনের মূহূর্তটা এখনো চোখে ভাসে। ওকে রাস্তায় দেখে দূরু দূরু বুকে কাছে যাই। এতদিন জেনে এসেছি পুরুষ মানুষের সাহস তীব্র। নিজেকে খুব সাহসী ভাবতাম। জেনেছি সিগারেট খেলে পুরুষ নাকি আসলেই পুরুষ হয়। কিন্তু ওর কাছে যতোই যাচ্ছি আমার সাহস যেন ভয়ে রূপান্তিত হচ্ছিলো। আফসোস হচ্ছিলো- কেন সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস করিনি!

তারপর যা হবার তাই হয়েছে। একদম নির্বাক ছিলাম। স্বাভাবিক কথাবার্তা শেষ করে চলে এসেছি। ভালবাসার কথা বলতেই পারিনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস- ওকে যে আমি ভালবাসি ও বুঝতে পেরেছে। ঈশ্বর মেয়েদের বুঝার এই ক্ষমতা বেশীই দিয়েছেন বলে মনে হয়।

ততদিনে দু'জনই পড়াশুনার মধ্যে আছি। সবেমাত্র আমি অনার্স শেষ করবো করবো। একদিন জানতে পারলাম ওর বিয়ের কথা চলছে। তখন সবেমাত্র ও অনার্সে ভর্তি হয়েছে। ছেলে ঢাকায় ভালো চাকুরী করে। মোটা বেতন পায়। যে কোন অভিভাবক এমন পাত্র হাতছাড়া করতে চাইবে না। হলোও তাই!

কয়েকদিনের ব্যবধানে ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল। আমি কিছুই করতে পারলাম না। তারপর আর ওর সাথে দেখা হয়নি। তবে খোঁজখবর ঠিকই নিতাম কয়েক বছর। সুখেই আছে জানতে পারি। তারপর প্রকৃতির নিয়মে এক সময় ওর খবরা-খবর নেওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে আমিও বিয়ের পিঁড়িতে বসে পড়ি। বেশ ভালো মাইনের চাকুরীও পাই।

বিয়ের সময় ওকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। বিয়ের দিন আসেনি। ভেবেছিলাম পরের দিন আসবে; তবু আসেনি। কাজে ব্যস্ত আছে ভেবে ওর আসার ইচ্ছাটা আমিই ত্যাগ করলাম।

এক সময় সুযোগ আসে অস্ট্রেলিয়াতে স্থায়ীভাবে বসবাসের। এ যেন আমার জন্য সোনার হরিণ পাওয়া। আমার জীবনে কোন পিছুটান নেই ভেবে সুযোগটা লুফে নিলাম। তারপর ঠিক বার বছর পর দেশে এলাম। এই বার বছরের মধ্যে আমার স্ত্রী ওর বাবা-মাকে দেখার জন্য বেশ কয়েকবার দেশে এসেছে।

আমি আসিনি। অনেকে আসার কথা বলেছিলো কিন্তু আসা হয়ে উঠেনি। আমি নিজেও জানি না হয়তো কোন চাপা অভিমান আমার ভেতরে চাপা পড়ে ছিলো।

ওর সাথে সেদিন আর বেশী কথা হয়নি। বাসার ঠিকানা দিয়েছিলো। একদিন বিকালে চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানিয়েছে। অপ্রত্যাশিতই বলা চলে।

সময় করে ঠিকানা মিলিয়ে একদিন ওর বাসায় যাই।

শহরের এ দিকটাতে এখনো গ্রাম্যভাব আছে। বাসা খুঁজে পেতে সমস্যা হয়নি। ওর দেওয়া ঠিকানানুযায়ী সজনা গাছ ঠিকই আছে। সজনা ফুলে সাদা হয়ে আছে গাছটি। ফলন দেবে এবার; প্রচুর ফুল দেখেই বুঝা যাচ্ছে।

গাছের নিচে দাঁড়িয়ে মনে করতে চেষ্টা করলাম- কত বছর আগে সাজনা ডাটা খেয়েছি। বরাবরই সাজনা আমার অপছন্দের একটি সবজি। অস্ট্রেলিয়ার সিডনীর ভারতীয় মার্কেটে বিক্রি হতে দেখেছিলাম।

কারো ডাকে স্বম্বিৎ ফিরে পেলাম। সামনে দাঁড়িয়ে মধ্য বয়স্ক একটি লোক। লোকটি ক্রাচে ভর দিয়ে আছে। সাথে সেদিন ওর সাথে দেখা ছোট ছেলেটি। আমাকে দেখেই চিনে ফেললো ছেলেটি।

বললো, আঙ্কেল আসুন। এটাই আমাদের বাসা।

ওদের দু'জনের পিছু পিছু বাড়িটিতে প্রবেশ করলাম। পুরনো আমলের বাড়ি। চারিদিকে পুরনো ইট খসে পড়ছে। উঠানে ইট বিছানো থাকলেও উঠানটা স্যাঁত স্যাঁতে। কত বছর যে কোন রকম মেরামত করা হয়নি- স্পষ্ট বুঝা যায়। দৈন্যদশা ঘরের খসে পড়া পলেস্তারা জানান দিচ্ছে। তবে উঠানের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা হাসনাহেনা ফুল গাছটি আমার মন কেড়ে নিয়েছে। অনুধাবনের চেষ্টা করলাম- হাসনাহেনা ফুল ফোটার সময় এখন কিনা! কোন ভাবেই অনুধাবন করে উঠতে পারিনি।

আমাকে দেখেই ও বেরিয়ে এলো। ওর চোখ দিয়ে খুশির ঝিলিক ঠিকরে বেরুচ্ছে যেন। কোথায় বসতে দিবে সে কাজেই ব্যতিব্যস্ত। অবশেষে হাতল ভাঙ্গা একটি চেয়ার নিয়ে এলো। বসলাম। গল্প হলো।

চা বানাতে গিয়ে বাঁধে বিপত্তি! ঘরে চা পাতা নেই। ও যেন লজ্জা না পায় সে কারণে আমিই বললাম, চা খাই না। এক সময় প্রচণ্ড চায়ের নেশা ছিলো।

গল্পোচ্ছলে অনেক কিছুই জেনে নিলাম। ছেলেটি জন্মাবার পর ওর স্বামীর দূর্ঘটনা হয়। কাজ শেষে ফেরার সময় পিছন থেকে গাড়ি আঘাত করে। হাসপাতালে তিনমাস থাকার পর বর্তমান এই অবস্থা। যে অর্থ জমানো ছিলো তা চিকিৎসায় শেষ। আর কোনদিন কাজ করতে পারবে না।

ও পাশের মহল্লায় সেলাই এর কাজ করে কোনভাবে সংসারটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। দু'জনের কারো বাপের বাড়ি থেকে কেউ কোন খোঁজ রাখে না। বাবা-মা মারা গেলে যা হয়।

পরে আরো কিছু সময় থেকে সন্ধ্যা হবার আগে বেরিয়ে পড়ি। সেদিন ওর আত্মসন্মানবোধ আমাকে বিস্মিত করে! ফিরে আসার আগে কেন জানি মনে হলো, ওর জন্য কিছু করা দরকার। পকেট থেকে একটি খাম বের ওর হাতে দিতে গেলে ও ফিরিয়ে দেয়।

ওর দিকে আমি আর তাকাতে পারিনি। সোজা বেরিয়ে পড়ি।

রাস্তার আলোগুলো কেবল জ্বলতে শুরু করেছে। পথে হাঁটছি। নিজেকে কেন জানি ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হলো! বার বার মনে হতে লাগলো, কেন ওকে টাকার মূল্যে মাপতে গেলাম! ❑

লেখক: সহকারী পাল-পুরোহিত,
আন্ধারকোটা ধর্মপল্লী, রাজশাহী

মানুষের মাঝেই ত্রাণকর্তা

জেন কুমকুম ডি'ক্রুজ

একটি মেঘমেদুর দুপুরে হঠাৎ একটা দৃশ্য দেখে প্রায় বিশ বছর আগের একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। বাংলার আষাঢ় শ্রাবণের বৃষ্টিধারার মতো হঠাৎ করে আকাশ কালো হয়ে এমন ঢল শুরু হলো যে দিনের মধ্যবেলাকে মনে হচ্ছিল বুঝি সন্ধ্যা ভর করেছে। আমেরিকা এসেছি প্রায় চার বছর হতে চললো এখানেও আবহাওয়ার পরিবর্তন যেন সবাই উপলব্ধি করছে। আমরা যে এলাকায় থাকি নিজস্ব গাড়ি ছাড়া পাবলিক কোন যানবাহন নেই। ছিমছাম নীরব নিরিবিলি পরিবেশ। জানালায় দাঁড়িয়ে আছি। দেখছি বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা যেন পাতা আর ফুলেদের গায়ে বিধে তাদের ঝাঝড়া করে দিচ্ছে। সাথে মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলক। এমনি সময় দূর থেকে এক মা ও তার ছোট একটি ছেলেকে আমাদের রাস্তা ধরে আসতে দেখলাম। মায়ের হাতে অনেকগুলো বাজার সদাই ভরা ব্যাগ এবং ছেলের হাতেও কয়েকটি ব্যাগ দেখতে পেলাম। ছেলেটি বারবার যেন সেগুলো টেনেটেনে বুকের কাছে তুলছিল, কাছে আসতেই দেখলাম দুজনের গায়ের কাপড় ভিজে একেবারে একশা হয়ে গেছে। মা-ছেলের গায়ের বং এবং পোষাক আষাকের রঙ ও চুলের স্টাইল দেখে মনে হলো তারা আফ্রিকান। ছোট ছেলেটিকে দেখে মায়া হলো। আমার নাতির বয়সের কিছু বড় হবে হয়তো।

এ দৃশ্য দেখে আমার বিশ বছর আগের ঘটে যাওয়া ঘটনাটি চোখের সামনে যেন জীবন্ত হয়ে ভেসে উঠল। কারণ মানুষের জীবনে এমন কিছু ঘটনা থাকে যা কখনো ভোলা যায় না। আমি তখন আর্থিক দিক থেকে খুবই বেকায়দায় পড়েছিলাম। টানাটানি চলছিল। একটা পত্রিকায় অল্প বেতনে একটা চাকরি শুরু করেছিলাম। সকাল ন'টা থেকে। কিন্তু পত্রিকা অফিস বিধায় ছুটির টাইমের কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। প্রুফ দেখা, ডামি তৈরি করা সেটআপ, গেটআপ ইত্যাদি নিয়ে কখন যে আটটা নয়টা বেজে যেতো। বাসায় এসে সব সেরে সন্তানদের পড়ালেখার তদারকি করে আবার জাতীয় পত্রিকার জন্য নারী সম্পর্কীত কিছু ফিচার লিখে তবে বিছানায় পা এলাতাম। বাইরের দৈনিকগুলো খুব কম সময়ে বেশ ভাল টাকা সম্মানী দিতো। ভোর ছ'টায় আবার দৌড়াতাম টিউশানী করতে। মাত্র একটি ছাত্রকেও বেশ ভাল বেতনেই পড়াতাম। তার বাবা-মা দুজনেই ছিলেন দৈনিক পত্রিকার নিয়মিত লেখক। পুরানো ঢাকার লক্ষ্মীবাজার ছিল আমার বাসা। আর ছাত্রের বাসা ছিল সূত্রাপুরের লোহারপুল ছাড়িয়ে ফরিদাবাদ। প্রায় বুড়িগঙ্গা ব্রিজের কাছাকাছি। মাইল দেড়ক তো হবেই। প্রতিদিন আসা যাওয়ার প্রায় তিনমাইল পথ হাঁটতে হতো আমায়।

একদিন পড়াতে যেয়ে মুষলধারে বৃষ্টির কারণে আটকা পড়ে গেলাম। বৃষ্টি হলে পুরানো ঢাকার কিযে এক ভয়বহ অবস্থা হতো সবারই তা জানা। পড়ানো শেষ হলে গেটে এসে দাঁড়াতেই দেখতে পেলাম জল থৈ থৈ অবস্থা। একটা রিক্সা বা কোন যানবাহনও নেই। একে তো নয়টায় ছেলেদের স্কুল তার উপর আমার অফিস। মানিব্যাগেও টাকার ঘাটতি। দশ টাকার ভাড়া গুনতে হবে বিশ টাকা। আমার কাছে সে টাকা নেই। মনে মনে ভাবলাম রিক্সায় বিশ টাকায় না হয় উঠে বসলাম কিন্তু যদি রাস্তায় যেয়ে রিক্সা হুমড়ি খেয়ে গর্তে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়। তখন ভাড়া দিব কোত্থেকে? আছে মোটে দশ টাকা বাসা পর্যন্ত পৌছাতে পারলে অন্তত চেনা দোকান থেকে ম্যানেজ করা যাবে। ছাত্রের মা বারবার আফসোস করে বললেন, আপা যে পানি জমেছে গাড়ী বের করলেই ডুবে যাবে তাছাড়া এ পানি কখন সরবে তারও কোন ঠিক ঠিকানা নেই। আমি বললাম, আপনারা ব্যস্ত হবেন না একটা ব্যবস্থা হবেই। কিন্তু কোন উপায়ন্ত না দেখে এবার ঈশ্বরকে ডাকতে শুরু করলাম। কিভাবে বাসায় যাবো, অফিসের টাইমও প্রায় উতরে যাচ্ছে। ঈশ্বরকে বলতে লাগলাম প্রভু উদ্ধার করো। হঠাৎ বুড়িগঙ্গা ব্রীজের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলাম জনমানবহীন বৃষ্টিঝরা ভোরে একটি রিক্সাকে চালক খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কোমর পানি ভেঙ্গে আমার দিকেই যেন এগিয়ে আসছে। কিন্তু দৃষ্টি সীমায় আসতেই রিক্সায় বসা যাত্রীকে আমার চেনা চেনা লাগল। তাকে দেখে আমি ভয়ে আঁতকে উঠলাম। ভাবলাম আজ মরেছি। এই লোকটি যদি আমার সেই চেনা লোকটি হয় তাহলে আমি শেষ। এখনি বলবে, বৌদি কিছু টাকা দাও মদ খাব। লোকটি আমাদের গ্রামের সম্পর্কে দেবর হয়। ওর বাড়ি আর আমাদের বাড়ি নদীর এপার ওপার। এক সময় মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করে বহু টাকা কামাই করলেও মদ ও জুয়ার নেশায় পড়ে সর্বশান্ত আজ। দেখতে এক কালে নায়কদের মতোই ছিল। এখন শুধু হাড়গুলো গোনা যায়। সে প্রায় প্রতিদিনই আমার বাসার কলিং বেল টেপে। আমার ছেলেরা নীচে তাকাতেই বলে তোর মাকে পঞ্চাশ টাকা বা একশত টাকা দিতে বল। খুব দরকার। আমি শুনে বলে দেই, বল অত টাকা নেই। সে রাগান্বিত হয়ে বলে যা আছে তাই দিতে বল। আমি ছেলের হাত দিয়ে দশ টাকা, পাঁচ টাকা দিয়ে দেই। এই বিপদের সময় তাকে দেখে আমি মনেমনে প্রমাদ গুনি। যখন আমি নিশ্চিত হই ওটা দেবর পল্টুই। তখন অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। কিন্তু পাঁচ মিনিট পর শুনতে পাই, বৌদি না? তারপর রিক্সাকে থামতে বলে, বলে উঠো এত সকালে বৃষ্টির মধ্যে এখানে কি করছো বৌদি? আমি ওর দিকে ফিরে বলি দেশ থেকে ফিরলি বুঝি? তারপর বলি, পড়াতে এসেছিলাম যেতে পারছি না। পল্টু বলল, এসো বৌদি আমার রিক্সায় এসো। আমি একবাক্যে বলে উঠলাম, না না অসুবিধা নেই তুই যা আমি বৃষ্টি কমলে যাব। সে পারলে আমায় কোলে করে তোলে ফেলে রিক্সায় এমন যখন অবস্থা তখন অগত্যা উঠতেই হলো। ভাবলাম কি আর করা, বাসার কাছাকাছি নেমে পরিচিত দোকান থেকে বাড়তি টাকাটা ধার নেবো। সারা রাস্তা রাগে কোন কথাই হলো না। কিন্তু আমি দোকানের কাছে নামতে চাইলেও সে আমায় দোকানের কাছে নামতে না দিয়ে বাসার দিকে চললো। আমি ভাবলাম আজ ওর থেকে আমার মুক্তি নেই। ও ঠিক আমার বাসায় যেয়ে গ্যাঁট হয়ে বসবে। টাকা না নিয়ে ছাড়বে না। কিন্তু না পল্টু আমার বাসার গেটে নামতে বলাতে আমি মানিব্যাগ খুলতে যেতেই সে রৈ রৈ করে উঠলো। বললো, বৌদি আজ আমার একটা চাকরীর ইন্টারভিউ আছে। বক্সনগরের বোন আমায় দুই হাজার টাকা দিয়েছে। তারপর আমার হাতদুটো ধরে বলে উঠলো, অনেক নিয়েছি বৌদি তুমি শুধু আমার জন্য আজ একটু প্রার্থনা করো। যেন চাকরিটা হয়। ওর কথা শুনে যেন বুক থেকে একিটি পাথর নেমে গেল। কিন্তু উল্টোপাল্টা ভাবার জন্য মনে মনে খুব কষ্ট অনুভব করলাম। ঘরে এসে সন্তানদের সব বললাম। তারপর স্নান করতে যেয়ে স্রষ্টার উদ্দেশে সেদিন শুধু এটুকুই বলেছিলাম, কে বলে তুমি নেই? তুমি যে কখন কার মধ্যদিয়ে আবির্ভূত হও তা কেবল তুমিই জানো দয়াময়।

আজ আমেরিকার রাস্তায় বৃষ্টিভেজা আফ্রিকান গাড়িবিহীন দরিদ্র মহিলাকে দেখে সেদিনের কথাই আচমকা মনে পড়ে গেল। ভাবলাম মানুষ তো মানুষেরই জন্য। দরজা খুলে ছাতা হাতে তাদের পথ আগলে দাঁড়ালাম। জানতে চাইলাম তার বাসা আর কত দূর? সে উত্তর দিল এখনো দূর আছে। এই মহামারির কারণে কারো ঘরে অচেনা মানুষের ঢোকার অনুমতি নেই। তাই আমি শুধু মহিলাকে সামান্য দূরের গির্জার ক্রুশটি দেখিয়ে বললাম, ওখানে যাও ওখানে গেলে তুমি বসতে পারবে। ফাদার খুব ভাল নিশ্চয় তোমার বাসায় দিয়ে আসার একটা ব্যবস্থা করবে। মহিলার বৃষ্টিভেজা চোখদুটো যেন আরো বেশি ছল ছল করে উঠলো। সে কতভাবে যে তার কৃতজ্ঞতা জানালো তার ঠিক নেই। আমি ঘরে ফিরে গেলাম। সহসা এতদিন বাদে পল্টুর মুখটি ভীষণভাবে মনে পড়ে গেল। মনে মনে বললাম, যেখানেই আছিস ভাল থাকিস ভাই॥ ❑

লেখক: প্রাক্তন উপ-সম্পাদক
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, আমেরিকা

বৃষ্টি বিলাশ

রবীন ভাবুক

অনেকক্ষণ ধরে অতনু চেনার চেষ্টা করছে একটু দূরেই কে যেন বসা। হালকা নিয়ন আলোর মাঝে রাস্তার পাশে এভাবে একা একা একজনকে দেখে অতনুর চোখটা সেদিকে চলে যায়। অতনু এই রাস্তায় প্রায়ই হাঁটে। সেদিন ধানমন্ডী থেকে ক্লাশ করে পায়ে হেঁটেই ফার্মগেটের দিকে রওনা দেয়। অতনু একটা পত্রিকায় কাজ করে। নিজের একটা আলাদা জগৎ রয়েছে ওর। সহজে কেউ ঢুকতে পারে না সেখানে। সব সময় নিজেকে শক্তভাবে উপস্থাপন করলেও একটা নরম কোণ মনের মধ্যে রয়েছে, যা বোঝা মুশকিল। যাইহোক, ফার্মগেটের কাছাকাছি আসতেই চোখ চলে যায় একা বসা মেয়েটির দিকে। চেনা চেনা লাগছে বলেই একটু কাছে গিয়ে দেখে সত্যিই যাকে ভেবেছে সে। জিনিয়া! সব সময় মুখে হাসি লেগে থাকে। তার সাথে এর আগে তেমন কোনো কথা হয়নি। শুধু সামনে পড়তে কুশল বিনিময় হয়েছে। তা-ও খুব কম। অতনুকে মেয়েটি দেখে ফেলে। গলায় জড়ানো ওড়নার খুট দিয়ে চোখের কোন থেকে যে কিছু মুছলো, তা আর অতনুর চোখ এড়ায়নি। যেহেতু অতনু খুব কাছে চলে এসেছে এবং ওদের চোখাচোখি হলো, তাই মেয়েটি আলতো হেসে বললো-

- আরে আপনি এখানে?
- এই তো, এই পথে যাচ্ছিলাম। (অতনু ইতস্তত হয়ে বললো)

এরপর মেয়েটি অবাক করে দিয়ে অতনুকে বললো-

- বসবেন নাকি একটু?
- হুম (অতনু ঘোরের মধ্যে থেকেই আনমনে উত্তর দিল)
- কোথায় গিয়েছিলেন?
- এই তো, অফিস শেষে একটা ক্লাশ করে ফিরছিলাম। তো আপনি কেন একা একা বসে?
- না এমনি। কিছুই ভাল লাগছিল না।
- কেন কি হয়েছে?
- না, তেমন কিছু না।

এবার অতনুর একটু কৌতুহল হলো, বিষয়টা কি! কোন রাখঢাক না রেখে বলে বসলো-

- আপনার ওড়নার খুটে জলটুকু মোছার জন্যই জানতে চেয়েছি।

এবার মেয়েটি নিজেই অপ্রস্তুত হয়ে গেল। কারণ, অতনু যে এভাবে বলবে বা বলতে পারে, তা কখনো ভাবেনি। জিনিয়া নরম সুরে বললো-

- বলবো কোনো একদিন।
- আসলে তখন তো আর এই সময়টা থাকবে না। তখন এর মূল্যও থাকবে না বলার। তাই চাইলে এখন বলতে পারেন।

জিনিয়া কিছুক্ষণ চুপ থাকে। এরপর ধীরে

ধীরে বললো-

- আসলে খুব একা একা লাগছিল। কিছুই ভাল লাগছিলো না, তাই এখানে এসে বসে রয়েছি। কারো সঙ্গও ভাল লাগছে না। কাউকে বিশ্বাস হয় না আর!
- শুনুন, আপনার কথার আগে একটা বিষয় বলে নিতে হয়, আসলে জীবনে কাউকে না কাউকে বিশ্বাস করতেই হবে। বিশ্বাসের মর্যাদাটা অন্যরকম। হতে পারে এই সময়ে কাউকে বিশ্বাস করা কঠিন। তবুও কাউকে না কাউকে বিশ্বাস করতে হয়। আচ্ছা বলুন কি হয়েছে। আমি মনোযোগ দিয়ে শুনবো।

জিনিয়ার আজ কেন যেন চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু এই খোলা আকাশের নিচে, ঝাঝালোর গাড়ির শব্দে সবকিছু নির্কশ হয়ে যায়। চোখ তুলে বললো-

- জানেন, জীবনের ছোট একটা মুহূর্ত সবকিছু এলোমেলো করে দেয়। আপনি জানেন তো, আমি বিবাহিত?
- সরাসরি জানি না। তবে মনে হচ্ছে।
  - যাইহোক, আমি বিয়ে করেছি। বিয়ের পর থেকে কোন এক অদৃশ্য কারণে অনেকাংশে তার সাথে আমার মিল কম মনে হচ্ছিল। তারপরও সংসার করছিলাম। আমি মাস দুই আগে ভুলে আমার ফোনটা বাসায় রেখে যাই। আমার স্বামী বাসায় আসে তখন এবং আমার ফোন দেখে ঘাটাঘাটি শুরু করে। তখন সে আমার ফেইসবুকে এক বন্ধুর সাথে কিছু কথাবার্তা দেখতে পায়। সেই থেকে শুরু। সত্যি বলতে, সে আমার এক পরিচিত বন্ধুই ছিল। কিন্তু আমার স্বামী তা অনেক বড় করে দেখেছে। তখন থেকেই আমাদের ঝামেলা এবং এক পর্যায়ে আমরা আলাদা হয়ে যাই। শুনেছি, সে আবার বিয়ে করেছে। এই তো সবকিছু বললাম।
  - ওহ, এই জন্য মন খারাপ?
  - আরে না, এটা একটা জীবনের অংশ হিসেবে নিয়েছি।
  - ঠিক আছে, যদি এটা মন খারাপের কারণ না হয়, তাহলে চোখের কোণে জল এলো কেন?

জিনিয়া এবার সত্যি সত্যি অপ্রস্তুত হয়ে গেলে। ঠিকই তো, যদি ওটা কারণ না হয়, তাহলে আমার মন খারাপ হয় কেন? নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করে সে! আমি তো এভাবে কখনো ভাবিনি। জিনিয়া এবার কোমল সুরে বললো-

- আসলেই আমি কখনো চিন্তা করিনি বা ভেবে দেখিনি কেন মন খারাপ হয়!
- তাহলে এক কাজ করবেন, আজ ভাববেন কেন মন খারাপ হয়। তখন অবশ্যই তার সমাধান পেয়ে যাবেন। এবার কি উঠবেন?

- হু, উঠবো। রাত হয়ে গেল। চলুন হাঁটি। দু'জনে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে জিনিয়া বললো-
- আপনার সাথে কখনোই এত কথা হয়নি। আজ কিভাবে যে এত কথা বললাম, জানি না।

অতনু কিছু না বলে পাশে হাঁটতে লাগলো।

রাত ৩টা বেজে গেছে, জিনিয়ার ঘুম আসছে না। কেন যেন অতনুর মুখটা বার বার সামনে চলে আসছে। বিশেষ করে কেমন নির্মল একটা চাহনী অতনুর। আর নিজেরই অবাক লাগে অতনু না বললে ও হয়তো কখনোই কারণ নিয়ে ভাবতো না, আর এভাবেই দিন চলে যেত। অনেক ভেবে জিনিয়া বুঝতে পারলো, নিসঙ্গতাই আসলে ওকে ধীরে ধীরে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। মন তো কতকিছুই চায়, কিন্তু কাউকে নির্ভর আর বিশ্বাস করতে পারছে না বলেই হয়তো বা এমন। তখন অতনুর কথাটা মনে পড়ে গেল, 'জীবনে কাউকে না কাউকে তো বিশ্বাস করতেই হয়।' এই ভাবে ভাবতে ভাবতে জিনিয়া ঘুমের ঘোরে চলে যায়। সকালে ঘুম থেকে উঠে অনেক ঝরঝরে লাগছে। অনেকদিন বাদে একটানা ঘুম হলো। ফ্রেস হয়ে হাল্কা প্রসাধনী মেখে অফিসের দিকে চলে যায়। অফিসে কাজের ফাঁকে মনে হচ্ছিল অতনুর নম্বরটা জোগার করে একটা ফোন দেই। কিন্তু, কেমন যেন দ্বিধা লাগছিল। অতনুর সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। এভাবে কিছু দিন পার হলেও অতনুকে যেন আরো মনে পড়তে শুরু করেছে।

তিন দিন পর অফিস থেকে ফেরার সময় অতনুকে দেখতে পায় জিনিয়া। পেছন দিয়ে ডাক দিয়ে বসলো। এভাবে যে করবে, সে ভাবতেও পারেনি। অতনু ফিরে দেখে জিনিয়া।

- আরে আপনি যে? তো, আপনার কারণ উদ্ধার করতে পারছেন মন খারাপের?
- হয়তো পেরেছি, হয়তো পারিনি। তবে কিছুটা স্বস্তিবোধ করছি। আপনার কথা বলুন, কোথায় যাচ্ছেন?
- এই তো, বাসার দিকে।
- ওহ, আচ্ছা আমরা কি কফি খেতে পারি?

অতনু অবাক হয় হুট করে এমন প্রস্তাবে। কিন্তু সরাসরি বলাতে অতনু আর না বলতে পারলো না।

- হুম, নিশ্চয়ই খাওয়া যায়।

কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে জিনিয়া অতনুকে দেখতে লাগলো আর ভাবতে লাগলো, এমন একটা মানুষ যদি বন্ধু হিসেবে থাকে তাহলে ভালই হয়। কেমন নির্বাক মানুষ সে। জিনিয়া হুট করে বললো-

- আচ্ছা, আপনার মেয়ে বন্ধু নেই?

অতনু কিছুটা অবাক হয়। তবুও ধীরে ধীরে বলে-

- না, তেমন তো কোনো বন্ধু নেই, তবে পড়াশোনার জন্য যাদের সাথে কথা হয়েছিল, তাদেরই বন্ধু হিসেবে মনে করি। কিন্তু কেন বলুন তো?
- না, এমনিই। এরপর জিনিয়া বকবক করে যেতে লাগলো নিজের মতো করে, আর অতনু নির্বাক বাধ্য শ্রোতা হয়ে সবকিছু শুনে যেতে লাগলো।

এরপর থেকে মাঝে মাঝেই ওদের দেখা হয়, কথা হয়, রাস্তায় হাঁটে। জিনিয়া সময়গুলোকে উপভোগ করে। অতনু তেমন একটা কিছু বলে না। তবে সেও যে সময়টা উপভোগ করে বুঝতে পারে। মাঝে মাঝে অতনুর এমন নির্বাকতা নিষ্ঠুর ও বিরক্তও লাগে। কেমন যেন একটা গণ্ডির মধ্যে থাকে, অথচ অতনু নিজেই তার লেখায় এবং বিভিন্ন সময় বলেছে, মনটা হলো ইচ্ছে ঘুড়ি, তখন খুশি, তখন উড়ি! কিন্তু স্বভাবটা ঠিক উল্টো।

- জিনিয়া ওইদিন রাগ করেই বলে ফেললো, তুমিই তো বল, 'মনটা হলো ইচ্ছে ঘুড়ি, তখন খুশি, তখন উড়ি!' তাহলে তুমি কেন এমন গণ্ডির মধ্যে থাক?
- বৃষ্টির আকাশে কি ঘুড়ি ওড়ানো যায়। যখন গুমোট আকাশ মুখ ভার করে থাকে, তখন কি কেউ আকাশে ঘুড়ি উড়ায়?

জিনিয়া হয়তো কিছু বুঝছে, হয়তো বুঝেনি। বুঝতে চায়, কিন্তু কিছু বুঝতেও চায় না। ছোট জীবনের ছন্দটা আর নষ্ট করতে চায় না। অতনু ওকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে, তাই আর আড়ালে কাঁদতে হয় না। এরপরও কোথায় কিছু একটা খুঁজে ফেলে জিনিয়া। প্রায় চারদিন ধরে অতনুর দেখা পায়নি জিনিয়া। কোন খবরও নেই। ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। জিনিয়ার কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। কিছু কি হয়েছে অতনুর, নাকি আর দেখা দিবে না! নাকি আমার কপালটাই এমন, পেয়েও কি কিছু হারালাম। আচ্ছা, ওর জন্যই বা এত মন কাঁদে কেন! কিন্তু চেষ্টা করেও সেই কান্না থামনো যায় না! এরও দুই দিন পর ফোন দিয়ে পাওয়া গেল অতনুকে। কথা বলে জানতে পারলো কয়দিনের জ্বরে ভুগে সেরে উঠেছে। এরপর দুই দিন টানা রেস্ট। একটানা খাটনির জন্যই দুর্বল হয়ে পড়েছিল অতনু। জিনিয়া অতনুকে বাসায় আসতে বলে। অতনু ইসস্তত করলেও জিনিয়ার জোড়াজুড়িতে আসে। বাইরে মুশলধারে বৃষ্টি। বাজ পড়ছে থেমে থেমে। বৃষ্টির ঝটকায় অনেকটাই ভিজে গেছে। ঝরবৃষ্টি ভেঙ্গেই অতনু জিনিয়ার বাসায় হাজির।

জিনিয়া হাল্কা হলুদ রঙের শাড়ি পড়েছে। চুলগুলো চিবুক গড়িয়ে নেমে পড়েছে কোমরের নিচে। মোমের আলো জ্বেলে এক অদ্ভুত পরিবেশ। অতনু কিছুটা অবাকও হয় এই আয়োজন দেখে। আজ জিনিয়াকে অন্যরকম লাগছে অতনুর কাছে। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে চলে যায়। নিরবতা ভেঙ্গে অতনু প্রশ্ন করে-

- কি ব্যাপার, আজ কি বিশেষ কিছু আছে নাকি? আপনার জন্মদিন নাকি?
- না না, কিছুই না। তারপরও.....(থেমে যায় জিনিয়া)

অতনুকে কেমন অদ্ভুত সুন্দর লাগছে আজ। ও কি সব সময়ই এমন এলোমেলো অদ্ভুত সুন্দর! অতনুকে বসতে বলে মাথা আর শরীর মোছার জন্য তাওয়েল এগিয়ে দেয়। অতনু মুছতে মুছতে জিনিয়াকে দেখে অবাক হয় আর ভাবে আজ কি স্বর্গের অপ্সরী নেমে এসেছে! জিনিয়া চা এগিয়ে দেয়। চায়ে চুমুক দিয়ে মাথা তুলে লক্ষ্য করলো, জিনিয়া মনে হয় আজ কিছুটা লাজুক হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ দু'জনে চুপ করে বসে থাকে। জিনিয়ার কাছে অতনুর এমন নিরবতা আজ আরো বেশি নিষ্ঠুর মনে হয়। বাইরে বৃষ্টি আর বাতাসের জোর বেড়েই চলেছে। সাথে আসমান-জমিন চিড়ে বিদ্যুতের তলোয়ার যেন জিনিয়ার বুক চিরে দিচ্ছে। চোখ তুলে তাকায় পর্দার চিরে আসার ঝলকানির দিকে। যেন কোনো অবিনাশী দেবী ভর করেছে জিনিয়ার উপর। চোখে স্ফুলিঙ্গ, বুকে ফুলে উঠেছে উর্ধ্বশ্বাসে। উঠে দাঁড়ায় জিনিয়া। ধীর পায়ে অতনুর সামনে দাঁড়ায়। অতনু তাকিয়ে থাকে জিনিয়ার মুখ পানে। বার বার কেঁপে উঠে, শান্ত স্থীর চোখে অতনুর চোখে চোখ রেখে জিনিয়া বললো- পাশে থেকো তুমি সরব হয়ে।

জানালার গ্রিল বেয়ে একটা সুগন্ধ ভেসে আসে, ধীরে ধীরে জ্বলন্ত মোমবাতির আলো আরো ক্ষীণ হয়ে এলো। বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ আরো বেড়েছে। পর্দাগুলো উড়ে যেতে চাইলেও আড়াল করে রাখতে চাইছে অতনু জিনিয়াকে। বাইরে গড়িয়ে পড়ছে কবিতার সুরে ঝমঝমে জিনিয়ার বৃষ্টি বিলাশ! ❑

লেখক: কথা সাহিত্যিক, বরিশাল

পলুকাকার মৎস শিকার

মিল্টন রোজারিও

এলাকায় মৎস শিকারের খুব ধুম পড়ে গেছে। সূর্যটা পাটে নামার আগেই মৎস শিকারীরা বড়শি নিয়ে খবির কোম্পানীর বাড়ীর সামনে ইছামতি নদীর তীরে বসে গেছে। এখানে নাকি বড়শিতে বড় বড় বোয়াল মাছ ধরা যায়। বড়শি ফেললে কেউ খালি হাতে বাড়ীতে ফিরে যায় না।

পলুকাকার মাছ ধরার ভীষণ সখ। ঢাকা একটি বেসরকারি অফিসে কাজ করেন পলুকাকা। বৃহস্পতিবার হাফ অফিস শুক্রবার ছুটি। তাই প্রতি বৃহস্পতিবার পলুকাকা শুধু এই মাছ ধরার জন্য বাড়ীতে চলে আসেন। পলুকাকার সাগরেদ ছিল নরেন। নবু নবু বলেই ডাকতেন পলুকাকা ওকে। নবুকে পলুকাকা বলতো,

- দেখ নবু তুই বিষুতবার বাজারে থেইক্যা পুটি মাছ কিন্যা একটা পাইল্যার মধ্যে খ্যার দিয়্যা রোইদের মধ্যে চাপা দিয়া রাইখবি। আমি আইয়্যা বিয়্যালে তরে নিয়্যা মাছ দরবার যামু। এই নে ট্যাকা।
- ঠিক আছে কাকা, তুমি কোন চিন্তা কইরো না। আমি সব ঠিক কইর‍্যা নাকুমনি।

যথারীতি পলুকাকা ঢাকা থেকে এসেই নবুকে বাড়ীতে দেখে খুব খুশী হয়। কিছু বলার আগেই নবু বলে,

- কাকা তুমি ইট্টু জিরিয়্যা ন্যাউ। আমি সব ঠিক কইর‍্যা নাকছি।

পলুকাকাকে দেখে নবুর ব্যস্ততা যেন দ্বিগুণ বেড়ে যায়। একটা ব্যাগে বড়শি, একটা চাকু আর আলি ভরে রাখে। ফ্লাক্সে আদা-চা, একটা হারিকেন আর লাঠি নেয়। রাতের বেলা পঁচা পুঁটি মাছের গন্ধে সাপ-টাপ আসতে পারে। ভূতের ভয় নবু করে না। কারণ, নদীর পাড়ে অনেক মানুষ বড়শি দিয়ে মাছ ধরছে অনেক বছর ধরে। আজ পর্যন্ত কেউ কোন ভূত বা পেত্নীর দেখা পায় নাই। পলুকাকা নবুকে ডাকে,

- নবু, কই গেলি রে? চল যাই।
- হ কাকা নও।

আরতি কাকী বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাকা-ভাতিজার তামশা দেখে বলে,

-আইজ যদি বুয়াল মাছ ধইর‍্যা না আনো, তবে তোমাগো চাচা-ভাতিজার খবর আছে।

আরতি কাকীর এই কথা বলার কারণ হলো, আজ চার/পাঁচ বছর হয়ে গেল চাচা-ভাতিজা প্রত্যেক বিষুতবার আর শুক্রবার মাছ ধরতে যায়। কিন্তু একটা মাছও ধরে আনতে পারে না। নবু বলে,

- দেইকো কাকী আইজ হাচাই একটা বুয়াল মাছ দরুমই দরুম।
- দেহুমনি। তগো এই কতা হুনতে হুনতে কান ঝালাপালা অইয়্যা গ্যাছে। আইজক্যা একটা বুয়াল মাছ দরুমই দরুম।
- নবু তর চাচীরে ক, ভাল কইর‍্যা, বেশী কইর‍্যা মুসলা বাইট্যা রাকপার।

এই কথা বলে, পলুকাকা হাতের সিগারেটে কষে এটা টান মারে। তারপর মাছ ধরার গন্তব্যস্থলের দিকে হাঁটা দেয়। নবু পিছে পিছে হাঁটতে থাকে। বলে,

- কাকা আসলে ব্যাপারডা কি কও তো? সবতের বড়শিতে মাছ দরে আর আমগো বড়শিতে মাছে টানই দেয় না। সব সমে খালি আতে ফির‍্যা আহি। এর নিগ্যাই তো চাচী আমাগো নগে রাক করে।
- নবু বেশী কতা কবি ন্যা। আইজক্যা দেহিছ একটা বুয়াল দরুমই দরুম। তারপর তর চাচী হেই বুয়াল মাছ দিয়্যা ভাজাকারি নানবো। আহ্ নিজের আতে দরা বুয়াল মাছের ভাজাকারি আর মচমচা উরুম (মুরি), কি যে মজা তুই খাইলে জীবনেও বুলবি না রে নবু।

নবু পলুকাকার এই কথা শুনে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। পলুকাকার ধমক খেয়ে চুপ হয়ে থাকে আর কিছু বলে না। হাঁটতে হাঁটতে ওরা খবির কোম্পানীর বাড়ীর কাছে এসে পড়ে। নদীর পাড়ে যেয়েই দেখে অনেক মানুষ এসে বসে গেছে মাছ ধরতে। পলুকাকাকে দেখে পরিচিতজনরা বলে,

- এই যে আমাদের পলুকাকা এসে গেছে। নমস্কার কাকা। কেউ বলে নমস্কার ভাই। এত দেরি করলা যে আইজক্যা।
- আর কইছ না দেরি অইয়্যা গেল। তোরা কি মাছ-টাছ পাইছদ?
- হ কাকা, অনেকেই পাইছে।
- কিরে আমার জায়গায় এইডা আবার ক্যরা বইছে রে? ও ছলু তুই? বয় বয় আমি তর নগেই বহি।

পলুকাকা নির্দিষ্ট একটা ডগ্গ গাছের নিচে বসে মাছ ধরতো। সেখানে আজ অন্য জন বসে মাছ ধরছে। অগ্যতা পলুকাকাকে একটু খোলা জায়গায়ই বসতে হলো আজকে। পাশেই বিরাট বিরাট মেন্দী গাছ। নদীর এই দিকটাতে জেলেরা আবার ঝাটা (গাছের ডালা) ফেলে রেখেছে মাছ ধরার জন্য। পলুকাকা যেখানে বসেছে তার থেকে পাঁচ/ছয় হাত দূরে আরো একজন বসে বড়শি বাইছে। ইতি মধ্য সে একটা মাঝারি সাইজের বোয়াল মাছ ধরে ফেলেছে। নবু সেই মাছটি দেখে বলে,

- কাকা আইজক্যা আমাগো কপাল বালই মনে অয়। দেখছ, পেটুদা একটা বড় বুয়াল দরছে।
- হ দেখছি। তুই আমাগো বড়শি বাইর কর। পুঁটি মাছের মাঝখানের কাঁটা ফালিয়্যা বড়শিতে গাঁত। আমি একটা বিড়ি ধরাই।

নবু পুঁটি মাছের মাথা আর মাঝের বড় কাঁটা ফেলে বড়শিতে গেঁথে কাকার হাতে দেয়। পলুকাকা বড়শি হাতে নিয়ে মুখ থেকে একটু থু-থু ছিটিয়ে দেয় আঁধারে, তারপর দুই তিনবার ঘুরিয়ে নদীর মাঝখানে ছুড়ে মেরে বলে,

- থুরি মুড়ি বাইল্যা ভরি, একটা বড় বোয়াল ধরি।

এমনি করে পলুকাকা দুইটা ফেকা বড়শি নদীর মাঝখানে ছুঁড়ে মারে।

নবুও একটা বড়শিতে আধার গেঁথে নদীতে ফেলে। পলুকাকা বলে,

- নবু ভাল করে হাত ধুয়ে ফ্লাক্সটা দে, একটু চা খাই।

নবু ভাল করে হাত ধুয়ে ফ্লাক্সটা পলুকাকার হাতে দেয়। কাকা চা পান করে, সাথে ধুমপানও করতে থাকে। ইছামতির ব্রিজ থেকে দেখা যায় মাছ শিকারীদের হারিকেনের টিমটিমে আলো জোনাকি পোকার মত জ্বলছে। রাত প্রায় ন'টার দিকে নবু দেখে তার বড়শিটা মাছ ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। পলুকাকাকে বলতেই কাকা এমন জোড়ে একটা হেচকা টান মারে যে একটু হলে নদীর ঢালুতে পানিতে পড়েই যাচ্ছিলো। নবু কাকাকে ধরে ফেলে। কাকা তো খুব খুশী এতোদিনে একটা বোয়াল মাছ তার বড়শিতে ধরা পড়েছে। মাছ পানিতে জোড় পায় বেশী। তাই টানে টেনে তুলতে খুব শক্তির দরকার। মাছ একবার এদিক যায় আর একবার ওদিক যায়। কাকা মাছ টেনে প্রায় পাড়ের কাছাকাছি এনে ফেলেছে। কিন্তু বিধি বাম। জেলেদের ঝাটায় মাছটি আটকে যায়। শত টানাটানি করেও পলুকাকা ঝাটা থেকে মাছটি ছুটিয়ে আনতে পারছে না। অগ্যতা নবুকে বললো,

- নবু তুই শিগ্গির পানিতে নাম। ঝাটা থেইক্যা মাছটা ছাড়িয়ে নিয়ে আয়। তাইলে মাছটা ছুইট্যা যাইবো।
- ঠিক আছে কাকা আমি নাইম্যা ঝাটা থেইক্যা মাছটা ছাড়িয়া নিয়্যা আহি। তুমি টর্চটা ঠিক মতন দইর‍্যা নাইকো। নাইতের বেলা গাঙ্গে নামতে ডর করে।
- আরে বোকা আমরা এতগুনি মানুষ পাড়ে খারিয়্যা নইছি আর তুই ডরাছ। যা মাছটা নিয়্যা আয়।

ঝাটায় মাছটি দুইতিনটা ঝামটা মেরে ছুটে চলে যায়। নবু গিয়ে আর মাছটা ধরে আনতে পারে না। বড়শিটা ঝাটা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে। পলুকাকা নবুকে ইচ্ছো মত বকাবকি করতে থাকে। নবু তখনও সাঁতার পানিতে। পলুকাকা পারে তো সেই পানিতেই নবুকে লাথি মারে। লোকজন পলুকাকাকে থামায়। বলে,

- কাকা এই মাছটা তোমার ভাগ্যে ছিল না। এতে নবুর কোন দোষ নাই। আবার বড়শি ফেল। এবার দেখো ঠিক ধরবে।
- নারে, আইক্যা আর আমার বড়শিতে মাছ ধরবো না। মনটাই খারাপ হয়ে গেল রে।

নবু সাঁতরিয়ে পাড়ে উঠে আসে। তখনই পাশে বসে থাকা ছলু ইয়া বড় এক বোয়াল টেনে পাড়ে তুলে আনে। এটা দেখে পলুকাকার মনটা আরো দুঃখে ভরে ওঠে। নবুকে আবার বকতে থাকে। বলে,

- দেখ দেখ ছলু আরো একটা বুয়াল ধরলো। আর আমরা বুয়াল দইর‍্যাও টাইন্যা পাড়ে আনবার পারলাম না। বাইত্তে গেলে আইজক্যা ঠিকই তোর চাচী খবর নিয়ে ছাড়বে।
- কাকা আমি একটা কতা কই।
- তুই আবার কি কবি হারামজাদা। মাছটাই তো দইর‍্যা আনবার পারলি না। আবার কয়, কতা কই।
- আগে হুননা আমার কতাডা।
- ক কি কবি।
- ছলুর কাছে থেইক্যা একটা বুয়াল মাছ কিনা নেও। চাচী দেইক্যা খুশী অইবো। এই কতা তো খালি তুমি আর আমি জানুম। চাচীরে কিছু কমু ন্যা।
- কথাডা তুই মন্দ কছ নাই। ঠিক আছে তুই বড়শি গুটা। আমি ছলুর ঐহিনে যাই। ছলু ভাই কয়ডা বুয়াল পাইছ?
- দুইড্যা দরছি কাকা। তোমার মাছটা ছুইট্যা গেল দেকলাম। অনেক বড় বুয়াল আছিল।
- হ কি করুম। কপালে নাই। আমারে একটা মাছ দেও। আমি দাম দিয়্যা দিমুনি।
- বড়ডা নিব্যা না ছোটডা?
- দেও বড়ডাই দেও। নবু নে, মাছটা আতে নে। ন অহনে বাইত্তে যাই।
- নও কাকা॥ ❑

লেখক: সংস্কৃতিকর্মী ও সংগঠক

নিয়মিত কলাম

সেদিনের গল্পকথা

হিউবার্ট অরুণ রোজারিও

অপচয় অমার্জনীয়

ইউনাইটেড ন্যাশন এনভায়রমেন্ট প্রোগ্রাম (UNEP) ও ওয়ার্ল্ড রিসোর্সেস ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রণীত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে: জাতিসংঘে খাদ্য ও কৃষি সংস্থার জরিপ মোতাবেক বিশ্বে প্রতি বছরে উৎপাদিত ১.৩ বিলিয়ন টন খাদ্য অপচয় বা নষ্ট করে ফেলা হয়। এই অপচয়কৃত খাদ্যের ৪৫% শতাংশ হলো শাক-সবজি ও ফলমূল। ৩৫% শতাংশ হচ্ছে মাছ ও সামুদ্রিক খাবার, ৩০% শতাংশ খাদ্যশস্য, ২০% শতাংশ দুগ্ধজাত ও মাংস বিনষ্ট হয়ে থাকে। এত অপচয়ের মূল কারণ লুকিয়ে আছে খাদ্য উৎপাদনে খাদ্যের সুষম বন্টন পদ্ধতিতে। টাকার অঙ্কে এ অপচয়ের পরিমান প্রায় এক বিলিয়ন ডলার। ক্যালরির হিসাবে প্রতি চার ক্যালরির এক ক্যালরি সমপরিমান খাদ্য অপচয় হচ্ছে। আমরা এমন এক বিশ্বে বাস করছি যেখানে অনুন্নত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্ষুধা ও অপুষ্টি চিরন্তন সত্য। খরা, যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে মাইগ্রেশন বা অভিবাসন, খাদ্য সামগ্রীর উর্ধ্বমূল্য, সামাজিক অস্থিরতা, বঞ্চণা, বৈষম্যমূলক বন্টন ব্যবস্থার কারণে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ অনাহারে ও অর্ধাহারে জীবন ধারণ করছে এবং অকালে মৃত্যুবরণ করছে। প্রতি বছর শিল্পোন্নত দেশগুলোতে যে পরিমান খাদ্যের অপচয় হয়, সেটা সাব সাহারা অঞ্চলে উৎপাদিত মোট খাদ্যের সমান। বিশ্ব ব্যাপী যত খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয় তার অর্ধেক মানে ২.৩ বিলিয়ন টন খাদ্য বিনষ্ট হয় অথবা অপচয় হয়।

আমেরিকানরা ৩০-৪০% শতাংশ খাদ্য অপচয় করে থাকে। আমেরিকানরা প্রতি বছর ১৬৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের খাদ্য ফেলে দেয় বা ধ্বংস করে। যুক্তরাজ্যে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে যে পরিমান শস্য ও রুটি ফেলে দেয়া হয়েছে তা দিয়ে বিশ্বের ৩ কোটি মানুষের অপুষ্টি দূর করা যেত। বিশ্বে প্রতিদিন প্রতিজনের জন্য ৪ হাজার ক্যালরির সমপরিমান ফসল জন্মানো হয়।

২০৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বিশ্বে লোকসংখ্যা দাঁড়াবে ৯.৬ বিলিয়ন বা ৯৫০ কোটিরও বেশী। এর মধ্যে বেশিরভাগ মানুষ আসবে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে। বিশেষজ্ঞরা ভাবছেন এ বাড়তি মানুষের খাবারের সংস্থান কোথা থেকে হবে? অনেকে মনে করছেন, সাগর ও সমুদ্র থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে হবে। জাতিসংঘের মতে এ সমস্যা সমাধান করতে পারে বিশ্বব্যাপী খাবারের যে অপচয় হয় তা রোধ করা গেলে। তার সাথে সুষম বন্টনের ব্যবস্থা করা গেলে বিশ্বে কাউকে না খেয়ে থাকতে হবে না।

প্রতি বছর ১ কোটি ৫০ লাখ শিশু মারা যায় ক্ষুধার্ত অবস্থায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ মানুষ ক্ষুধার্ত। আমাদের উপমহাদেশে এবং আফ্রিকায় বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ ক্ষুধার্ত মানুষ বাস করে।

অপচয় রোধে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতে হবে। সেটা সম্ভব সম্পূর্ণ সহমর্মিতা ও উপলব্ধির ব্যাপার, সেটা ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত হতে হবে। বিশ্বব্যাপী খাদ্যের এ অসহনীয় অপচয় মর্মান্তিক অপরাধ। এটা দুর্ভাগ্যজনক এবং নৈতিক ও মানবিক অপরাধ। মানবিক গুণাবলির অধিকারি কোনো মানুষের পক্ষে এ অপচয় বিবেককে দংশন করবে বৈকি যদি আমরা আরও সজাগ হয়ে জীবন যাপন করি। এ বিশ্বায়নের যুগে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় সরকার খেটে খাওয়া অসহায় দরিদ্র মানুষের চেয়ে ধণাঢ্য অভিজাত সম্প্রদায়ের সুযোগটি সুবিধা ও সেবার প্রতি বেশী মনোযোগী। এর ফলে শ্রেণি বৈষম্য বাড়ছে, ধনী আরও ধনী হচ্ছে, গরীব সর্বস্ব হারিয়ে সর্বশান্ত হচ্ছে। তারা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মতো নায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। দুঃখের সাথে জানাতে হচ্ছে এই অতি ধণাঢ্য গোষ্ঠি তৈরীতে বাংলাদেশ শীর্ষস্থানের একটিতে রয়েছে॥ ❑

সূত্র: ড: মনিরুদ্দিন আহমদ

লেখক: বীর মুক্তিযোদ্ধা, সমবায়ী, আমেরিকা

পুনরুত্থান আসে

যিশু বাউল

আশা আনন্দ গানে,
তমসার পথ পাড়ি দিয়ে
গৌরবময় যিশুর মহিমা ধ্যানে।

পুনরুত্থান আসে,
ভগ্ন হৃদয়ে, জারাজীর্ণ মনলোকে,
প্রত্যাশার শিখা জ্বালিয়ে
নব প্রেরণায় হৃদয় মন ভরে
শুদ্ধ সুন্দর পৃথিবীর জন্যে।

পুনুরুত্থান আসে,
দিক বিদিক আলোকিত করে
পাপের বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে,
স্বাধীন সত্তায় জীবন যাপনের লক্ষ্যে
সত্যময় জীবন গড়ার আত্মিক শক্তি দানে।

পুনরুত্থান আসে,
অসহায় নিপীড়িত-অবহেলিত ভক্তের মাঝে
আত্মিক প্রশান্তি ও প্রেমময় কর স্পর্শে,
বিবাদ-বিভেদ-দ্বন্দ্বে কোলাহল অবসানে
সভ্যতার মাঝে শান্তি শুভেচ্ছা জানাতে।

পুনরুত্থান আসে,
গৌরবময় পুনরুত্থিত যিশুর আনন্দ বার্তার সাথে
তমস্যা ও মৃত্যুর দুয়ার উন্মুক্ত করে ,
মুক্তির গৌরব কীর্তনে নব সূর্যরাগে
সভ্যতার মাঝে ভ্রাতৃ-প্রেমে-ক্ষমার
আহ্বানে।

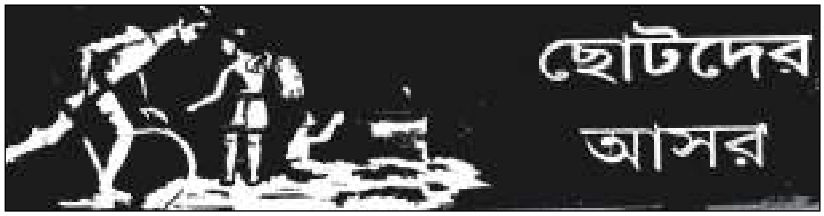

যিশুর পুনরুত্থান দিবসে দাদু-নাতির সংলাপ

মাস্টার সুবল

দাদু-নাতি যিশুর পুনরুত্থান দিবসে যিশুর যাতনাভোগ কালের বিখ্যাত আর কুখ্যাত ঘটনা নিয়ে সংলাপে বসেন। দাদু নাতিকে বলেন, বলতো ভাই, যিশুর যাতনাভোগ কালের বিখ্যাত আর কুখ্যাত ঘটনা কোনটি? নাতি বলে, দাদু, তুমিই আগে বল যিশুর যাতনাভোগ কালের বিখ্যাত আর কুখ্যাত ঘটনা কোনটি হতে পারে। দাদু বলেন, আচ্ছা, তাহলে আমিই আগে বলছি, মন দিয়ে শোন। যিশুর যাতনাভোগ কালের বিখ্যাত ঘটনাটা হলো, ক্রুশের উপর যিশু প্রাণত্যাগ করলেন, তখন ভূমি কাঁপিল, পাথর ফাটিল, সূর্য অন্ধকারময় হইল এবং আরও অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল। আর কুখ্যাত ঘটনা হলো, নিষ্ঠুর সৈন্যগণ যিশুর হাত ও পা পেরেকে বিদ্ধ করল, মাথায় কাঁটার মুকুট দিল, চড় মারিল, মুখের উপর থুতু ফেলিল, বর্শার বাট দ্বারা প্রহার করিল ইত্যাদি ইত্যাদি, বুঝলি?

এবার নাতি বললো, হ্যাঁ দাদু, তোমার কথাগুলো সবই ভালোভাবে বুঝলাম, তাহলে এবার আমার কথা মন দিয়ে শোন। যিশুর যাতনাভোগ কালের বিখ্যাত ঘটনা হলো, তিনি মৃত্যুর আগে ক্রুশে থেকেই পাপীদের ক্ষমা করে গেছেন। আবার পাপীদের ক্ষমা করতে ঈশ্বরকেও অনুরোধ করেছেন। আর কুখ্যাত ঘটনা হলো, যুদা ইস্কারিয়োৎ ত্রিশটা রুপোর টাকার বিনিময়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে যিশুকে শত্রুদের হাতে তুলে দিলেন, আর সেই অনুশোচনায় গলায় দড়ি দিয়ে মরলেন। মনে রাখ দাদু, ক্ষমা হলো ঈশ্বরের সাথে স্বর্গসুখের অধিকারী, আর আত্মহত্যা হলো শয়তানের সাথে নরকের অগ্নিশিখার অধিকারী। দাদু বললেন, ভাই, এবার বুঝলাম তোর চিন্তা ধারার কথাটাই উত্তম। ঈশ্বর তোকে আরো বেশী বুদ্ধি দান করুন আর সমস্ত অসুস্থতা হতে রক্ষা করুন॥ ❑

লেখক: শিক্ষক, সেন্ট যোসেফ কারিগরি বিদ্যালয়, ঢাকা

খ্রীষ্টিনা স্নেহা গমেজ
৪র্থ শ্রেণি, হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

ক্রুশ

রডনী কস্তা (ডলার)

সমগ্র মানবজাতির জন্য নিজের জীবন করলে দান,
লজ্জাজনক এই ক্রুশকে তুমি করেছ পবিত্র ও মহান।
যে ক্রুশকে অপমান করে ইহুদীরা মানতো অসভ্য,
সেই ক্রুশ দিয়েই তুমি লিখলে ভালোবাসার মহাকাব্য।
যে মানব, কর অনুভব, তোমার ক্রুশীয় মৃত্যুর ব্যথা,
সে-ই একমাত্র পারবে বুঝতে তোমার এই কাব্যগাথা।
শেষ মুহূর্তেও তুমি করেছ ক্ষমা, রেখে গেছ এই শিক্ষা,
ভালোবাসার উপরে আর কিছু নেই, ক্ষমার মন্ত্রে দিয়েছ দীক্ষা।
আদি পিতা-মাতার পাপের কারণে স্বর্গের দরজা হয়েছিল বন্ধ,
আমাদের পাপ বহন করিতে করিতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে তোমার স্কন্ধ,
এই মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য, নিজের কষ্ট গিয়েছ ভুলে,
ঈশ্বরপুত্র হয়েও মানবজাতির জন্য মৃত্যুবরণ করে স্বর্গের দরজা দিয়েছ খুলে।
পরপারে পাবো তোমার সান্নিধ্য, তোমার কথা মেনে চললেই,
প্রভু, আমি এখনো আছি বেঁচে, শুধু তোমার ক্রুশ আছে বলেই॥

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

ইস্টারের সময় ইউক্রেনে যুদ্ধবিরতির আহ্বান পোপ ফ্রান্সিসের

ইউক্রেনে যুদ্ধাবস্থা ও গণহত্যা অব্যাহত থাকায় পোপ মহোদয় ইস্টারের সময়ে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশটিতে যুদ্ধবিরতির আহ্বান রেখেছেন। তালপত্র রবিবারে দূত সংবাদ প্রার্থনার পূর্বে সকলকে উদ্দেশ্য করে

ইস্টারের সময় ইউক্রেনে যুদ্ধবিরতির আহ্বান পোপ ফ্রান্সিসের

জোরালোভাবে বলেন, অস্ত্রগুলো রেখে দাও, ইস্টারেই যুদ্ধবিরতি শুরু করো। সাধু পিতরের চত্বরে ৬৫ হাজার তীর্থযাত্রীর সমাবেশে পোপ মহোদয় বলেন, আমরা যখন দূত সংবাদ প্রার্থনার মধ্যদিয়ে ধন্যা কুমারী মারীয়ার দিকে তাকাই তখন আমরা যেন প্রভুর সেই দূতের কথা 'ঈশ্বরের কাছে কোন কিছুই অসম্ভব নয়' কথাটি ভুলে না যাই। যে যুদ্ধের সমাপ্তি হবে না বলে মনে হচ্ছে এমন যুদ্ধেরও সমাপ্তি ঘটাতে পারেন প্রভু। জঘণ্য গণহত্যা ও নিরীহ বেসামরিক নাগরিকদের নৃশংসভাবে নিষ্ঠুর নির্যাতনের মতো যুদ্ধ প্রতিদিনই আমরা প্রত্যক্ষ করছি। এ নৃশংস যুদ্ধ থামানোর জন্য ইস্টারের পূর্ববর্তী দিনগুলোকে সকল বিশ্বাসীভক্তকে প্রার্থনার আহ্বান রাখেন পোপ ফ্রান্সিস।

ইস্টারের যুদ্ধবিরতি: তোমাদের অস্ত্রগুলো রেখে দাও আর ইস্টারে যুদ্ধবিরতি শুরু করো। পোপ ফ্রান্সিস স্মরণ করিয়ে দেন, কিভাবে খ্রিস্টানগণ এই পুণ্যসপ্তাহে পাপ ও মৃত্যুর ওপর যিশুর বিজয় ও গৌরবের অনুষ্ঠান পালনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। পাপ ও মৃত্যুর উপর বিজয় কিন্তু কোন ব্যক্তির উপর বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিজয় নয়। কিন্তু আজ রয়েছে যুদ্ধ-বিগ্রহ; কিন্তু কেন জগতের মাপকাঠিতে তা জয় করতে চাই। কেননা তাতে শুধু পরাজয়ই আসে। কেন আমরা যিশুকে জয়ী হতে দেই না! খ্রিস্ট ক্রুশ বহন করলেন যাতে করে আমরা মন্দতার আধিপত্য থেকে মুক্ত হতে পারি। খ্রিস্ট মৃত্যুবরণ করলেন যেন জীবন, ভালোবাসা ও শান্তি রাজত্ব করতে পারে। তাইতো পোপ মহোদয় বলে ওঠেন, অস্ত্রগুলো রাখো, যুদ্ধবিরতি শুরু করো।

ধ্বংসস্তূপে পতাকা স্থাপনে কোন বিজয় নেই: যুদ্ধবিরতি আহ্বান বিষয়ে স্পষ্টতা দিয়ে পোপ মহোদয় ব্যাখা করে বলেন, যুদ্ধবিরতি মানে নয় বিরতির সময়ে আরো অস্ত্র সরবরাহ করা ও আবার যুদ্ধ শুরু করা; তা নয়। যুদ্ধবিরতি বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে বলেন, যুদ্ধবিরতি প্রকৃত ও উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে শান্তির দিকে পরিচালিত করবে, যা জনগণের ভালোর জন্য কিছু ত্যাগস্বীকার করতেও রাজি হবে। সত্যিকারভাবে ধ্বংসস্তূপে পতাকা স্থাপনে কি কোন বিজয় আছে? ঈশ্বরের কাছে কোন কিছুই অসম্ভব নয় - তা পুর্নব্যক্ত করে পুণ্যপিতা ধন্যা কুমারী মারীয়ার মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতির জন্য প্রার্থনা করতে বলেন। একইসাথে তিনি জানান, তিনি সামাজিক অস্থিরতায় সময়কালে পেরুর জনগণের সাথে আছেন। তিনি প্রার্থনায় তাদের সাথে আছেন এবং সকল দলকে দেশের মঙ্গলের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে বের করতে বলেন।

মণ্ডলীর ইউরোপীয় নেতৃবৃন্দের ইউক্রেন-পোলাণ্ড বর্ডারে যাত্রা ও শান্তির জন্য আহ্বান

কার্ডিনাল জেন-ক্লাউদে হল্লেরিচ, এসজে ও ফাদার খ্রিস্টিয়ান পোলিস বর্ডারে স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে

ইউক্রেনে হামলার শিকার এবং সহিংসতা থেকে পালিয়ে আসা লক্ষাধিক মানুষের সাথে সংহতি প্রদর্শনের জন্য, ইইউ বিশপস কনফারেন্সের কমিশনের প্রেসিডেন্ট ও কনফারেন্স অফ ইউরোপীয় চার্চেসের প্রেসিডেন্টরা ইউক্রেনীয়-পোলিশ সীমান্তে যাত্রা করেছে এবং শান্তির জন্য প্রার্থনা ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান রেখেছেন। মানুষ, জাতি ও সংস্কৃতির মধ্যে ন্যায্যতা, পুনর্মিলন ও শান্তি আনয়নের জন্য এসো প্রার্থনা ও কাজ অব্যাহত রাখি। উপরোকক্ত কথাগুলোই কার্ডিনাল জেন-ক্লাউদে হল্লেরিচ, এসজে ও ফাদার খ্রিস্টিয়ান স্বাক্ষরিত পত্রের মূলকথা।

দুই মিলিয়নের অধিক শরণার্থী পোলাণ্ডের সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থান করছে। যুদ্ধের শুরু থেকেই ইউক্রেনীয় শরণার্থীরা পোলাণ্ডে স্বাগত হচ্ছে। এ শরণার্থীদের মধ্যে বেশিরভাগই হচ্ছে নারী ও শিশুরা; যারা আক্রমনকারীদের হাত থেকে বাঁচতে তাদের স্বামী, ভাই- বোন ও পিতাদের ছেড়ে একাকী পালিয়ে এসেছে।

দুই প্রেসিডেন্ট বলছেন, তাদের সফরের সময় শরণার্থীদের চোখে প্রতিফলিত মানবিক ট্রাজেডি তাদের অন্তরকে স্পর্শ করেছে। যারা যুদ্ধের কারণে সমস্ত কিছু হারিয়েছে তাদেরকে স্বাগত ও সমর্থন জানিয়ে বাস্তবধর্মী সংগতি প্রকাশ করার জন্য প্রেসিডেন্টদ্বয় সকল মানবাধিকারকর্মী, স্বেচ্ছাসেবক, জাতীয় ও ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। খ্রিস্টের পাস্কা রহস্য আমাদেরকে সকল অন্যায্যতা, সহিংসতা ও যন্ত্রণার কেন্দ্রে নিয়ে যায়। খ্রিস্টের যন্ত্রণা ও মৃত্যু আজকের বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মানবিক যন্ত্রণা ও ট্রাজেডির মাধ্যমে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ইউকেনীয়রা তাদের দেশে ও নির্বাসনের পথেও সেই যন্ত্রণা ভোগ করছে। 'খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের মানবতায় যুক্ত হলেন, নিজের কাঁধে আমাদের দুর্বলতা ও ঘৃণা তুলে নিলেন আর যিশুর মাধ্যমে আমাদের ক্ষোভ, মৃত্যু ও হতাশাকে আশায় রূপান্তরিত করেন। মানুষ ও বিশ্ব মাঝে এই রূপান্তর সংগঠিত হয় যে, ঈশ্বর সকলকে ভালবাসেন॥

- তথ্যসূত্র : news.va

৪র্থ মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত ছিটন জেমস্ রোজারিও

জন্ম: ২৭ এপ্রিল, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু: ২৭ এপ্রিল, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

গ্রাম: মঠবাড়ি (সিংহের বাড়ি)
পো:অ: উলুখোলা, জেলা: গাজীপুর

দেখতে দেখতে চারটি বছর চলে গেল তুমি আমাদের মাঝে নেই। ভাবতেই চোখের কোণে চলে আসে বিন্দু বিন্দু জল। তোমার স্মৃতিগুলো বারে বারে আমাদের কাঁদায়। তোমার কর্মচঞ্চল দিনগুলো, তোমার প্রাণোচ্ছলতা সর্বদা আমাদের চোখের সামনে ভাসে।

"তোমার সমাধি ফুলে ফুলে ঢাকা
কে বলে আজ তুমি নেই?
তুমি আছো মন বলে তাই।"

তোমার কর্মময় জীবনে তুমি রেখে গেছ তোমার স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে, তোমার বাবা-মা, বোনসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীদের। তারা আজও তোমার পথপানে চেয়ে থাকে। তোমার অবুঝ শিশুরা আজও তোমার পিতৃস্নেহের কাঙ্গাল। তোমার জীবনকালীন কর্মময়তা, সৎ জীবনাচরণ ও নিষ্ঠা আজও আমাদের অনুপ্রেরণা যোগায় সামনে এগিয়ে যাবার। তুমি পরম করুণাময়ের কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো যেন আমরা শত বাঁধা অতিক্রম করে তোমার স্বপ্নগুলোকে পূরণ করতে পারি। পৃথিবীতে থাকাকালীন তুমি যদি কোন পাপ-অপরাধ করে থাকো, তবে পরম করুণাময় যেন তাঁর ক্ষমাস্পর্শে তা ক্ষমা করে দেন এই প্রার্থনা করি। এই জগতে চলার পথে যদি তুমি কারো মনে কোন কষ্ট দিয়ে থাক তবে তারা যেন তোমায় ক্ষমা করেন এই নিবেদন করি। আমরা আশা করি তুমি তোমার সকল পাপের ক্ষমা পেয়ে পরম করুণাময়ের পরম সান্নিধ্যে থেকে আমাদের জন্য সর্বদা প্রার্থনা করবে যেন আমরা ঈশ্বরের আশীর্বাদে সকল বিপদ-আপদ এবং বাঁধা অতিক্রম করে তোমার শোককে শক্তিতে পরিণত করে সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারি।

তোমার শোকসন্তপ্ত –
বাবা: সমর রোজারিও
মা: অনিতা ক্রুশ
স্ত্রী: ঈশিতা টুম্পা কস্তা
ছেলে: অর্নেট রোজারিও
মেয়ে: এরিসা রোজারিও
বোন: শিবলী রোজারিও
বোন জামাই: বিকাশ ডমিনিক কস্তা
ভাগিনা: অরিয়ন পৌল কস্তা
ভাগিনী: এ্যাঞ্জিয়া কস্তা
ঠাকুমা: এড্না রোজারিও

নবম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত রাফায়েল কস্তা

জন্ম: ২৩ জানুয়ারি, ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু: ৬ জানুয়ারি, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

প্রিয় দাদু,

দেখতে দেখতে নয়টি বছর হয়ে গেল, তুমি আমাদের মাঝে নেই, দাদু তুমি ছিলে ধর্মপ্রাণ মানুষ, আমরা বিশ্বাস করি, তুমি যিশুর কাছে আছ। আমাদের জন্য প্রার্থনা করো, আমরা যেন একত্রে যিশুর সাথে থাকতে পারি।

পরিবারের পক্ষে—
ছেলে, মেয়ে, বৌ
নাতী-নাতনী ও
স্ত্রী: আগ্নেশ কস্তা
৮৪/১ কাকরাইল, ঢাকা।

বিনিয়োগ সমৃদ্ধির প্রথম পদক্ষেপ, স্বাবলম্বী হোন, অধিক মুনাফা অর্জন করুন !!!

স্থায়ী আমানত
৬½ বছরে দ্বিগুণ

৫ বৎসর	৪ বৎসর	৩ বৎসর	২ বৎসর	১ বৎসর	৬ মাস	৩ মাস
১৩.০০%	১২.৫০%	১২.০০%	১১.০০%	১০.০০%	৮.০০%	৭.০০%

সঞ্চয়ী	ডিপোজিট / এল.টি
৬.০০%	৫.০০%

- ৩ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার স্থায়ী আমানতের উপর মাসিক ৯৮৩/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১১.৮০%।
- ৫ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার স্থায়ী আমানতের উপর মাসিক ১,০০৮/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.১০%।
- ৩ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার স্থায়ী আমানতের উপর তিন মাস অন্তর ৩,০০০/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.০০%।
- ৫ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার স্থায়ী আমানতের উপর তিন মাস অন্তর ৩,০২৫/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.১০%।

স্থায়ী আমানতের সুদের হার ১৫-০৪-২০২২ ইং তারিখ হতে কার্যকরী হবে।

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ
THE METROPOLITAN CHRISTIAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.
Regd. No. 282 Dated 06.06.1978
Archbishop Michael Bhaban, 116/1 Monipuripara, Tejgaon, Dhaka-1215, Bangladesh ☎ +88 02 55027691-94 info@mcchsl.org www.mcchsl.org

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা

রেভা: ফা: চার্লস জে ইয়াং ভবন ১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
ফোন: ৯১২৩৭৬৪, ৯১৩৯৯০১-২, ৫৮১৫২৬৪০, ৫৮১৫৩৩১৬
মেইল: info@cccul.com,ওয়েব সাইট: www.cccul.com
অনলাইন নিউজ: www.dhakacreditnews.com, অনলাইন টিভি: dctvbd.com

জমি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি! জমি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি!! জমি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি!!!

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি সাব কবলা দলিলে বর্তমান বাজার মূল্যে বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ক্রেতাদের অতি সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

জমির তফসিল

মর্ডজেকৃত জমির তফসিল:
জেলা: ঢাকা, **থানা:** সাভার, **মৌজা:** রাজাশন
খতিয়ান: আর. এস. নং- ১৭৫ এবং ৭২
দাগ: আর. এস. নং- ২৪২
জমির পরিমান: ৪৩২ অযুতাংশ

জমির তফসিল

জেলা: ঢাকা, **থানা:** সাভার, **মৌজা:** কমলাপুর
খতিয়ান: আর. এস. নং- ৪০
দাগ: আর. এস. নং-১১৩
জমির পরিমাণ: ১০ শতাংশ

যোগাযোগের ঠিকানা

আইন বিভাগ (৬ষ্ঠ তলা)
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা
রেভা: ফা: চার্লস জে. ইয়াং ভবন,
১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা- ১২১৫।
ফোন নম্বর: ০১৭০৯৮১৫৪২০, ০১৯১৩৪৪৮৩১১

পংকজ গিলবার্ট কস্তা
প্রেসিডেন্ট
দি সিসিসিইউ লিঃ, ঢাকা

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া
সেক্রেটারি
দি সিসিসিইউ লিঃ, ঢাকা

বিজ্ঞ/১২০/২২

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র পরিবার থেকে সকলকে

খ্রিস্টের গৌরবময় পুনরুত্থান উপলক্ষে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা

ও অভিনন্দন।

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু
পরিচালক ও সম্পাদক

হিসাব বিভাগ

ডগলাস ডি, রোজারিও
প্রধান হিসাব রক্ষক

অমিত রোজারিও
সহকারী হিসাব রক্ষক

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

ডেভিড পিটার পালমা
সম্পাদনা সহযোগী

শুভ পেরেরা
সম্পাদনা সহযোগী

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
সার্কুলেশন ইনচার্জ

লিটন ইসাহাক আরিন্দা
সার্কুলেশন সহযোগী

প্রতিবেশী প্রকাশনী

অনুকূল রোজারিও
সেলস্ এক্সিকিউটিভ

পরেশ রোজারিও
সেলস্ এসিস্ট্যান্ট

বিনয় কস্তা
সেলস্ এসিস্ট্যান্ট

টমাস কোড়াইয়া
সেলস্ এসিস্ট্যান্ট

বাণীদীপ্তি

সিস্টার মেরীয়ানা গমেজ আরএনডিএম
কো-অর্ডিনেটর ও প্রযোজক, আরভিএ

রিপন আব্রাহাম টলেন্টিনু
প্রোগ্রাম প্রযোজক,আরভিএ

এন্থনী তপন গমেজ
প্রধান শব্দগ্রাহক

জেমস্ গনছালভেস্
প্রোগ্রাম সহযোগী

সুনীল পেরেরা
জ্যোতি কম্যুনিকেশন

সনি মজেস রোজারিও
জ্যোতি কম্যুনিকেশন

জেরী প্রিন্টিং

অজয় পিউস কস্তা
ব্যবস্থাপক

দীপক সাংমা
গ্রাফিক্স ডিজাইনার

নিশুতি রোজারিও
কম্পিউটার অপারেটর

আন্তনী অংকুর গমেজ
গ্রাফিক্স ডিজাইনার

পিতর হেম্ব্রম
সহযোগী

ফারুক মিয়া
মেশিনম্যান

মানিক রোজারিও
মেশিনম্যান

সেন্টু রোজারিও
মেশিনম্যান

আব্দুল খালেক
বাইন্ডার

সুশীল মারাক
বাবুর্চি

পরিমল টুডু
সিকিউরিটি গার্ড

পলিনুস কেরকেটা
সিকিউরিটি গার্ড

লিপি আক্তার
(আয়া)

১২তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত খ্রীষ্টফার গমেজ

জন্ম : ২৬ নভেম্বর, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৪ এপ্রিল, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

**ঈশ্বর তোমার আত্মাকে
অনন্ত শান্তি দান করুন।**

১৪ এপ্রিল ২০১০, দেখতে দেখতে ১২টি বছর পেরিয়ে গেল। ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে এই পৃথিবী ত্যাগ করেছ তুমি। আমরা সবাই তোমার শূন্যতা মনে প্রাণে সর্বক্ষণ অনুভব করি। আমরা বিশ্বাস করি, পিতা পরমেশ্বর তোমাকে তাঁর শাশ্বত রাজ্যে স্থান দিয়েছেন। আমাদের জন্য তুমি তোমার স্বর্গীয় আশীর্বাদ প্রদান করো, যেন একদিন তোমার সাথে প্রভুর রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

তুমি ছিলে, তুমি থাকবে, আমাদের সবার অন্তরে এবং তোমার সকল কাজে।

তোমারই প্রিয়জনেরা

ছেলে ও ছেলে বৌ : বাবু মার্কুজ গমেজ - মার্সিয়া মিলি গমেজ
মেয়ে ও মেয়ে-জামাই : আলো, জ্যোৎস্না-অজিত, উজ্জ্বলা-তপন
নাতি : অভিষেক ইথানুয়েল সি গমেজ
নাতনী ও নাত-জামাই : ভায়না-মার্টিন, বৃষ্টি-ডেভিড, রাত্রি, স্বপ্ন, সৃষ্টি, বিস্ময়, স্পর্শ
পুতি : কাব্য, অনিক, আনন্দ ও টাইগো

৩০/১ পূর্ব রাজাবাজার (পারুল ভিলা)
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা-১৫
প্রকাশনার গৌরবময় ৮২ বছর
Regd. No. DA-33
THE WEEKLY PRATIBESHI
Easter Issue -15
❖ Easter Issue -15 ❖ 17 - 23 April, 2022
❖ পুনরুত্থান সংখ্যা-১৫ ❖ ৪ - ১০ বৈশাখ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

Prayer and Meditation Bench
New Hope Cemetery
Cambridge, Ontario Canada.
In honourable Memory of our parents
Joseph and Anna Gomes
Francis and Cecilia Anjous.
Memory to live long after we are gone.
Gurujon and parents never die
They just fade away.

In Resurrection we trust.
Joyful And Happy Easter To Everyone.

Maya Anjous Gomes
Peter Cornelius Gomes P.Eng.

BOOK POST

চলতি সংখ্যার মূল্য ৩০ টাকা মাত্র

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : wklypratibeshi@gmail.com, Web: www.weekly.pratibeshi.org